রূপিনী সমাজের রূপরেখা

উপেন্দ্র রূপিনী

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক
গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার

রূপিনী সমাজের রূপরেখা

উপেন্দ্র রূপিনী

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক
কেন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৮ইং

প্রকাশক ঃ ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সংস্কৃতি
গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার

মুদ্রণে ঃ মেগা কম্পিউটার,
বিদূরকর্তা চৌমুহনী, ৬নং ঠাকুর পল্লী রোড
কৃষ্ণনগর, আগরতলা - ১।

মূল্য ঃ 70/-

গ্রন্থ পরিচিতি

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতিদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জীবনের উপর বহু গবেষণালব্ধ প্রকাশ ও সম্পাদনা করার দায়িত্ব নিয়ে নীরবে কাজ করে চলেছে।

'রূপিনী সমাজের রূপরেখা' নামক এই গ্রন্থটির লেখক শ্রী উপেন্দ্র রূপিনী বহু শ্রম দিয়ে রূপিনী উপজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট করে যত্ন সহকারে তুলে ধরতে প্রয়াস করেছেন। শ্রী রূপিনী উক্ত গ্রন্থে হালাম সম্প্রদায় ভুক্ত রূপিনী জনজাতির উপর বহু অজানা তথ্যাদি সংযোজন করেছেন যা জনজাতি বিষয়ের পাঠক ও গবেষক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হবে।

(এস. কে. সরকার)
অধিকর্তা
উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা, ত্রিপুরা

কৈফিয়ৎ

শৈশবকাল হতে প্রতিনিয়ত আমার মনে একটিই প্রশ্ন ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে রূপিনীরা কি জাতি এবং কোথায় তাদের আদি বাসস্থান ও তাদের পূর্বপুরুষই বা কে ? এইসব অমীমাংসিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সর্বদা সঙ্গোপনে মনে মনে উত্তর খুঁজছিলাম । লোক প্রবাহিত জনশ্রুতি, রূপকথা, বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে বা পুঁথিগত বৃত্তান্ত পড়ে, প্রত্যেক তথ্য পিপাসু ব্যক্তিই নিজ গোষ্ঠীর উৎস সম্পর্কে জানতে প্রবল আগ্রহী থাকে । আমি নিজেই রূপিনী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে স্বগোষ্ঠীর উৎস সম্পর্কে জানতে অনুসন্ধিৎসু ও এক তথ্যপিপাসু পথচারী । কিন্তু রূপিনীদের সম্পর্কে লিখিত তথ্য সম্বলিত পুঁথি না থাকায় বিক্ষিপ্তভাবে লোকমুখে শোনা রূপিনী জাতির আদি ইতিহাস, লোক কথা, এই জন জাতির অতীত পরিক্রমা বিষয়ে নানাজনের মুখে নানাকাহিনী শুনে শুনে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও খুঁজে পাইনি । যার কারণে অতীত তথ্যাদি উদঘাটনে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম ।

ঠিক এমনি সময়ে, আমি রূপিনী জাতি গোষ্ঠীর উপর পুস্তক রচনায় গুরু দায়িত্ব পালনে উপজাতি গবেষনাগার হতে একটি আমন্ত্রণ পত্র পাই । যখন আমি রূপিনী সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে অহরহ বিভিন্ন তথ্যমূলক পুস্তকাদি পড়ে ও এই সম্প্রদায়ের প্রাচীন লোক কাহিনী, গল্প গাঁথা, লোক সংগীত ও প্রবাদ প্রবচন বিভিন্ন জায়গা হতে সংগ্রহ করছিলাম । তখন আমি এই আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আরো উৎসাহিত হলাম । যারা অলক্ষ্যে এই গুরু দায়িত্ব পালনে আমাকে সমর্থ বলে বিবেচনা করেছেন, অর্থাৎ **Research Advisory Committee** সদস্যদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সেইথেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমি বহুবিদ প্রচেষ্টায় অতুৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ি । সংগ্রহীত তথ্যের সিংহ ভাগ তথ্যই রূপিনী গোষ্ঠীর একাধিক বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের কাছ হতে সংগ্রহ হয়েছে । কেননা উক্ত গোষ্ঠীর পূর্ণ তথ্য সম্বলিত পুঁথি এখনও আমার গোচরে আসেনি, তারজন্য আমাকে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে শুনা লোকশ্রুতি উপর প্রাধান্য দিতে হয়েছে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন জনজাতি ও ইতিহাসোর উপর লেখা হাজারো পুস্তক সংগ্রহ করে অপরিসীম শ্রম দিয়ে এই গোষ্ঠীর উপর তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে । আমার পূজনীয় পিতামহ শ্রীরামধন রূপিনী (৯৫ বৎসর); যিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অসংখ্য মূল্যবান পৌরাণিক তথ্যাদি দিয়ে উৎসাহ সহকারে আমার লেখার কাজকে ত্বরান্বিত করেন । তার জন্য আমি পিতামহের কাছে অপরিশোধেয় ঋণী । আমার অপর আরেকজন দাদু

শ্রীযজ্ঞতর রূপিনী (৮৫) উনিও আমাকে অনেক কিছু তথ্য দিয়ে আমার কাজে অশেষ সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা রইল। তাছাড়া চন্দ্রহাম রূপিনী (ভৃগুদাসবাড়ী), কমলাপ্রসাদ রূপিনী (বেলফাঙবাড়ী), রাজচন্দ্র রূপিনী (চম্পাবাড়ী), বিক্রম রূপিনী (সিনাইকামি) প্রভৃতি ব্যক্তিরা কিছু না কিছু তথ্য দিয়ে আমার লেখার কাজে সহায়তা করেছেন। তার জন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রূপিনী গোষ্টীর উপর বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত পুস্তকের নাম দিয়ে শ্রীরাম গোপাল সিংহ (Tribal Research Institute) অনুক্ষণ উৎসাহ দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন, তারজন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। আমার অগ্রজ শ্রী অমরেন্দ্র দেববর্মা (Librarian) গবেষণার আনুসঙ্গিক বই সরকারী গ্রন্থাগার থেকে দিয়ে সহায়তা করেছেন। তার এই উদারতা আমি আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করছি। একদিকে আমার স্নেহস্পদ পার্থ রূপিনী নানাভাবে আমার কাজে সাহায্য করেছে, তার জন্য রইল আমার বুকভরা ভালবাসা।

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীমানিক লাল রিয়াং আমাকে সবসময়ই এই কাজে উৎসাহ জুগিয়েছেন, তাঁর প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ডঃ বিকাশ রায় (অধিকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর) আমাকে রিসার্চের কাজে No objection Certificate দিয়ে অলক্ষ্যে সাহায্য করেছেন। এই জন্য আমি তাঁর কাছে চির ঋণী। তিনি যদি এই Certificate টি না দিতেন, তাহলে আমার এই কাজ আদৌ সম্ভব হত কিনা, সন্দেহ। আমার বন্ধু প্রতিম অগ্রজ শ্রীসুকান্ত দেববর্মা (প্রধান শিক্ষক, ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয়, চম্পকনগর) আমাকে প্রয়োজনের সময় তথ্য মূলক পুস্তক ও উপদেশ দিয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁরজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে অনুজ শ্রীমান অরুন দেববর্মাকে (গবেষনা সহায়ক) কেবল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেই লজ্জা দিতে চাইনা। এই কাজের শুরু থেকে শেষ অব্দি তার অবদান অপরিসীম। আমার কার্য্যভার নেওয়ার পূর্ব্বে সেই প্রথম ব্যক্তি যে রূপিনী গোষ্টীদের নিয়ে গবেষণার এক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তার পক্ষে এটা পূর্ণরূপ দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগৃহীত রূপিনীদের উপর তথ্য সম্বলিত বিশেষ পাণ্ডুলিপি অকুন্ঠে আমাকে সঁপে দেন। শুধু তাই নয়, সময়ে সময়ে আমাকে বিশেষ তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই কাজে সংশ্লিষ্ট অফিসের কাজকর্ম আমার অনুকুলে সম্পাদন করায় শ্রীদেবেশ চৌধুরীকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

উপেন্দ্র রূপিনী

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১। প্রথম অধ্যায় - প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো	৯
২। দ্বিতীয় অধ্যায় - হালাম সম্পর্কে কয়েকটি কথা	১৩
৩। তৃতীয় অধ্যায় - লোক ইতিহাসের আলোকে রূপিনী সম্প্রদায়	২৩
৪। চতুর্থ অধ্যয় - রূপিনী গোষ্ঠীর প্রথম উৎপত্তি	২৬
৫। পঞ্চম অধ্যায় - রূপিনীদের মূল বৃত্তি	৭১
৬। ষষ্ঠ অধ্যায় - সামাজিক প্রথা এবং অবলম্বন	৯৬
৭। সপ্তম অধ্যায় - রূপিনীদের শ্রেণী বিভক্ত	১২০
৮। অষ্টম অধ্যায় - ধর্মভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস	১৩২
৯। নবম অধ্যায় - ভাষা ও কৃষ্টি	১৫০
১০। দশম অধ্যায় - লোকবৃত্তে রূপিনীদের খেলাধূলা	১৮৩
১১। একাদশ অধ্যায় - লোক প্রচলন কবিরাজী ঔষধ ও ব্যবহার	১৯০

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো

ভারতের মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিকে এক মুখে আঁকড়ে রেখেছে অধুনা বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক সীমানার তিনদিক ঘেরা আম আঁকারে একটি ভূমি সেটাই হচ্ছে ত্রিপুরা বা তিপরা রাজ্য। আয়তনের দিক দিয়ে ত্রিপুরা, ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। ত্রিপুরার আয়তন ১০,৪৮৬ বর্গকিলোমিটার। ভৌগলিক অবস্থানে যথাক্রমে উত্তর অক্ষাংশে ২২° ডিগ্রি ৫৬ মিনিট থেকে ৯২ ডিগ্রি ২১ মিনিট। ৮৯৩ কিলোমিটার জুড়ে ত্রিপুরা রাজ্যের তিনপার্শ্বে বাংলা দেশের শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, কিয়দংশ নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের অঞ্চল যা আর্ন্তজাতিক সীমানায় নির্ণয় করা হয়েছে। আন্তর্দেশীয় সীমানার পূর্বপ্রান্তে ৫৩ কিলোমিটার জুড়ে আসামের সঙ্গে এবং ১০৯ কিলোমিটার জুড়ে মিজোরামের ভূমির সঙ্গে সংযোগ, ত্রিপুরা রাজ্য একটি অর্ধবক্রাকৃত প্রস্থ অপেক্ষা লম্বাকৃত রাজ্যভূমি; তাই এর প্রান্তিক দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৮৩.৫ কিলোমিটার আবার প্রান্তিক প্রস্থ হচ্ছে ১১২.৭ কিলোমিটার।

সাধারণতঃ ত্রিপুরাতে দেখা যায় উচ্চ অনুচ্চ পাহাড়ের মালা যা (কেউ কেউ কম উচ্চ পাহাড়কে স্থানীয় ভাষায় টিলা বা মুড়াও বলে থাকে।) মাঝে মাঝে প্রসারিত উপত্যকা, কোথাও বা সঙ্কুচিত গিরিপথ আবার সমতলভূমি, কোথাওবা জলাভূমির অবস্থান দেখা যায়। কোন কোন ভূমিতে আবার বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে মালভূমির ন্যায় টিলা; যা দূর সুদূর প্রসারিত হয়েছে। আদিবাসীদের ভাষায় একে 'হারেপ' বলে। কোথাওবা উচ্চ শৃঙ্গ, নিভৃত বনাঞ্চল, বনবিথিমালা সাড়ি সাড়ি দণ্ডায়মান বাঁশ বেত ও নল খাগড়ার বন। আবার কোথাওবা নানান চেনা অচেনা উচ্চ বৃক্ষের বনাঞ্চল, উত্তর থেকে তথা শ্রীহট্টের সমতল হতে তরঙ্গায়িত হয়ে দক্ষিণে বাংলা দেশের চট্টগ্রামের দিকে মিলিত হয়েছে। এইসব উল্লেখযোগ্য পাহাড় হচ্ছে বড়মুড়া, দেবতামুড়া, আঠারোমুড়া, লংতরাই, শাখানতাং, জম্পুই পাহাড় ইত্যাদি। এইসব পাহাড় থেকে নির্মল শীতল জলের দ্বারা প্লাবিত হয়ে ছোট বড় নদীর উৎস্থল; যা কত যুগ যুগান্তর ধরে ত্রিপুরার ইতিহাসের ইঙ্গিত রেখা হিসাবে নির্ণায়ক হয়ে আছে।এই সব নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খোয়াই, গোমতী, জুরি, দেও, ধলাই, মনু, মুহুরী, লঙ্গাই, হাওড়া প্রভৃতি। কোন নদী অন্তরদেশীয় নদী আসামস্থিত বরাক নদীতে পতিত হয়; আবার কোন কোন নদী আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের অন্তর্গত বড় নদীর সঙ্গে সঙ্গম হয়েছে।

সাধারণত ত্রিপুরাকে প্রশাসনের সুবিধার্থে চারটি জেলা ভাগ করে দেওয়া হয়; এই জেলাগুলি সুশাসনের জন্য আরও ১৫টি মহকুমায় ভাগ করে দেওয়া হয় । ত্রিপুরাতে চারটি জেলার মধ্যে যেমন -'পশ্চিম ত্রিপুরা', দক্ষিণ ত্রিপুরা, ধলাই ও উত্তরত্রিপুরা শাসনের জন্য ভাগ করা হয় 'উত্তর ত্রিপুরা' ও দক্ষিণ ত্রিপুরা' । পশ্চিম ত্রিপুরাস্থিত মহকুমা হচ্ছে আগরতলা, বিশালগড়, খোয়াই ও সোনামুড়া; দক্ষিণ ত্রিপুরাস্থিত মহকুমা হচ্ছে অমরপুর, উদয়পুর, বিলোনীয়া ও সাব্রুম, উত্তর ত্রিপুরা জেলার মহকুমা হচ্ছে কাঞ্চনপুর, কৈলাশাহর ও ধর্মনগর, ধলাই জেলাস্থিত মহকুমা হচ্ছে আমবাসা, কমলপুর, লংতরাই ভ্যালী, গন্ডাছড়া। গ্রাম অঞ্চলের ত্বরান্বিত উন্নতিকল্পে প্রত্যেক মহকুমার অর্ন্তগত কয়েকটি উন্নয়ন ব্লক গড়ে উঠে । যেমন - কমলপুরে একটি ব্লক; কৈলাশহরে তিনটি; আবার ধর্মনগর মহকুমায় একটি ব্লক; অমরপুরের অর্ন্তগত একটি, উদয়পুর মহকুমাতে একটি, গণ্ডাছড়ায় একটি, বিলোনীয়া মহকুমাতে পর পর দুইটি ব্লক, সাব্রুম মহকুমাতে একটি; আগরতলাতে পর পর পাঁচটি ব্লক; খোয়াই মহকুমায় দুইটি ব্লক ও সোনামুড়ায় একটি ।

ত্রিপুরার জন সংখ্যার ৮৪.৭৪শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে তাই গ্রামের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্লকের আওতায়১৯৯৩ সাল থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। মোট জেলা পরিষদ হচ্ছে ৩টি । পঞ্চায়েত সমিতি হচ্ছে ১৬টি । আর গ্রাম পঞ্চায়েত মোট ৯৫৭টি; গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় ।

আবার শহর অঞ্চল উন্নতিকল্পে পুর প্রশাসনের উপর ক্ষমতা ন্যাস্ত । পুরসভা পরিচালনার জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভ্য ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন । শুধু অন্যতম শহর অঞ্চলে কেবল নোটিফায়েড অঞ্চল গঠন করার মধ্যে আগরতলা সহ মোট ১৮টি স্থায়ীত্ব শাসন ত্রিপুরাতে আছে । তারমধ্যে সবচেয়ে পুরাতন পুরসভা হচ্ছে আগরতলা । বলাবাহুল্য আগরতলা পুরসভা ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে ১৮৭১ সালে প্রথম গঠিত হয়েছিল ।

রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩০.৫১শতাংশের বেশী উপজাতি ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর। তারা শোষিত ও নির্যাপিত । সংখ্যায় লঘু উপজাতিদের রক্ষা কল্পে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ভিত্তিক স্বশাশিত জেলা পরিষদ গঠিত হয় । বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথম ১৯৭৯ সালে বিলটি উত্থাপন ও গৃহীত হয়ে ২৮জন সদস্যকে নিয়ে জেলা পরিষদ (৭ম তপশিল) ১৯৮২ সালে মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ২৮ জন সদস্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গন ভোটে নির্বাচিত হয়ে, আবার তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান ও মুখ্য কার্য নির্বাহ সহ কার্য নির্বাহী সদস্য নির্বাচন হয় । উক্ত কার্য নির্বাহ সদস্যগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট দপ্তরের কার্য্য সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং ন্যাস্ত কার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিনিয়ত লিপ্ত থাকেন । ৭১৩,২৫৬ বর্গকিলোমিটার আয়তন নিয়ে জেলা পরিষদের সীমানা নির্ধারণ

করা হয়েছে । এই জেলা পরিষদের আভ্যন্তরীণ বসবাসকারী লোক সংখ্যা হচ্ছে ৮,৮৭,৩০০ জন। তারমধ্যে উপজাতি হল ৬,৬২,৭০৩ জন এবং তপশিলী জাতি হচ্ছে ৫৭০৪৫ জন। ৪৩০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত উক্ত জেলার আওতায় পড়েছে। এইসব গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেখাশুনা ও উন্নতিকল্পে ১১টি সম্পূর্ণ ব্লক ৪টি জোনাল ডেভেলাপমেন্ট স্থাপিত হয় ।

এই সকল জনপ্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনগুলিকে জনসাধারনের স্বার্থে উন্নয়ন মূলক কাজকর্মের তত্বাবধানে একটি ক্ষমতাশীল ও দায়িত্বশীল সরকার আছে। স্ব স্ব কেন্দ্র থেকে গন ভোটে গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্য রাজ্যের বিধান সভাতে প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত সদস্যদের মধ্যে আবার নির্দিষ্ট দপ্তর দেখাশুনার জন্য দপ্তরের মন্ত্রীপদ বন্টন করে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। গণতান্ত্রিকভাবে গনভোটের মাধ্যমে বিজিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভার গ্রহণ করেন। রাজ্যপালের পরামর্শক্রমে মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। পূর্ব্বে ত্রিপুরায় স্বাধীন রাজতন্ত্র ছিল। ১৭৮তম রাজার মধ্যে শেষতম রাজা ছিলেন বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য। তাঁর মৃত্যুর চার বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের চার বৎসর পরে ১৯৫২ সালে ত্রিপুরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন সূচনা করা হয়। এরপর ১৯৬৩ সালে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল আইন অনুযায়ী ত্রিপুরাতে প্রথম বিধানসভা গঠিত হয়। তখনই শচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বে ৫ সদস্যযুক্ত ত্রিপুরাতে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শচীন্দ্রলাল সিংহ হচ্ছে ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই সময় কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল অনুসারে ত্রিপুরার চীফ কমিশনার ছিলেন এস. পি. মুখার্জ্জী। এইভাবে প্রতি ৫বৎসর অন্তর অন্তর ত্রিপুরার বিধানসভার মন্ত্রীসভা বির্বতন হয়ে ত্রিপুরার প্রথম উপজাতি মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলে মুখ্যমন্ত্রী পদে ১৯৯৩ সালের ১০ই এপ্রিল দশরথ দেব শপথ গ্রহণ করেন। তখন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল ছিল রমেশ ভাণ্ডারী। ১৯৭২ সাল থেকে ত্রিপুরাকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। তখন থেকেই ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতির নিযুক্ত রাজ্যপালের দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে।

পূর্বে ত্রিপুরা সীমিত জনসংখ্যা বিশিষ্ট এক ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পরে, আবার ১৯৭১সাল থেকে ত্রিপুরার জনসংখ্যার মূলতঃ বৃদ্ধি ঘটে। এই অকস্মাৎ জনবৃদ্ধি তাহা বস্তুতঃ মাতৃগর্ভের জাত সন্তানদের দ্বারা বৃদ্ধি ঘটে নি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে অধুনা বাংলাদেশের তথা পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে অগণিত হিন্দু বাঙ্গালীর জনস্রোত ত্রিপুরার অস্বাভাবিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। যখন ১৯৭১ সালে পূর্ব্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান ভাষাভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবীতে এক গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন বহু হিন্দু বাঙ্গালী শরনার্থী হয়ে ত্রিপুরাতে আগমন করে। ঐ শরনার্থীদের অনেকাংশে জনসংখ্যা ত্রিপুরার ভূমিতে

স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। অগত্যা ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী উত্তরোত্তর সংখ্যা লঘুত্বে পরিনত হয়। ত্রিপুরার অস্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের প্রতি দশ বছরের আদমসুমারীর রিপোর্টে পাওয়া যায়। এই বৃদ্ধি নীচের পরিসংখ্যান থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

সন	*জনসংখ্যা*	*আগের দশকের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধির হার*
১৯০১	১,৭৩,৩২৫	
১৯১১	২,২৯,৬১৩	৩২.৫
১৯২১	৩,০৪,৪৩৭	৩২.৬
১৯৩১	৩,৮২,৪৫০	২৫.৬
১৯৪১	৫,১৩,০১০	৩৪.১
১৯৫১	৬,৩৯,০২৯	২৪.৬
১৯৬১	১১,৪২,০০৫	৭৮.৭
১৯৭১	১৫,৫৬,৩৪২	৩৬.৩
১৯৮১	২০,৫৩,০৫৮	৩১.৯
১৯৯১	২৭,৫৭,২০৫	৩৪.৩

এই পরিসংখ্যান থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতি দশ বৎসর পর ১৯১১ থেকে ১৯৫১ আধম-সুমারীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অশুভ ইঙ্গিত সূচিত করলেও, সর্বোচ্চ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৬১ সালে। তখন থেকে জন অরন্যের অন্ধকার ত্রিপুরার বুকে নেমে আসে। তারপর ত্রিপুরাতে যারা আদিকাল থেকে বাস করে এসেছে উপজাতিরা অচিরেই সংখ্যালঘুতে পরিনত হয়ে সম্প্রতি ২৮.৫৬ শতাংশে পরিনত হয়। যেখানে ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে লোক সংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২৪.৬ শতাংশ। এইরকম অকস্মাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর কোথাও ঘটে নি।

১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুসারে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৩৭,৯৫৩ তখন মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ ৩৬.৮৫ আবার ১৯৬১ সনের হিসাবে ৩,৬০,০৭০ মোট জনসংখ্যার শতকরা হার ছিল ৩১.৫৩। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূলতঃ লোক গননার কাজ হয় ১৯৭১ সনের আদমসুমারীতে। তাই ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ হচ্ছে ২৮.৯০।

১৯৭১ সনের সেন্সাস অনুসারে বিভিন্ন উপজাতিদের মোট জনসংখ্যা এবং তাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ, হারের, তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

সংখ্যা	উপজাতি গোষ্ঠী	লোকসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা উপগোষ্ঠীর অংশ
১।	ত্রিপুরী	২,৫০,৩২৮	৫৫.৫৭
২।	রিয়াং	৬৪,৭২২	১৪.৩৬
৩।	জমাতিয়া	৩৪১৯২	৭.৫৯
৪।	চাক্মা	২৪,৬৬২	৬.৩৬
৫।	হালাম	১,১০৭৬	৪.২৩
৬।	নোয়াতিয়া	১০,২৭৩	২.২৮
৭।	মগ	১৩,২৭৩	২.৯৪
৮।	লুসাই	৩,২৭৩	.৮১
৯।	উচই	১,০৬১	.২১
১০।	কুকি	৭,৭৭৫	১.৭৭
১১।	গারো	৫,৫৫৯	১.২৩
১২।	মুণ্ডা	৫,৩৪৭	১.১৮
১৩।	ওরাং	৩,৪২৮	.৭৮
১৪।	সাঁওতাল	২,২২২	.৪৯
১৫।	খাসিয়া	৪৯১	-
১৬।	ভীল	১৬৯	-
১৭।	ছাইমল	-	-
১৮।	ভুটিয়া	৩	-
১৯।	লেপচা	১৭৫	-

উপরিউক্ত গোষ্ঠীরা আবার নিজেদের মধ্যে একাধিক উপগোষ্ঠী একাধিক কুল বিভাজনে পরিচয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে উপশাখা গোষ্ঠী থাকলেও তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ও কুটুম সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন। শুধু কয়েকটি মাত্র উপগোষ্ঠী সঙ্গে ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আবার কারোও কারোও সঙ্গে একেবারে মিল নেই বললেই চলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হালাম সম্পর্কে কয়েকটি কথা ঃ

রূপিনী সম্প্রদায়কে হালাম গোষ্ঠীর একটি উপশাখা বলে গণ্য করা হয়েছে। এই জাতিকে হালামে অন্তভুর্ক্তি করনের নেপথ্য কাহিনী সর্ম্পকে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। রূপিনীরা হালাম জাতি নাম আখ্যা লাভের কারণ সম্পর্কে নানাজনে নানামত

ও যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। বস্তুতঃ অতীতে কে বা কার দ্বারা হালামভুক্ত করা হয়েছে তা সঠিক ভাবে তুলে ধরতে কেউ সক্ষম হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে 'হালাম' নামক শুধু একটি শব্দ দ্বারা বারটির বেশী, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর হালাম একসঙ্গে রাজার আহবানে হাজিরা দিত। রাজার অসম ভোজনের আহবান হতে তা প্রমান পাওয়া যায়। যদিও রূপিনীরা ত্রিপুরা রাজার অসম ভোজনে হালাম নামটি ভিত্তি করে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেও সভাতে গিয়ে স্ব স্ব উপগোষ্ঠী ক্রমে বিভাজন হয়ে যেত। উক্ত ভোজনে রাজার সদনে ক্রমানুসারে কার স্থান কার পরে হবে তাও নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত। এইভাবে 'হালাম' জাতির অর্ন্তগত বারো সম্প্রদায়ক্রমিক নং অনুসারে সারিবদ্ধভাবে আসন গ্রহণ করে রাজার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। ৪-৫দিন সমারোহে ভোজন আয়োজনের পর দশমীর পরের দিবসে উক্ত সভায় হালামরা রাজার সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। পার্ব্বত্যবাসী হালামদের বিগত বৎসরের জুমচাষের উৎপাদন এবং কর প্রদানের পরিমান নির্ণয় ইত্যাদি এই আলেচনায়র বিষয় বস্তু। কোন শাখা গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ সামাজিক সমস্যা থাকলে গোষ্ঠীর সর্দার অর্থাৎ 'রায়' উক্ত, বিষয়টি রাজার নিকট তুলে ধরতেন। লঘু সমস্যার ক্ষেত্রে রাজার বিবেচনায় আবার উক্ত 'রায়ের' উপর ঐ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু 'রায়' হচ্ছে রাজার দ্বারা উপাধি ভূষিত ও একটি উপগোষ্ঠীর সর্ব্বেসর্ব্বা অর্থাৎ হালাম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একটি উপগোষ্ঠীর সর্দার। সেইজন্যে রাজার আদেশক্রমে তাদের স্ব স্ব বসতিতে সমস্যা সমাধান করতেন। শুধু রাজার মুখে নির্গত আদেশের প্রতীক্ষা মাত্র। আলোচনা সভার পরে ভিন্ন ভিন্ন উপগোষ্ঠীর রায়, নিজ বসতি হতে সংগৃহীত 'কানসুমারী' অর্থাৎ কর রাজাকে প্রদান করলেই উক্ত সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়। তারপর মদ ও মোষ মাংসে পরিতুষ্ট বার হালাম রায়রা রাজাকে বুকভরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছয় দিনের দিন রাজধানী থেকে বিদায় নিতেন। বলাবাহুল্য, 'রাজার অসম ভোজনে' অংশগ্রহণের অগ্রাধিকারীরা হচ্ছে ৬ থেকে ৭জন পরিষদ বর্গের প্রধানরা। যেমন - রায়, কামসিকাউ, কাবুল, কালেম, সেঙজা ও ফুইজা। এর অতিরিক্ত যারা অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তারা অনেকেই যেতে পারে। কিন্তু তাদের আপনা খরচার উপর পান-আহার করতে হত।

এই তো গেল রাজার অসমভোজনে রাজমহলে হালামদের সম্বর্দ্ধনা। এরপর নিজ নিজ বসতিতে ফিরে তারা আরও সম্বর্ধনা পেয়ে থাকেন। বসতিতে প্রবেশের আগেই, অসম ভোজনের প্রতিনিধিবর্গের জন্য একটি সুসজ্জিত বাঁশের বেদী অর্থাৎ 'কেরখলা' তৈরী থাকত। উক্ত কেরখলা, শুধু ঐ প্রতিনিধিদের জন্যই তৈরী করা হত। প্রচুর পরিমানে মদ ও কাঁচা মদ (চয়ারাক ও চুয়াক বুতুক) ঐ বিশ্রামাগারে মজুদ রাখা থাকত। তখন বসতির নারী-পুরুষ সম্মিলিত ভাবে এসে রাজতুল্য উক্ত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাত এবং একটি গোলাকৃতি বাঁশের তৈরী রথ (তরাইকিতিং) তারা সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। প্রথমে

'রায়' জনচারেক লোকের কাঁধে ভর করে সজ্জিত রথে চড়ে আনন্দে মদ খেতে খেতে বসতির অভিমুখে রওনা হতেন। আর ঐ রথকে ঘিরে মাতাল অনুগামীরা আনন্দমুখর নৃত্য গীতে দোলতে দোলতে পল্লীর গলি উপগলিতে একবার আবর্তন করে নিয়ে; তারপর রায়কে তার বাড়ীতে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে আবার তার নিকটস্থ পদধারী এবং এরপর তার পরবর্তী পদ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরপর এইভাবে রথে তুলে নিজ নিজ আবাসে পৌঁছে দিতে হয়। এইভাবে ৭ থেকে ৮জন প্রতিনিধিদের ঐ বিশ্রামবেদী অর্থাৎ 'কেরখলা' থেকে তুলে স্ব স্ব গৃহে নামানোর পর অভর্থনাকারীর দল, ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে, এইদিনের জন্য স্বাগত অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটে।

শুধুমাত্র বৎসরে একবার রাজার সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ এবং রাজভোজনের সম্মানটুকু পার্ব্বত্যবাসী হালামদের কাছে এক বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল। যেখানে রাজা অথবা রাজকর্মচারীদের দেখা পাওয়া দুস্কর ছিল, সেখানে এই হালাম প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে কায়েম রাখায় 'অসম ভোজন' বিরাট ভূমিকা ছিল, মনে হয়। রাজার অনুপস্থিতিতে দুর্গম পার্ব্বত্যবাসী প্রজা সাধারণ রায়কে রাজার সমতুল্য মর্যাদা দিতেন এবং তার কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে নিতে হয়। রাজার প্রতি সমপির্ত হালামরা রাজাকে কাছে না পাওয়াতে, নিজেদের শোক দুঃখের অংশীদার আপন বসতির সুহৃদয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে রায় পদে বেছে নিতেন এবং ঐ রায়কে পরামর্শ দানের জন্য একটি পারিষদবর্গ সমাজ সচেতন হালামরা নিজেদের মধ্যে নির্বাচন করে নিতেন। তাঁরা হচ্ছেন কালেম, কাবুল, কামিছিকাউ, সেঙজা ও ফুইজা। কোন কোন হালাম অর্ন্তভুক্ত উপগোষ্ঠীর মধ্যে পাঁচ বছর আবার কারও কারও মধ্যে দশবছর রায় বা তাঁর পরিষদবর্গ পদে আসীন থাকতে পারেন। রায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবসর গ্রহণ করলে তাঁর নিকটস্থ পদাধিকারী 'কালেম' রায় পদে উন্নীত হন। পরিষদ বর্গের মধ্যে এইভাবে সবাই ক্রম পদন্নোতি পেয়ে শেষে, তাদের অভিষিক্ত পদের উচ্চ সোপানে এসে রায় পদটি প্রাপ্ত হতেন। প্রয়োজনবোধে যে কোন পদকে অপসারণ করা যেতে পারে; যদি তার বিরুদ্ধে কোন অসৎ কার্য অবলম্বনের কার্যকালাপ প্রমানিত হয় এবং সেই পদ হতে বাদ দিয়ে তার অধঃস্থন ব্যক্তিকে বসিয়ে দিতে পারেন। পার্ব্বত্য হালামরা রাজ অনুরুক্ত হলেও স্বৈরতন্ত্রকে কোন সময় আমল প্রদান করেন নি। তাই যখন রায় বা তাঁর পারিষদবর্গের প্রধানরা স্বৈরাচারীতা রাজ কায়েম করতে কেউ যদি চেষ্টা করে থাকে তখন যৌথ প্রতিবাদে তাকে উক্ত পদ থেকে অপসারিত করা হতেন। অনেক সময় রাজকর্মচারীর তিক্ত কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে হালামরা কতবার যে শায়েস্তা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল তার কোন ইয়ত্তা নাই। তবুও হালামরা রাজতন্ত্রকে পরম শ্রদ্ধায় অন্তরে পোষন করে রাজাকে সময়মত কর প্রদান করতেন। কারন যেইদিন রাজার শাসনে কিছুটা স্থিরতা ঘটবে, সেইদিন থেকেই দূর্ধর্ষ হিংস্র জাতি মস্তক উত্তোলন করবে, এটা হালামরা মোটেই চান না। দূর্ধর্ষ নুতন কুকিদের দ্বারা লুটপাত

ও মস্তক ছেদন, শিশু হত্যা, এইসব নিষ্ঠুর আচরনে জর্জ্জরিত তিক্ত অভিজ্ঞতা হালামদের কাছে এটা এক আমলের কথা ছিল না। (খুব সম্ভবতঃ উক্ত জাতির প্রতিরোধের জন্যই দুর্গম পার্ব্বত্যবাসী হালামরা ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে চলতেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।) হালামদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ ও সমতলীয় জাতির উপর লুন্ঠনের অপরাধে ত্রিপুরেশ্বর কতবার কুকি দমনে অভিযান করেছেন তা ত্রিপুরার ইতিহাসে সাক্ষী বহন করে।

বস্তুতঃ হালামরা ছিলেন আত্মনির্ভরশীল কৃষিজীবি। আবার তাদের মধ্যে সাম্যপ্রিয় এবং স্বাধীনচেতা সমাজবদ্ধ আদিবাসী বলে সমাজ কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে যাযাবরীয় জুম কৃর্ষিই একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই অস্থায়ী জুম চাষের কারণেই উক্ত সম্প্রদায় কালক্রমে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর নাম নিয়ে ভাঙ্গণ ঘটে। পরিশেষে ছোট ছোট উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সংখ্যালঘুত্বে পরিণত হয়। রাজ সদন থেকে দুর দুরান্তে জুম কৃষি কার্য্যের জন্য বসতি স্থাপন করতে হয় বলে প্রত্যেকটি উপগোষ্ঠীর মধ্যে একজন রায় থাকত। এই রায়ের নাম ছিলেন 'কামছিকাউ'। (বলাবাহুল্য রায় হচ্ছে উত্তরকালে উপাধি ভূষণ একটি রাজা প্রতিনিধি হালাম অর্ন্তগত এক উপগোষ্ঠীর সর্দার। যা পরে রাজতুল্য 'কামছিকাউ' এর পদমর্যাদাকে নিম্নে অবতরণ করে দিয়ে তার স্থানে রায়কে উচ্চ পদ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই 'রায়' হচ্ছে রাজার প্রতিনিধি, আর 'কামছিকাউ' হচ্ছে হালাম নামকরনের প্রাক্কালের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর বা এলাকার রাজা।)

উক্ত সম্প্রদায়রা বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেলেও কিন্তু 'কামছিকাউ' রাজার নামটি পরিবর্তন হতে দেয়নি ঐ কিরাত সম্প্রদায়রা। এই একটিমাত্র শব্দ সার নিষ্কার্ষণ করেই পরে তাদের এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তবে পারিষদবর্গের নাম হালাম সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত হওয়ার পরেও এমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আসল কথা হচ্ছে, হালাম নামাকরন হওয়ার আগে উক্ত গোষ্ঠী সমূহের কি নাম ছিল ? অথবা কি বলে তাদের চিহ্নিত করা হত এটাই একটি মূল প্রশ্ন।

সুপ্রাচীনকালে ত্রিপুরা তথা সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের কিরাত বলে জানত। 'According to Dr. Suniti Kumar Chatterjee (the world famous scholar) "the Kukis of cachar border are the ancient kiratas of Hindu Purans and epics (Indian Origin of the Chinese Nation of the Part II)' আবার পরে কিরাত নামটি নামান্তর হয়ে কুকি বলে পরিচিত হলেও তারা নিজে কোন সময় কুকি বা কিরাত বলে পরিচয় দিত না। কুকিরা নিজেদের 'জিও' বলে পরিচয় দিত। 'শিব' শব্দতে তারা 'জিও' বলে উচ্চারন করত অর্থাৎ তারা শিবের সন্তান। তা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না, কারন রাজমালাতেও কুকি মেয়েদের সঙ্গে মহাদেবের তাণ্ডব লীলা আজগুবি অনেক কিছু বর্ণনা দেখা যায়। বস্তুতঃ কুকিরা নিজেদের মধ্যে 'জিও' সম্প্রদায় বলে পরিচয় দেয়।

এটা সত্য কিন্তু এই কুকি শব্দটি কে বা কার দ্বারা ভূষিত ? কিন্তু কুকি শব্দটি তাদের ভাষার শব্দের ভাণ্ডারেও নাই । এতে স্পষ্টভাবে সার নিষ্কার্ষন করা যায় যে, কুকিদের আভ্যন্তরীন বিষয়ে যারা ভাল করে জানেন না তারাই তাদের আভ্যন্তরীন শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে অজ্ঞাতসারে বহিরাগত ব্যক্তিরাই কুকি নামটি দেন । সম্ভবতঃ 'কুক্ষী' হতে কুকি শব্দটি নির্গত হয় । কুক্ষীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে প্রয়োগ করেই ঐ কুকি নামটি প্রদান হয় বলে একান্তভাবে ধারনা । কারন সুপ্রাচীনকালে নিম্নভূমির অপেক্ষা পার্ব্বত্যভূমির চাহিদা অধিক ছিল । কেননা নিম্ন ভূমিতে বেশীরভাগ এলাকায় জলাশয় পূর্ণ ছিল । সেইজন্য কিরাত সম্প্রদায়রা আগে এসে পার্ব্বত্যভূমিকে দখল করে অর্থাৎ কুক্ষিগত করেছে বলে সমস্ত পার্ব্বত্যবাসী সম্প্রদায়কে 'কুকি' বলে চিহ্নিত করেছে বলে ধারনা । তারপর সমতলীয় বাসীরা পরে এসেছে বলে নলখাগড়ার বন ও জলাশয় ভূমিকে দেখে আবাস আবাদ ভূমি ও বসতি স্থাপন করে নেয় । তাই উক্ত সমতলীয় জাতিরা অজ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর নাম উচ্চারনের প্রয়াস না করে সম্মিলিত ভাবে পার্ব্বত্যবাসীদের কুকি বলে নাম প্রদান করেছিল । তাই কুকি সম্পর্কে A Gripson এর মন্তব্য এখানে প্রণিধান যোগ্য ঃ Kuku is an Assamese or Bengali term applied to various hill tribes such as the Lusheis, Rangkhals, Thados etc. It seems to have been known at a comperatively early period of the Rajmala, Siva is stated to have fallen in love with a kuki woman and the kukis are mentioned in connection with the Tipperah Raja Chaehag (Pha) who flourished about 1512 A.D. যদিও সমতলবাসীরা পার্ব্বত্যবাসীদের কুকি বলে এক করে দেখলেও কিন্তু তাদের মধ্যে নুতন কুকি ও পুরান কুকির মধ্যে সামাজিক আচার আচরনে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় । যারা দক্ষিণ চীন থেকে এসে ব্রহ্মদেশ, আবার ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য কুকিদের বিতাড়িত করে কয়েকটি এলাকা জবর দখল করে নেয় । তারপর তারা সেইসব এলাকা জুড়ে আধিপত্য স্থাপন করে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন গড়ে তুলে । ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী সম্পন্ন জাতি হলেও সম্প্রদায় একতা ও মৈত্রী বজায় রেখে প্রচুর লোক সংখ্যা নিয়ে সাধারণত তারা বসতি গড়ে তুলে । নুতন কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়কে তাদের বসতির সান্নিধ্যে বাস করতে দিত না । নিজেদের গতিবিধি এবং প্রথাকে অন্য সম্প্রদায়ের কাছে লুক্কায়িত রাখার জন্যই খুব সম্ভবতঃ ঐ কুকিরা যৌথবদ্ধ এক শ্রেণী গোষ্ঠীতে থাকার চেষ্টা করত ।

সুপণ্ডিত ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "কাছাড় বা তদানীন্তন হিরম্ব দেশের সীমানার পার্শ্ববর্তী যে আদিবাসীরা বাস করত তারাই হচ্ছে কিরাত বা কুকি ।" যাঁরা মহাভারতের মতো মহাকাব্যের মধ্যে এ জাতির সম্পর্কে বর্ণিত হয় । এই কৈরাত সম্প্রদায় হচ্ছে পুরাতন কুকি । (উক্ত সম্প্রদায়দের বিতাড়িত করেই উত্তরকালে নবীনকুকিরা তাদের আবাস ভূমিতে বসতি গড়ে তুলে ।) আর্য ধর্মের কিঞ্চিৎ ছায়া তাদের আচার অনুষ্ঠানে

পড়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত দেব দেবী এবং উপদেব দেবীরও উপাসক, শুধু নিজেদের ভাষায় নামান্তর মাত্র। তাই তারা ম্লেচ্ছা জাতি বলে আখ্যায়িত হত না। খুব সম্ভবত তারা মধ্য চীন থেকে ধাবিত হয়ে আসামের ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাতে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকে এই সম্প্রদায়রা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে এবং বিক্ষিপ্তভাবে সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ জনস্রোত তদানীন্তন ত্রিবেগ (ত্রিপুরা), হিড়ম্ব (কাছাড়) ভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিল। তাই তাদের ভাষা কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষগোচর হয়। তা প্রমান করেছেন ভাষাতত্ববিদ এ. গ্রিবসন। এখানে তাঁর বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য ঃ Old kuki comparising Rangkhal Betu, Hallam, Langrong and Puran all those are mere dialeets of one language which may be called by the customary name of old Kuki it is closely related to the central Chin language. কিংবদন্তীর মতে চন্দ্রবংশের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষ যযাতি তাঁর পুত্র দ্রুহ্যুকে নির্বাসিত করলে আসামস্থিত ত্রিবেগ নগরে এসে আশ্রয় নেয়। তারপর সেখানকার আদিবাসী কিরাতদের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দ্রুহ্যু কিরাতদের পরাস্ত করে তাদেরকে বশীভূত করেন। তদবধি রাজার অঙ্গণের চারিপার্শ্বে আবাস স্থাপন করে রাজার শোক দুঃখের অংশীদার হিসাবে আদি কুকিরা ত্রিপুরেশ্বরের অনুরুক্ত হয়ে উঠেন। ঐ আদি কুকির কয়েকটি গোষ্ঠী উত্তরকালে ত্রিপুরার রাজার দ্বারা 'হালাম' উপাধি লাভ করেন।

উপরি বর্ণিত লেখা হতে এটা বলা যেতে পারে যে, হালাম আখ্যা লাভের প্রাককালে তারা কি নামে আখ্যায়িত ছিল। কিন্তু এখনো সম্যকভাবে অর্থ উদ্ধার হয়নি যে হালাম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি ? এবং কার দ্বারা এই শব্দটি ভূষিত হয়েছিলেন। 'রাজমালায়' ও 'কৃষ্ণমালায়' হালাম সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই বটে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কুকিদের নাম সেখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কৃষ্ণমাণিক্যের সময় বৃটিশরা সমতল ত্রিপুরার উপর প্রথম আধিত্য বিস্তার আরম্ভ করেন এবং ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ে কর নিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার মহারাজাও ঐ সুযোগের হাতছাড়া না করে নিজের রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করে নিতে বাধ্য হন। সীমানার পার্শ্ববর্ত্তী আদিবাসীরা যারা ত্রিপুরার আদিবাসী তাদের মহারাজা ত্রিপুরার সীমানার আওতায় নিয়ে আসেন। ১৭৬০ খ্রাষ্টাব্দে বৃটিশরা যখন সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে সামরিক বলে করায়ত্ব করে এইসব রাজ্যের উপর কর নেয়া শুরু করলে ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে ত্রিপুরাও রেহাই পায়নি। খুব সম্ভবতঃ বৃটিশদের মোটা অঙ্কের খাজনা প্রদানের তাগিদেই ত্রিপুরার মহারাজারা শেষে অবাধে জুম চাষীর উপর কর নেওয়া শুরু করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর নাম দ্বারা সাধারন জুমিয়াদের তাদের পরিচয় পাওয়া যেত। ঐ বিভিন্ন নামধারী ছোট ছোট সংখ্যা

লঘু জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে ত্রিপুরার মহারাজা নতুন নামকরন করেন 'হালাম' । অন্যথায় তাদের প্রত্যেকটি উপগোষ্ঠীর নাম স্মরণে রাখা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল । উত্তরোত্তর উক্ত নাম সরকারী নথীভুক্ত হয়ে নিজ নিজ এলাকায় বসবাসকারী হালাম সর্দারদের মারফৎ জানিয়ে কর নেয়া শুরু করেন, তাকে বলে 'কাউসুমারী' ।

উপরে বর্ণিত কাহিনীর সারসংক্ষেপ হতে আমরা সুনিশ্চিতভাবে ধারনা করে নিতে পারি, হালাম শব্দটি রাজার দ্বারাই ভূষিত । বস্তুতঃ হালাম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি হয় এবং কার নাম সংযোজনে উক্ত উপাধি ভূষিত হয়েছিল তা নিয়ে কিছু আলোকপাত প্রয়োজন । সুপ্রাচিন কাল থেকে হালাম, কুকিরা ত্রিপুরার আদিবাসী এবং রাজার খুব অনুগত প্রজা ছিলেন । প্রাক্‌মাণিক্যে রাজত্ব কালে ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন হালাম (কুকিদের) সঙ্গে এক নিবিড় আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তা রাজমালাতে কিছু সঙ্কেত পাওয়া যায় । উক্ত আদি কুকিরা মনু নদীর পার্শ্ববর্ত্তীস্থান এবং তদানীন্তন ছামনু এলাকা তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল কিন্তু উত্তরকালে কোন কারনে তাদের মূলভূমি থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে সিলেট, হিরম্ব ও আরো অনেক ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে । খুব সম্ভবতঃ উক্ত কুকিদের বিকৃত নাম উত্তরোত্তর হাঙ্কালা হতেই হালাম শব্দটি আসে বলে ধারনা করা যায় । আবার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষন করতে গেলে অর্থ নির্গত হয় যে 'হা' অর্থাৎ ভূমি, 'লাম' অর্থাৎ যাত্রা সংযোজিত হয়ে অর্থাৎ ভূমিতে যাত্রা । এতএব এই শব্দটির উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, সুপ্রাচীনকালে কোন না কোন সময় তারা রাজার অনুগত প্রজা সাধারন ছিলেন বটে । কিন্তু কালক্রমে জুম চাষের উদ্দেশ্যে রাজার অঙ্গণ হতে ধীরে ধীরে নানাদিকে সরিয়ে পড়াতে রাজ সদন থেকে তারা অনেকদিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে । যদিও নুতন কুকিরা ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে আদি কুকি অর্থাৎ হালামের কাছে প্ররোচনা দিলেও রাজার প্রতি আনুগত্যে উক্ত গোষ্ঠী কোন সময় সংস্রব ত্যাগ করেনি । তাই বার বার নুতন কুকিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পরিশেষে আপনার আদি ভূমিতে আবার প্রত্তাবর্তন অর্থাৎ যাত্রা করেছে বলে তাদের ত্রিপুরার রাজা 'হালাম' নামে অভিহিত করেন ।

হালামদের সর্ম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনার অভাবে গবেষকরা নানা মত নানা জনে অবতারনা করে থাকেন । অতএব যথাযথভাবে একক প্রমান নিদর্শন ছাড়া যুক্তির দ্বারা অনুসন্ধানের কাজে সাজিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে যায় । যুক্তির কোন ব্যাপার নেই । এমনকি যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা লোক বিশ্বাসের প্রতিকূল থেকে অনুকূলতার দিকে নিয়ে আসা যায় । কিন্তু সত্য অর্থের আরেকটি অর্থ এখানে কোন স্থান করে নেয় । এতএব সত্যকে উপস্থাপন করতে হলে চাই, সাক্ষ্য বহনকারী তথ্য সম্বলিত পুরাতন গ্রন্থ যা গ্রন্থাগারে বহু যুগ থেকেই সংরক্ষিত । কিন্তু এইসব গ্রন্থ সহজলভ্য না হওয়াতে অনুসন্ধানকারীরা অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধারনার উপর মত প্রতিষ্ঠা করে তথ্য লেখার কাজ নিস্পন্ন করে নেয় । তার

পাশপাশি রাজ মুহুরীদের অবহেলার জন্য গোষ্ঠীর নাম নথিভুক্ত করার সময় রদ বদল হয়। কোন আগন্তুক গোষ্ঠীকে নিয়ে বিভ্রান্তের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে হালাম উপগোষ্ঠী তালিকাতেই তা সংযোজন করে মিটিয়ে ফেলা হয়। তাই প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর আদম সুমারীতে হালাম উপগোষ্ঠীদের ছোট ছোট গোষ্ঠীর ক্রমিক সংখ্যা নিত্য নুতন গোষ্ঠীর সংযোজন হতে থাকে। বস্তুতঃ প্রকৃত হালাম মাত্র বার দফাতে বিভক্ত ছিল। তারমধ্যে ভাষাগত কারণে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কোন কোন ঐতিহাসিক হালামকে তেরটি দফায় বিভক্ত করেন। আবার কেউ আঠারোটি উপগোষ্ঠী। আবার কোন কোন আদম সুমারীতে ষোলটি দফায় বিভক্ত বলেছেন। লোক প্রবাদেও আছে বার হালাম রাজার অনুগত প্রজা সাধারণ। কিন্তু কোথাও কোথাও বার আবার কোথাও বার, আঠারো, ষোল, তের কেবল বেড়েই চলেছে। তার কারন হচ্ছে অজ্ঞাতসারে একই গোষ্ঠীকে দুইটি নামকরন করে দেখানো হয় যেমন বঙ্গ এবং বঙ্গচের, কাইলং এবং কইরেং, মলসম এবং মুরসুম। তাই তাদের ছোট ছোট উপগোষ্ঠী ক্রমেই বেড়ে চলে। হালামদের অর্ন্তভুক্ত গোষ্ঠীর ক্রমিক সংখ্যার বৃদ্ধি প্রথম ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে পরিলক্ষিত হলেও পরবর্তীকালে আদমসুমারীতে অর্থাৎ ১৯৫১ এবং ১৯৬১সালে কিছুটা সংশোধিত হয়। কেউ বলেন যে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন সম্প্রদায় ডাফরফার সময়ে প্রথম ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে মত পোষণ করে থাকেন। আবার কোন কোন গবেষক উক্ত সম্প্রদায়রা ষোড়াশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম অর্ধে ত্রিপুরাতে আদেস বলেও অভিমত পোষণ করেন। কারুর মতে উক্ত নাকি মহরাজার দয়া পরবশে শরনার্থী হিসাবে এসে ত্রিপুরায় এসেছিল। এই কয়েকটি অভিমত থেকে ধরা যায় যে, তাদের মধ্যে একে অপরের মত পোষণে একেবারে ঐকত্য নেই বললেই চলে। তাই এইসব বহু মতের উদ্ধৃতি থেকে অনুসন্ধানকারীদের গ্রহণ করাও সহজসাধ্য নয়। যাইবলুক না কেন বিজ্ঞ ঐতিহাসিকরা হালাম অর্থাৎ আদি কুকিদের ত্রিপুরার আদিবাসী বলে অঙ্গুলী সঙ্কেত করেছেন তা অনস্বীকার্য। তারা প্রাগৈতিহাসিক যুক থেকে ত্রিবেগ তথা ত্রিপুরাতে কিরাত আবাস ভূমি বলে অভিমত করেছেন। প্রাককালে ঐ কিরাতরা ছিলেন বর্বর এবং ম্লেচ্ছ জাতি কোন প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আগে অগ্রে তাদের ব্যবহার করা হত তা রাজমালাতেও বর্ণিত আছে। বর্বরতা পরিহার করে তারা যখন কোন রাজাকে অনুসরণ করে চলতে শুরু করে। খুব সম্ভবতঃ তখনই কিরাত থেকে নামান্তরে স্ব স্ব রাজার ভূমিতে বিভিন্ন নামে মূষিত হয়। তদবধি তাদের আরাধ্য দেবতা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত সনাতন দেব দেবী। হালামভুক্ত রূপিনীদের লোকগীত শ্রবন থেকে সহজে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, সুপ্রচীনকালে 'শিবরায় রাজা' ওরফে ত্রিলোচন ত্রিপুরেশ্বর নাকি কিরাত জাতির উপর হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত সনাতন ও শৈব্য ধর্মকে উক্ত জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন।তাই ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচনের অধীনস্থ যত প্রজা যারা ত্রিবেগ নগরের আদিবাসী রাজার আর্যধর্ম, শৈব্য ধর্মের

নিয়ম বিধি অনুসারে বিবাহ, পূজা পার্ব্বন, মৃত্যুর পর দাহ প্রভৃতি সম্পন্ন করে এসেছে। হালামদের মধ্যে এখনোও বিবাহে মন্ত্র উচ্চারনকালে শিবরায় রাজা নামজুড়ে বিবাহাদি সম্পন্ন করতে হয়। অতএব এখনো হালামদের কাছে শিবরাই রাজার নাম বিরাজ করছে এইটাই প্রমান্য । উক্ত হালামরাই উত্তরকালে রাজা ও রানীকে 'ফা' ও 'মা' বলে উপাধি প্রদান করেন তা রাজমালাতেও বর্ণিত আছে। সন্দেহ নেই যে হালামদের আদিপুরুষরা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের আদি অন্ত সুপ্রজা। হয়তো রাজনৈতিক প্রশাসনিক কারনে নাম পরপর বিবর্তিত হয়ে কিরাত থেকে কুকি এবং কুকি থেকে হালামে পরিনত হয়েছে।খুব সম্ভবতঃ ত্রিপুরার রাজা মহারাজাগণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে নিজ ভাষায় প্রজা সাধারনের মধ্যে সর্দার নিয়োগ করে উপাধি প্রদান করতেন। রাজার প্রদত্ত উপাধি অর্জন করতে পারলে ঐ গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীপতি গর্বিত বোধ করতেন। রাজন্য শাসিত আমলে বছরে একবার রাজার অসম ভোজনে চার দিবসের হালামী বিশেষ সম্মান পেত । রাজতন্ত্র অবসানের পরেও হালামরা সামাজিক ও প্রশাসনিক রীতি নীতি গুলি সহজিয়া জীবন যাত্রায় আজও দূর দূর্গম পার্ব্বত্য পল্লীতে পালন করছে। প্রাচীন রাজাদের অনুসরণে শৈব্য ধর্মের দেব দেবী, উপদেবী তাদের নিত্য উপসনায় আরাধ্য দেবতা হয়ে নানা অন্ধ বিশ্বাসের কবলে তাদের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার আচরণ গুলিকে আবহামানকালে আধুনিকতার বাতাবরণ তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেলেও গ্রাস করে নেয় । কিন্তু আদিকাল থেকে চলে আসা স্রোতে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণ এবং পরিধান সমূহ রক্ষণশীল হালামরা পরিহার করতে মোটে ই আগ্রহী নন । গতানুগতিক কালে হালামরা সামঞ্জস্য বিধান করে চলার অক্ষমতা ও অগত্যার কারণেই তাদের জীর্ণ পুরাতন কৃষ্টি গুলিকে এখনও পরম মমতায় আঁকড়ে রেখেছে । তারজন্য তারা আধুনিক কালের পরিবর্তনকে এখনও এড়িয়ে আরও দূর্গম পার্ব্বত্য ভূমিতে সরে যাচ্ছে। তাই নিরক্ষরতার অভিশাপ এখনও সিংহভাগ তাদের উপর গ্রাস করে আছে তাতে সন্দেহ নেই। খেটে খাওয়া মানুষ হালামরা শুধুমাত্র জুম কৃষির উপর নির্ভর করেই বৎসরের খোরাক জোগাতে হয়, শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে উৎপাদনকে তারা জীবনের পরম পথ ও সত্য বলে বিশ্বাস করে। কায়িম পরিশ্রমে জুমে ফসল পেতে তাদের বর্ষার উপর নির্ভরশীল হতে হয় । অতএব যে বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল বিনাশ হয় । সেই বৎসর হালামদের জীবনে এক করুন অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয় । তবু তারা আদিম জীবন প্রনালী হতে বেরিয়ে আসার আগ্রহী নয় । তাই অগত্যা পার্ব্বত্যবাসী হালামরা উত্তরোত্তর দারিদ্র সীমা রেখার নীচে ক্রমেই নেমে যাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আদিকালে হালামরা যখন অবাধ স্বাধীনতায় জুমিয়া জীবনে অভ্যস্থ ছিল; তখন উর্ব্বর জুম চাষের অন্বেষণে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে তাদের বসতি গড়ে উঠে। অতএব বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে তাদের ভাষা এক মিশ্রিত ভাষায় রূপলাভ করে । বলাবাহুল্য, উত্তরকালে এই মিশ্র ভাষায়

ভাষাতাত্ত্বিকরা 'হালামী ভাষা' বলে অভহিত করেন। তবু তারা এখনো প্রাচীনকালের সেই রাজ সদনে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম ককবরক ভাষাকে বিস্মৃত হতে দেয়নি। আদি কুকি ও হালামদের বেশ ভূষা আচার আচরন, রীতি নীতি অন্য কুকির সঙ্গে প্রভেদ থাকায় বার বার কাঁচা কুকিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে রাজশূন্য ভূমিতে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাস্তুচ্যুত হালামরা দেশের কথা ভুলে যায়নি দীর্ঘ দিন প্রবাসী জীবন যাপনের পরেও। শেষে ত্রিপুরেশ্বরের আহবানে রাজার সমর্পিত প্রাণ হালামরা ত্রিপুরার ভূমিতে আবার ফিরে আসেন। ততক্ষণে অন্য আদিবাসীরা ত্রিপুরজাতি বলে পরিচয় লাভ করে এবং রাজার সঙ্গে এক গোত্রভুক্ত হয়ে ব্যক্তি বিশেষে না হয় গোষ্ঠী বিশেষে বড় বড় রাজ উপাধি অর্জন করে রাজা দরবারে স্থান করে নেয়। সুপ্রাচীন কালের আদিবাসী, অগত্যা হালামরা ত্রিপুরাতে পরে এসেছেন বলে রাজার দ্বারা সাধারণ্যে প্রজার পরিচয় হালামী উপাধিটি অকুন্ঠিত মনে সেই দিনও বরণ করে নেন। যদিও হালাম গোত্রের কিয়দংশ গোষ্ঠী প্রাককালে রাজ কর্মচারী পদ লাভের জন্য রাজার সদনে আশ্রয় নিয়েছিল; ততক্ষণে তারাও রাজা দরবারে 'বাছাল' সম্প্রদায় উপাধি লাভ করে রাজ কর্মচারী হিসাবে তাদের রাজ কর থেকে অব্যাহতি পান। কিন্তু ত্রিপুরার রাজা কর্তৃক বার গোত্রে এক হালাম গোষ্ঠী বলে যেই দিন থেকে ভূষিত হয়, সেই দিন থেকে প্রতি বৎসরে একবার হালামরা রাজাকে কর প্রদান শুরু করেন। অবিভক্ত ত্রিপুরার আদিম অধিবাসী নুতন ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশের পরও সেই পেছনে ফেলে আসা জুম ভিত্তিক জীবন যাত্রাকেই তারা আবার মুখ্য পেশারূপে অবলম্বন করতে হয়। প্রজা হালামরা ত্রিপুরাতে পুনরায় আসার পর পরিত্যক্ত জনবিরল অরন্য পার্ব্বত্য ভূমি ছাড়া আর কোন স্থানে তাদের ভাগ্যে জুটেনি। এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলেই ত্রিপুরার মহারাজা হালামদের প্রথম পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আকাশচুম্বী আধুনিকতার বিলাসিতার দিনে, বিংশ শতাব্দীর মহা অভিশাপ নিরক্ষরতাকে অঙ্গে জড়িয়ে, নিঃস্ব এবং দীনতা মাথা পেতে নিয়ে, তারা এখনো সেই পুরানো কায়দায় জীবন যাপন করছেন। তাতে নব্য ত্রিপুরাবাসী এবং হালমাদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যর উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই অশিক্ষা ও দীনতা আপন সর্ব্বস্ব-দৈন্য হালামদের চিত্তে কিঞ্চিৎ মাত্রও দোলা পড়েনি। যারা কালসন্ধির আর্বতনের মাঝে ও অবিচল, অম্লান এবং নির্ব্বাক চিত্তে আদি হতে চলে আসা নিজেদের সীমিত জীবন-যাত্রার মধ্যে সঁপে দিয়ে এবং একেই একান্ত নিজস্ব বলে আঁকড়ে রেখেছেন তারা হচ্ছে, যেমন ঃ- মলসম, কাইপেং, বঙচের, করবং, ছাইমাল, ধব, লঙ্গাই ইত্যাদি। গতানুগতিক যারা আধুনিক কালের সংস্পর্শে কিছুটা জাগ্রত হয়েছেন এবং মানদ্ধাতা আমলের আচার আচরনের মোড়ক থেকে বেড়িয়ে কাল-সন্ধির অগ্রগতির বাতাবরনে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তারা হচ্ছে ঃ কলই, রূপিনী, রাংখল, চরুই, লাললঙ ইত্যাদি।

যাইবলুক না কেন অতি অগ্রসর কিংবা স্বল্প অগ্রসর প্রশ্নের উদ্ভব হয় ইদানীং কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজার দ্বারা অতীতের প্রদেয় গোষ্ঠীর নাম এখনো সমগ্র হালামরার কাছে এক দীপ্তমান হয়ে আজও বিরাজমান। রাজতন্ত্রের সূর্য অস্তমিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ প্রদত্ত 'অসম ভোজন' কালক্রমে বিলীন হয়ে গেলেও রাজার দ্বারা ভূষিত 'হালাম' নামাকরণ গোটা হালামদের মধ্যে এখনোও বাঁচিয়ে রেখেছে, এবং সম্মিলিত কন্ঠে বলে "আজও, 'আমরা হালাম" ।

তৃতীয় অধ্যায়

লোক-ইতিহাসের আলোকে রূপিনী সম্প্রদায়

কিংবদন্তীর আলোকে রূপিনী ঃ

সুপ্রাচীন কালে রূপিনী বলে কোন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। কালক্রমে কারনে কারনে রূপিনী নামটি উদ্ভব হয়েছিল বলে লোকশ্রুতি থেকে পাওয়া যায়। ত্রিপুরেশ্বর 'সুবরাই রাজা' অর্থাৎ হরফে ত্রিলোচন ছিলেন অত্যন্ত শিব ভক্ত এবং শিল্প অনুরাগী রাজা। কিন্তু স্বয়ং রাজার বিবাহের বিলম্বতায় ত্রিপুরার সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রজা ও স্বজনের মধ্যে প্রবল উদ্বেগ ছিল এবং তা সমগ্র রাজ্যবাসীর মধ্যে হিড়িক পড়ে যায়। অতএব প্রজার আবেদনে সাড়া স্বয়ং রাজা উপলব্ধি করতে পারেন। প্রজার মনস্কামনা পূরনের প্রয়াসে একদিন বিবাহের সম্মতি প্রকাশ করেন এবং তা দেশ বিদেশে ঘোষণা করে দেন। ইহা শুনে সমগ্র দেশের প্রজা সাধারনের ঘরে ঘরে গর্জে উঠে, মহানন্দের উল্লাস ধ্বনি এবং দেশ ব্যাপী মেতে উঠে রাজ্যে মঙ্গল আগমনের স্বাগত গীত ধ্বনি। তাতে ত্রিপুরেশ্বর সুবরাই খুবই উষ্ণ সাড়া পান। তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করলেন যে যখনই প্রজার মনোকামনা পূর্ণ করার জন্য বিবাহ করবেন; অতএব তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হবে, সমরস এক বৃহৎ আয়োজনের মধ্য দিয়ে, যা ইতিপূর্বে কোন রাজার বিবাহের সময় ঘটেনি। সিবরাই রাজা তদানীন্তন বিশাল জন-গোষ্ঠী কিরাত জাতি থেকে, যাঁরা একক শিল্প কর্মে নিপুন, দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরম সাদরে রাজবাড়ীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। উক্ত কিরাত গোষ্ঠীরা রাজধানীতে (রাজাখুণ্ড) এবং রাজার বিবাহের আয়োজনার্থে উৎফুল্ল মনে সমগ্র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্ব স্ব কর্মের দক্ষতা অনুসারে। তাঁরা নিজ নিজ নিপুন কাজের দক্ষতা প্রদর্শন করে, সেইদিন বিবাহের অনুষ্ঠানকে সামগ্রিক

সামঞ্জস্যতায় সার্থক করে তুলেছিলেন, যা তৎকালীন যুগের এক অভিনবত্বের ব্যাপার। এইরকম জাঁক জমক পূর্ণ বিশাল আয়োজনের মধ্যে রাজার বিবাহ পূর্ব্বে প্রজারা কোন রাজার আমলে দেখেনি বা শুনেনি। এতে সুবরায় রাজার বিবাহ তাদের কাছে এক অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে। এদিকে সবরকম নিখুঁত আয়োজনের মধ্য দিয়ে কিরাতদের অকৃত্রিম শ্রমদানের মাধ্যমে বিবাহ নিস্পন্ন হয়েছিল; অন্যথায় তা সম্ভবপর হত না। ঐ কিরাতদের প্রতি সেদিন মহারাজা বুকভরা চির কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। তাই বিবাহের অনুষ্ঠান পূর্ণ সমাপ্তি হলে সেইদিন সুবরায় রাজা ঐ বিবাহের জন্য শ্রমদান কারীদের সবাইকে ডেকে নিয়ে, তিনি তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং স্ব স্ব কাজে তাদের দক্ষতা অনুসারে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন বলে তাদের প্রত্যেকটি কাজের দক্ষতা অনুসারে এক একটি উপাধি ত্রিপুরেশ্বর তাদের প্রদান করেন। তারপর সেই দিন থেকে সুবরাই রাজা তার রাজধানী 'সুবরায়খুঙ' এর সান্নিধ্যে তাদের বসতি স্থাপনের সুব্যবস্থাও করে দেন। সুবরায় রাজার মৃত্যুর পর এই ভাবে পরবর্তী কয়েকজন রাজার শাসন কালেও কিরাত গোষ্ঠিরা পূর্ব্বে সুবারাই রাজার প্রদত্ত সাম্মাণিক উপাধি স্মরণ করেও সুসম্পর্ক বজায় রেখে আত্মীয় তায় ছোট ছোট উপগোষ্ঠীগুলি বসবাস করতে থাকেন। এই কর্মভিত্তিক বিভাজিত শ্রমবর্ণকে সেই যুগের ভাষায় "পাঞ্চি" বলা হত। উক্ত গোষ্ঠীরা ভিন্ন ভিন্ন পাঞ্চিতে বিভ ক্ত হয়ে গেলেও, একটি কথা তারা কোন সময় বিস্মৃত হননি, যে সুবরায় রাজার দয়ায় রাজভবনে সম্মান লাভের কথা। এই কৃতজ্ঞতা বোধের কথা স্বরূপ তাদের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী বোধে পরবর্তীকালে 'আরও সুসম্পর্ক অটুট থাকে এবং রাজার প্রতি তাদের আনুগ্যততা অপরিসীম ছিল। কোন কারনে ত্রিপুরেশ্বর 'সুবরায়খুঙ' পরিত্যাগ করে 'সুরমাহালুং' নামক জায়গায় এসে নুতন রাজপাট স্থাপন করলে, রাজার সুদিনের আমন্ত্রিত কিরাত গোষ্ঠী রাজার দূর্দিনের দিনেও ছায়ার মত তাঁকে অনুসরন করে নুতন রাজপাটে এসে বসতি স্থাপন করেন। রাজ ভক্ত গোষ্ঠীরা পূর্বের ন্যায় রাজভবনের সংলগ্নে বসবাস করে স্ব স্ব দক্ষতা অনুসারে কাজ অব্যাহত রাখেন। নুতন রাজধানীতে গিয়ে সবাই রাজভবনের প্রাঙ্গনে আবাস স্থাপন করার নিমিত্তে ছুটে এসে বসতি গড়ে তুলেন, পূর্বের রাজধানী 'সুবরায়খুঙ' হতে দ্বিগুন লোক বেড়ে যায়। বহুল জন সমাবেশে রাজপাট গড়ে উঠার পর এই নুতন রাজধানীর নাম দেওয়া হয় 'খুঙমা'। এই জনস্রোতের মাঝে ভেসে আসা বহু প্রতিভাধর রাজার সদনে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেঁউ কেঁউ বুদ্ধিজীবি, কারিগরি শিল্পেদক্ষ ও অন্যান্য কাজে দক্ষ ব্যক্তিরাও জড়ো হয়। তারা নুতন রাজপাট 'খুঙমাতে' এসে রাজভবনে কাজ পাবার প্রয়াসে নিবিড় ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে নেন এবং স্ব স্ব কাজের দক্ষতা জাহির করে ত্রিপুরেশ্বরের মন জয়ী করে একাত্ম করে নেন। এই নবাগতদের কাজের দক্ষতা ও নিপুনতায় এবং তাদের শিষ্টাচার সুমধুর ব্যবহারে উত্তরোত্তর রাজাকে মুগ্ধ করে তুলেন অন্যদিকে যারা প্রাক্‌কাল হতে রাজভবনে

বসবাস করে এসেছেন, যাদের সূক্ষ নিপুন কাজের জন্য রাজভবনে আমন্ত্রন করে আনা হয়েছিল তাদের কাজকর্মে তাচ্ছিল্লতা উত্তরোত্তর প্রকাশ পেতে থাকেন। ত্রিপুরেশ্বরের অপ্রত্যাশিত আচরন এবং নবাগতদের প্রতি তার পৃষ্ঠপোষকতা ঐ কিরাত গোষ্ঠীদের কাছে বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় মর্মে আঘাত করে। যেখানে সুবরায় রাজার আমল হতে শুরু করে কত রাজার রাজত্বকাল পেরিয়ে মহারাজার সহমর্মিতায় ঐ কিরাত গোষ্ঠিরা রাজভবনে বসবাস করে এসেছিলেন; সেখানে তারা আজ রাজার কাছে অপাংক্তেয়। ক্ষোভে অভিমানে জর্জরিত আদি কিরাত গোষ্ঠি তথা ছোট ছোট 'পাঞ্চি' ভুক্ত সম্প্রদায়গুলি রাজার এই ব্যবহারে ছাইচাঁপা আগুনের মত জ্বলতে থাকেন। শেষে তারা সম্মিলিত ভাবে গোপনে স্থির করেন যে, তারা রাজভবন পরিত্যাগ করে জুমচাষ অবলম্বন করে অন্যত্র কোথাও গিয়ে জীবন যাপন করবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ এই নুতন পথ বেছে নেয়াই দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন। কারন এতদিন তারা রাজভবনে বিলাস বসনে ছিলেন। এই হতাশার দিনে তাদের মধ্যে বয়ঃজেষ্ঠরা কিরাত জাতির পৃষ্ঠপোষক সুবরাই রাজার বাক্য বার বার সকলের মনে স্মৃতিচারন করে দিলেন, ফলে সেই নুতন পথের অভিযানের সংকল্প সকলের মধ্যে সাহস জোগায়। স্বয়ং সুবরায় রাজার এই অল্প পরিসরের বাণী এবং যা কিরাত গোষ্ঠিদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় সশ্রদ্ধে পালন করে এসেছিলেন, এই বাণীটি হচ্ছে যেমন ঃ "তাঙগয় চাখাইসে সাগ বাইথাঙ সাগ বাচাই মান' তাঙগয় চাখাইসে মাইথাই খুলবার বারবী'/ সামুঙ তাঙমানি বুইনি সেলেংমা অঙয়া / তাঙগয় চামানি বুই-ন খা' সলাক না নাঙয়া /,, (অর্থাৎ শ্রম করে যারা তারাই স্বনির্ভর হয়। শ্রম করলেই ধান কার্পাস ও ফলে। কায়িক পরিশ্রম করা কোন ঘৃণ্য কাজ নয় কার্যতঃ শ্রম করলে অন্য কারোর পদলেহন করতে হয় না।) সেদিনের বানী স্মরন করেই সেই দিন সুবরায় রাজা দেশবাসীর উপর সেই অপরিহার্য্য বাণী স্মরণ করে ছিলেন, তা শ্রমের কোন বিকল্প নেই একথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সুবরায় রাজার বাণীকে কার্যে বাস্তবায়িত করার লক্ষে বার "পাঞ্চি" ভুক্ত কিরাত গোষ্ঠিরা, এক যোগে দল সমেত প্রথম যাত্রা করেছিলেন জুম কৃষির অন্বেষণে। কিন্তু তাদের সঙ্গে একযোগে একটি মাত্র দল যোগদান করেনি সেইদিন। তারা হল লোহা কারিগরীর 'পাঞ্চি' অর্থাৎ দলটি। এই একটি কাজের পাঞ্চি ভুক্ত অর্থাৎ উপগোষ্ঠীরা রাজবাড়ীতে রাজার নিকট অপরিসীম মর্যাদা পেত। ত্রিপুরেশ্বর ছলে বলে কৌশলে উক্ত পাঞ্চিদের বশ করে সেইদিন রাজভবনে থাকতে বাধ্য করেন। ততক্ষনে তাদের বাকী অংশে বিশাল দল নিয়ে খুঙমা হালুং পরিত্যাগ করে যেতে যেতে দুরে এক প্রাকৃতিক মনোরম নির্জন পার্ব্বত্য এলাকায় পৌছে, এই স্থানটির নাম ছিল রুপা। এই নির্জন স্থানের পাশ দিয়ে নির্মল ও শীতল নদীর জল কল্ কল্ করে বয়ে যাচ্ছিল, যা উক্ত ভূমি মাঝে দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী, যার নাম, অঞ্চল জুড়েই অভিহিত ছিল 'তৈয় রুপা'। নির্মল জলের স্রোতস্বীণি নদী অপূর্ব প্রাকৃতিক বাহার, স্নিগ্ধ বাতাবরন, সামগ্রিক

ভাবে ঐ কিরাত গোষ্ঠীকে সেই স্থান ভীষণ মোহিত করে দেয়, শেষে সেখানেই তারা বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। প্রাককাল হতে গোটা গোষ্ঠীর লোক যারা উক্ত অঞ্চলে বসবাস করতেন, অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উত্তরকালে রূপিনী বলে চিহ্নিত করা হতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

রূপিনী গোষ্ঠীর প্রথম উৎপত্তি

লোক ইতিহাসে রূপিনীদের উৎপত্তি সম্পর্কে একাধিক কাহিনী থাকলেও এইসব লোকমুখে কথিত প্রবাদ এবং জনশ্রুতির উপরই অনেকটা নির্ভর এবং যা গোটা রূপিনীর সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল হতে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। রূপিনীদের সম্পর্কে প্রাকলিখিত পুঁথী সুলভ না হওয়াতে গোটা গোষ্ঠীর সার্বজনীন স্বীকৃত লোক-কথাই, তাদের ইতিহাস বলে ধরে নিতে হয়। এই সর্বজন কথিত উপকথা, লোককথা কতিপয় স্মৃতি প্রখর বয়ঃবৃদ্ধ ব্যাক্তিদের কাছে সংরক্ষিত থাকলেও অনেক বয়স্ক ব্যাক্তি কালক্রমে এই জগৎ হতে বিদায় নেন, এবং তার সাথে সাথে এই সব কাহিনীও বিলীন হয়ে যায়। যেকোন অলিখিত তথ্যাদি উত্তরোত্তর লোকের মুখে মুখে পড়ে অতিরঞ্জিত রূপ লাভ করে - পরিশেষে তাহা মূল বিষয় বা ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, মূল ঘটনাবলী হতে কিছুটা তারতম্য দেখা দেয়। তাই সযত্নে সেখান থেকে মূল অংশটি নিয়ে, সেই বিক্ষিপ্ত লোক ইতিহাসকে এক যোগে খুঁজে জোড়ে - রূপিনীদের অতীত ইতিহাস অবয়ব করতে হয়, যা দুই থেকে সাত জন বয়ঃবৃদ্ধদের কাছে শুনা কাহিনীকে - মূলতঃ যেখানে পরস্পরের কাহিনীর মূল ভাবটি ঐক্য এবং সামঞ্জস্যতা আছে তাহাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

জনশ্রুতি হতে জানা যায়, সুপ্রাচীন কালে রূপিনী গোষ্ঠির নাম অভিহিতের প্রাককালে উক্ত গোষ্ঠিরা কৃষি কার্যের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করতেন না, মধ্যবর্তী কাল হতে রূপিনীরা কৃষি কার্যের চর্চায় মনোনিবেশ করেন। রাজার সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্কেই হোক বা রাজার বিশ্বস্ত গোষ্ঠি হিসেবেই হোক, তখন থেকেই ত্রিপুরার রাজরাজাড়ার সঙ্গে উক্ত গোষ্ঠিদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রতিদিন উক্ত গোষ্ঠিরা রাজভবনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করিতেন এবং তার বিনিময়ে যাহা কিছু দেওয়া হত তা নিয়েই তাদের জিবিকা নির্বাহ হত। এই সব দ্রব্যাদির মধ্যে হচ্ছে যেমন ঃ বন্যজাত দ্রব্যের মধ্যে হাতীর দাঁত, শিকারের মাংস, বন্য শাকশব্জী, ফল, আরও অনেক কিছু। আবার হাতের শিল্পজাতের মধ্যে যেমন ঃ কাষ্ঠশিল্পে গড়া নানান দ্রব্যাদি এবং বাঁশ ও বেঁতের নিপুন কার্য্য যা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আর রাজবাড়ী থেকে প্রদত্ত তুলার সাহায্যে নিপূন কারুকার্যে

খেস বস্ত্র যাহা নিজের জন্যও কিছু রেখে উৎপাদনের বাকি অংশ রাজবাড়ীতে প্রেরন হত। রাজ পরিবারের রোগ নিরাময়ের জন্য নানান তিতা জাতীয় ঔষধি লতা ও মূল উক্ত গোষ্ঠীর বদ্য শ্রেণীর লোক সংগ্রহ করে রাজভবনে প্রেরন করতে হয় বলে জানা যায়। এই সকল দ্রব্যাদির বিনিময়ে ত্রিপুরেশ্বর তাদের ধান, তুলা এবং লোহাজাত দ্রব্য প্রদান করিতেন যাহা তাদের জীবন ধারনের জন্য এক অপরিহার্য্য উপাদান ছিল। জন শ্রুতি হতে জানা যায় যে কৃষি কার্যের চর্চা ও লোহার ক্ষুদ্র শিল্প শুধু রাজবাড়ীতেই গড়ে উঠেছিল; তাছাড়া বন্য জন্তুদের ধরে নিয়ে বাড়ীতে পোষ মানানোর কাজ শুধু রাজবাড়ীতেই হত। এই সব কার্যকে প্রাককালে কিরাতরা রাজকার্য বলেই স্বীকার করে এসেছিল, কিন্তু অবচীন কাল থেকে কৃষি চর্চা, পশুপালন, হাতের শিল্প এবং কিছু কিছু লোহার ব্যাবহার শুরু হয়। কিন্তু এর আগে যারা বর্বরতা পরিহার করে একজন সহজাত রাজাকে অনুসরণ করেছিল এবং তাদের বসতিও রাজবাড়ীর সংলগ্নে স্থাপন করে থাকে। এই সব কিরাত গোষ্ঠীরা রাজার দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন ছাড়া তাদের আর কোন কাজ ছিল না। তারা কেউ কেউ, রাজার কৃষি খামার বা জুম কৃষির দেখাশুনার কাজ, আবার কেউবা পশুপালনের কাজে বহাল থাকত। কোন কোন গোষ্ঠী রাজার বিশ্বস্ত হলে রাজভবনের ভিতর রাজপরিবারদের সেবা যত্নের কাজে বহাল রাখা হত। এই সকল গোষ্ঠীরাই আবার যুদ্ধ হলে রাজার অগ্রবাহিনী হিসাবে বিবেচিত হত এবং প্রাণপনে যুদ্ধ করে রণক্ষেত্রে সহজাত্য রাজার জন্য আত্মবলী দিত। সেকালে রাজার সঙ্গে সাধারণ প্রজা কিরাতদের সম্পর্ক ছিল দাস ও প্রভুর সম্পর্ক। সাধারনত ত্রিপুরেশ্বররা নাকি সেই যুগে প্রজাদের খুব উৎপীড়ন করতেন এবং ভোগ ও বিলাস বসনে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন। রাজপুত গোত্রের উত্তর বংশীয় বলে তারা স্থানীয় বর্বরজাতি কিরাতদের শৈব ধর্ম এবং কিরাতদের আরাধ্য দেবতা শিবকে ও তাচ্ছিলতার চোখে দেখতেন। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিহাস রাজমালাতে ও এই কথা বর্ণিত পরিলক্ষিত হয় যে ত্রিপুরার রাজার ৪০তম উত্তর পুরুষ 'ত্রিপুর' নামে ত্রিপুরাতে এক রাজা ছিল। এই রাজার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর ত্রিপুরার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কেউ নেই। তিনি ছিলেন খুব অত্যাচারী এবং ভোগ বিলাসী রাজা, তার অত্যাচারে সমস্ত দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। শৈব ধর্মের নীতি অনুসারে শিবের পূজা অর্চনা এই সব উপেক্ষা করতেন এবং তিনি নিজেকেই শিবের ন্যায় শক্তিমান ও প্রভাবশালী বলে প্রচার করতেন। সত্যি সত্যিই এক দিন স্বয়ং শিব এসে তাকে কুকর্ম হতে বিরত থাকার জন্য সাবধান বাণী শুনালে তখন "ত্রিপুর" রাজা শিবের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেন। তারপর শিবের সঙ্গে রাজার তুমুল যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল এবং শেষে "ত্রিপুর" রাজা হেরে গিয়ে শিবের হাতেই তিনি নিধন হন। বিনা রাজায় কি করে দেশ চলবে এই কথাটি ভেবে "ত্রিপুর" রাজার মৃত্যুর পর সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে এক হাহাকার পরে যায়। তাই সমস্ত স্বজনবর্গ এবং প্রজা সাধারণ কিরাতরা নানান পশু-পক্ষী

উৎসর্গ করে এক যোগে শিবকে আরাধনা করেছিল এবং তাদের এই প্রার্থনা যে, বিধবা রানীর কোলে একটি সন্তান, এবং যিনি ত্রিপুরার সিংহাসনের উত্তরাধিকার হবেন। অনবরত এই ভাবে কিছুদিন যাবৎ এই পূজা অর্চনা ও নানান পশু পক্ষী উৎসর্গ চলার পর "শিব" অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তিনি উপাসকবর্গের সম্মুখেখে স্বয়ং দাঁড়িয়ে দেশবাসীর মনোকামনা চরিতার্থ করার নিমিত্ত আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। সেই আশীর্বাদটি হল : "রাজ্যের সুশাসনের প্রবর্তক - প্রজার হিতাকাঙ্খী - এবং শৈব ধর্মপরায়ন রাজা হিসাবে স্বয়ং 'শিব' ত্রিপুরার রাজপরিবারের তথা বিধবা রানীর কোলে জন্ম নেবেন। তখন থেকে 'ত্রিপুরার' প্রজাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না।" সত্যই একদিন বিধবা রানীর কোলে মহাদেবের ন্যায় তিন চক্ষু সম্পন্ন একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই শিশু আর কেহ নয়, সবাই তাকে মানব দেহে শিবের আবির্ভাব হয়েছেন বলে "শিবরাই" নামে অভিহিত হয়। সংস্কৃতে তার নাম রাখা হয় "ত্রিলোচন"।

সেই শিবরাই এর বিকৃতি নামই বোধ হয় উত্তরকালে রূপিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে জন প্রবাহিত হয়ে "সুবরায়" শব্দটি শুনা যায়। তার বাণী এবং অবদানের কথা লোক প্রবাদে স্মৃতিচারনে এখনো বিরাজমান। "সুবরায়খুঙ" নামক জায়গাতে নাকি রূপিনীদের আদিম আবাসস্থান বলে বয়স্ক ব্যাক্তিরা থাকেন কিন্তু সেই সুবরায়খুঙ কোথায় এবং বর্তমানে সেই স্থানটি কি নাম এসব বিষয়ে তারা অজ্ঞ। যখন তারা রূপিনী গোষ্ঠী বলে পরিচয় নেয়, তার আগে সামগ্রিক ভাবে তারা কিরাত জনগোষ্ঠীর লোক বলেই বিশ্বাস করত। আবার এই সব জনগোষ্ঠীই উত্তরকালে বহিরাগতদের কাছে "পুরান কুকি" বলেও চিহ্নিত হয়। এই কুকি শব্দটি বর্তমান কালের আক্ষায়িত নাম। খুব সম্ভবত আসাম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সমতলবাসী বাঙ্গালী ও আসামীদের দ্বারা প্রদেয় এই কুকি নামটি। এই সব গোষ্ঠীরই প্রাককালে সংস্কৃতে প্রচলিত নাম ছিল কিরাত। জি.পি.সিংহ যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন যে : "যে সকল কিরাত যারা পূর্বখন্ডে সুপ্রাচীন কাল ধরে বসবাস করে এসেছিল তারাই ভারতের প্রাচীন কিরাত তথা মহাভারতের উল্লেখিত কিরাত ছাড়া আর কেউ নন। তিনি আরোও প্রমান করেন যে, উক্ত "কিরাতরা চীন ও কম্বোজ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল, তবে এ ঘটনার কোন উপযুক্ত নিদর্শন নেই। তাঁরা বৃহৎ ভারতে অভ্যন্তরীণ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে বসবাস করেছিল এই শুধু। ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য এখানে গ্রহণ যোগ্য। তিনি বলেছেন যে :"The Kirat or Indo Monogoloids speaking language of the sino-Tibetian family, were present in India as early in the tenth century BC when the Vedic Text were composed. They were known to the Aryans as Kirats from Vedic times onwards in the Himalayan and Eastern India tracts." বস্তুতঃ যারা ব্রহ্মপুত্র বা লোহিত উপত্যকার সান্নিধ্যে বসবাসকারী কিরাত, তারা তিব্বত-বর্ম্মন ভাষাভাষী লোক ছিল। উত্তরকালে তাঁদের "কুকি-ছিন" বলেও অভিহিত করা হত। কিন্তু 'ছিন' বলতে

চীনের থেকে আগত বিদেশী নাগরিক নয়, তারা ভারতেরই স্বজাত গোষ্ঠী। The Bestae as mentioned in the Greek text were allied to the cirrhadee or kiratas. They have been called Tibeto-Barman tribes and identified with the kuki chins, Nagas and Garos. জে.পি.সিংহ যথার্থই বলেছেন যে : " The Kirata become a general designation of the tribes of the said famities at much later stage. Therefore, the question of the kirata' being the Sanskritised Name does not wise at all ". এই বক্তব্য হতে ধারনা করা যেতে পারে যে পূর্বাঞ্চলে প্রাচীনকালে 'সংস্কৃতের' প্রভাব খুব একটা বেশী ছিল না। তাই সামগ্রিক কিরাত গোষ্ঠীদের কুকি বা ছিনা বলে গোটা তিব্বতু-বর্মন বা সাইন্যুতিব্বত ভাষা ভাষীদের বাহ্যিক পরিচয় ছিল। এই ছিনা শব্দটি বিবর্তন হয়েই পরে 'ছিকাম' শব্দটি নিস্পন্ন হয়েছে তা নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায়। কিরাতরা বা পূর্বের কোন জাতি, যারা সমস্ত পূর্বাঞ্চল জুড়ে বসবাস করত, তারা সুদুর অতীতে কোন এক অঞ্চলে রাজাকে দলবদ্ধ ভাবে অনুসরন করেছিল। তাদের রাজার ভূষিত একটি রাজজাতিতে বরন করে নিতে হয়। কিরাত বা ছিনা কথাটি বিলুপ্ত হয়ে বর্তমানে ঐ রাজ ভূষিত গোষ্ঠীর নামই সদাচারন হতে দেখি এবং যে কিরাত বা ছিনা জাতির কিছু অংশ যারা আঞ্চলিক রাজাকে অনুসরন করার প্রতিপক্ষে এবং নিজেদের মধ্যে মূড়ল বা সর্দার গঠন করে তার অনুসরনে প্রাককালে নানান দূর্বৃত্তি কাজে লিপ্তছিল। উত্তরকালে গোটা পার্বত্যবাসীদের কাছে তারাই ছিকাম বা সৗকাম বলে পরিচিত। খুব সম্ভবত : আঞ্চলিক বিশেষের নাম বা কোন আঞ্চলিক রাজার ভূষিত গোষ্ঠীর নাম বঞ্চিত হয়ে কিরাত বা ছিনা গোষ্ঠীর এক শাখার সুপ্রাচীন কালের সেই কাঁচা নামটি অমুচন রয়ে যায়; তাই সেই আদি নাম ছিন বা ছিনা শব্দের বিকৃতি নাম "ছিকাম" শব্দটি উত্তরোত্তর গোটা পার্বত্য উপজাতিদের কাছে প্রচলিত থাকে। উক্ত গোষ্ঠীরা আচার আচরনে অন্যান্ন কিরাত গোষ্ঠীর আচার আচরনের সংগে কিছুটা বৈসাদৃশ্য ছিল। ছিকামরা কোন সুপরিকৃত রাজরাজার দ্বারা পরিচালিত ছিল না বলে প্রাককালে তাদের সামাজিক প্রথা প্রবল বিকৃত রূপ ধারন করেছিল এবং যাহা অপদংশ কিরাত গোষ্ঠীদের কাছে ক্রমে অপ্রিয় এবং অবৈধ প্রথা বলে তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়। খুব সম্ভবত তাদের আভ্যন্তরীন প্রথার সঙ্গে অন্যান্য পুরান কুকি বা কিরাত গোষ্ঠীদের প্রথার কোন সামঞ্জস্য নেই বলেই প্রাককালে সব সময় পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ ও ভেদ ছিল। তারা বন্য পশুপক্ষির শিকার এবং যুদ্ধ প্রিয় অধিবাসী ছিল এবং তাদের সঙ্গে সদা দাউ (দা), বল্লম, তীরধনু, ঢাল আরো অনেক ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে মুক্তভাবে চলা ফেরা করত। যারা 'অছিকাম' তারা ছিকামদের ভিষন ভয় পেত কেননা উক্ত ছিকামরা নাকি অছিকামদের প্রতি দাঙ্গা হাঙ্গামা লুটপাট করে তাদের পত্তন জুম চাষের ভূমি বা বসতির স্থানকে জবর দখল করে নিত। সমতালীয় বাসীদের নিকট আপাতত দৃষ্টিতে ছিকাম এবং অছিকামদের সামগ্রিক ভাবে "কুকি" বলে সাধারনত পরিচিত হলেও ছিকামরার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র

। (কুকি নাম করনের সম্পর্কে পূর্বেই আমি বলেছি, তাই এখানে আর সন্নিবিষ্ট করছি না)। এই অছিকাম হল যেমন মলসম, কালেং, রাঙ্খল, কলই, লুঙ্গাই, চরুই, সাখচেব, থাঙ্গচেব, এবং রূপিনী, রিয়াং ও পুরণ। প্রাককালে এই সব উপগোষ্ঠীরা কিছু না কিছু ছিকাম গোষ্ঠীদের দ্বারা নানা দিক দিয়ে লাঞ্ছিত এবং উৎপীড়িত ছিল, তাই তাদের ভয় পেত। (রূপিনিদের প্রাক জীবন ধারায় ছিকামদের কথা অবিচ্ছেদ্য ঘটনা ছিল, তাই স্থুল বাক্য বলে এই সব ঘটনাবলীকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না)। "ছিকাম চবা" অর্থাৎ ছিকাম গোষ্ঠীরা অন্য নিরীহ জাতীর উপর দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুটপাট ইত্যাদি হিংসাত্মক কার্যকলাপের অপর নাম। অন্যান্য কুকিরা শেষে অতিষ্ঠ হয়ে বরবক্রের উপত্যাকার দক্ষিন-পশ্চিম পাহাড়ী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেছিল। তদানীন্তন এই সকল অঞ্চল ত্রিপুরার অংশ ছিল বলেই কৃষ্ণমানিক্য ১৭৫০ - ৬০ সনের মধ্যে বিদ্রোহী কুকি বা ছিকামদের দমন করে নিজের কবলে নিয়ে আসেন, এর আগেও বহুবার ত্রিপুরার রাজা ছিকাম কুকি দমন অভিযানে গিয়েছিলেন এবং তবু বার বার ঐ কুকিরা মাথা তুলে ত্রিপুরেশ্বরের বিরোধে নানান দূর্বৃত্তির মাধ্যমে অতিষ্ঠ করে তুলত।

যাই বলুকনা কেন, সমগ্র উত্তরপূর্ব খন্ডের আদিবাসী কিরাত বা ছিনা জাতীয় শাখা প্রশাখা গোষ্ঠী উপগোষ্ঠী ছাড়া অন্য কেহ নয়। লোহিত বা ব্রহ্মপূত্রের উপত্যকার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে যারা প্রাককালে বসবাস করত তারা গুহার ভিতর বাস করত, এবং তারা ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করায় অভ্যস্ত ছিল। পরিধানে বস্ত্র ব্যবহারের অজ্ঞতা ছিল, শুধু গাছের পাতা ও ছাল দিয়ে নিম্নাঙ্গ আবৃত ছিল এবং বাকি অর্ধাঙ্গ অনাবৃত। নারী পুরুষ সবাই একই পরিধান পড়ত। কৃষি, অঙ্গ বস্ত্র বুনা, লোহার ব্যবহার তারা কোনটাই জানতনা শুধু কায়িক পরিশ্রম ও শক্তির ব্যবহারে সেকালে অনেক কিছু কাজ সম্পন্ন করে নিত।ভি.এন.স্মিথ একটি বইয়ে যথার্থই মন্তব্য দিয়েছিলেন যে : **The wild race or savage, corering themselves with the Skins of wild beasts having clow like nails storng enough to rip up row fish and split softes kinds of wood and ignorant of the use of iron (10).** এই সব মন্তব্য হতে সহজেই অনুমিত হয় যে আদিকালে গোটা পূর্বাঞ্চলের বন্য জাতির কি অবস্থা ছিল এমনকি তারা সাধারন ঘর বানিয়ে ইহার ছাউনির নিচে বাস করারও অক্ষম ছিল। তার সম্পর্কে **G. P. Singh** এর একটি বইয়ের কথা প্রানিধান যোগ্য : **The Discovere of some Caves in the hill areas of North East India prone the existenes of some olds branch of the Kirata population in the prehistoric time. We have some recorded evidence of these Caves existing in the Khasi-jaintia hill, the Garo hills, the north Cachar hills and the Naga hills of Manipur (P.173 Kiratas in Ancint India).** উত্তর পূর্বাঞ্চলের সেই বর্বরকৃত কিরাত গোষ্ঠীরা রামায়ন এবং মহাভারতের মত মহাকাব্য গ্রন্থের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সৈন্য বাহিনী হিসাবে ভূমিকা পরিলক্ষিত হত। যদিও তারা বর্বর ছিল

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম এবং সাহসে প্রভু ভক্তে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল বলে যানা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই তারা অনার্য জাতি বলে আর্য জাতির প্রতিপক্ষে সদা বিরোধীর ভূমিকা নিত, তাই প্রাককালে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে প্রায়শই দ্বন্দ সংঘটিত হত। এখানে মহাভারতের কথা প্রানিধান যোগ্য : According to all available evidences it can be proved the Bhagudatta the mloecha king of Pragyutisa (later Kamorupa) accompanied by the unacsailable troops consisting mostly of the Kiratas and cinas soldiers endowed with golden complexion and many other drawn from the sea shore took part in this war going the side of the karavas. One oksauhini of soldiers led by Bhagudatta mostly included the Kiratas of North-East India. The Kiratas and Cinas were all looking like figures of gold and assuming a beauty like that of a forest of Karnikara trees. They fought or behalf of Durgodhana against the Pandava, after having been defeated by Pandava heroes. They fought along with other non-Aryan and Aryan races against Arjuna. It appears from the details of events that they played very effective role in this war. Here it can be reasserted that when Arjuna launched hes expedition against the rulers of north-eastern region in connection with the establishment of an empire of Yudhisthira the Kiratas along with others fought against him under the inspiring leadership of their ruler Bhagudatta continiously for eight days, but ultimately accepted the defeat and acknowledged the supremace of Yudhira. The Kiratas along with others were difeated by Arjuna (page no 417 Kiratas in Ancient India).

এই ভাবে ধীরে ধীরে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে কিরাত বা ছিনা জাতির উপর আর্যরা প্রভাব বিস্তার সুরু হয় এবং তাদের প্রচারিত ধ্যান ধারনা, ধর্ম ও আচার আচরনই ছিল সেই যুগের শ্রেষ্ঠ। (কিরাতদের উপাস্য দেবদেবীকে নিম্ন পর্যায়ে ফেলে দিয়ে উপ দেবদেবী বলেও আর্যরা ঘোষনা করেন এবং কিরাতদের দেবদেবী হচ্ছে মৃত্যুর পর নির্গত বিভ্রান্ত আত্মা বলেও কিরাতদের উক্ত দেবদেবীকে হেয় করত)। আর্যরা প্রথমতঃ আঞ্চলিক রাজড়াজরার উপর নিজেদের ধর্মতে প্রভাবিত করে দিয়ে তারপর রাজার দ্বারা ধীরে ধীরে প্রজাসাধারনের উপর প্রভাব বিস্তার করত। তাই প্রাচ্য দেশের কিরাত বা ছিনারা তাদের বর্বরতা পরিহার করে আর্য ধর্মকে বরন করে নিলেও তারা উপযুক্ত ব্রাহ্মনদের দ্বারা পরিচালিত নন বলে স্লেচ্চ বা শূদ্র বলে নিম্নবর্নের হিন্দু রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। কারন গোটা প্রাচ্য দেশের কিরাত বা ছিনারা হিন্দু ধর্মের সার্থক নিয়ম কানুন অনুযায়ী কার্যতঃ ব্রাহ্মনদের নির্দেশক্রমে পরিচালিত ছিল না, তাই পূজা-পার্বন আচার-আচরন সঠিক ভাবে পালন না করাতে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্নের লোক শূদ্র বা স্লেচ্চ বলে আক্ষায়িত হত। এই সব স্লেচ্চ জাতিরা আঞ্চলিক রাজাকে খুবই অনুসরন করে চলত এবং রাজাকে ভূস্বামী "ফা" বা "রাই" বলে ডাকত। আর্যদের নুতন চাঁপিয়ে দেওয়া ধর্ম এবং তাদের আচার

আচরণকে প্রাককালে যে জাতি প্রবল বিদ্বেষী ভাব পোষণ করত তাদের দাস, দস্যু, রাক্ষস বলে রাজ্যের বাইরে বনে বিতাড়িত করে দিতেন। তাই 'ছিনা' গোষ্ঠীর অধিবাসীরা প্রাককালে পার্ব্বত্য বনে বনে যাযাবর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। বনে বনে বসবাস করতে করতে কোন আঞ্চলিক বা রাজার অনুগত প্রজা হয়ে রাজড়াজারা কিরাত বা ছিনা নামের পরিবর্তে আধুনিক গোষ্ঠী উপাধি পাওয়া হতে বঞ্চিত ছিল। তাই উক্ত গোষ্ঠীরা পূর্বের সেই ছিনা গোষ্ঠীর নামেই রয়ে যায়। এই গোষ্ঠীদের অর্বাচিন যুগ পর্যন্ত ছিনা গোষ্ঠীর এক শাখা বলেই গোটা পূর্বখন্ডের সমতলীয় বাসীর কাছে পরিচিত ছিল কিন্তু পরে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর অধিবাসী, পার্বত্য বন ভূমিতে বসবাস করাতে প্রাককাল হতে যাযাবর ছিনা গোষ্ঠীদের আলাদা করে চিহ্নিত করার অসুবিধে হয়ে যায়। খুব সম্ভবত সেই ছিনা শব্দই উত্তরোত্তর বিকৃত শব্দান্তর হয়ে প্রাক আধুনিক যুগ পর্যন্ত "ছিকাম" বলে গোটা পার্বত্যবাসীদের কাছে পরিচিত ছিল। এই ছিকামরাই প্রাককালে সমতলীয় আর্য জাতির উপর উৎপীড়ন করেই ক্ষান্ত হননি, তারা আর্যদের অনুসরনকারী অর্থাৎ রাজাদের অনুগত প্রজা এবং হিন্দুদের উপরও কতবার উৎপীড়ন চালিয়ে ছিল তার কোন ইয়ত্তা নেই।

পরবর্ত্তীকালে ছিনা বা কিরাত গোষ্ঠীদের একটি শাখা ধারা পূর্বখন্ডের বিভিন্ন পার্বত্য ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছিল। তার মধ্যে বরবক্রের দক্ষিন-পশ্চিম পার্বত্য ভূমিতে প্রাককালে যারা প্রবেশ করেছিল সমতলবাসীদের কাছে তারা সাধারনত 'কুকি' বলে পরিচিত হয়েছিল। সামগ্রিক ভাবে তারা তিব্বতু ভাষা ভাষী জনগোষ্ঠী ছিল বলে পরস্পরের মধ্যে কিছুটা ভাষার মিল দেখা যায়। যাযাবর ছিকাম গোষ্ঠীরা ও সাইন্যু তিব্বতু বা তিব্বতু বর্মন ভাষা ভাষী ছিল তাই প্রকৃত কুকির ভাষা সাথে তাদের ভাষার সচরাচর মিল পরিলক্ষিত হয়। খুব সম্ভবত এই কুকিরা এক কালে লোহিত বা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার পার্শ্ববর্তী সমতলীয় অঞ্চলের অধিবাসী এবং কোন রাজার অনুসরনকারী প্রজা ছিল। তাই তাদের আচার আচরনে এবং ভাষায় আর্য প্রভাব লক্ষগোচর হয়। জে.পি.সিংহ যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে : "The Kiretas tribes placed under Tibeto-Burman groups including the Bodo and Naga groups as a result of their contacts with the Aryan population right from the epic age absorbed various Aryanised and Semi-Aryanised words into their own dealects. (p.p.No. 313 chapters 3 Kirates in Ancient India). এই সমতলীয় অধিবাসীরা উক্ত জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে প্রাককালে অনেকদিন যাবৎ বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিল বলে এবং তাদের বর্বর পোষাক পরিহার করে নারীরা নিম্নাঙ্গে এবং বুকে স্বল্প বস্ত্রতে আবৃত ছিল। পুরুষদের বেলায় শুধু নিম্নাঙ্গ আবৃত রেখে উর্দ্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত রাখত। কিন্তু ছিকামদের নারী পুরুষ আবরনে সমতলীয় কুকিদের আবরন কিছুটা বিসাদৃশ্য ছিল। এই ছিকাম বা ছিনারা আর্যদের প্রতিপক্ষ বলে তাদের আবরনে কিছুটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত ছিল। তাদের আবরন বা পোষাক কোন তুলার বস্ত্র নয়, বন্য জন্তর চর্ম না হয় গাছের পাতলা ছাল বা পাতা দিয়ে তৈরী এবং মেয়ে পুরুষ

নিম্নাঙ্গই শুধু আবৃত বাকি অর্ধাঙ্গ অনাবৃত ছিল । তাই ছিকাম নারীদের বুকের আবরন ছিলনা বলেই তিব্বতু বর্মন বা বুড়ু জাতিরা 'রিসা' নামে (এক জাতীয় উপজাতিদের শুধু নারীরাই বুক ঢাকার জন্য লম্বা জাতীয় খেস বস্ত্র) অন্যান্য কুকিরা তা ব্যাবহার করত না , কিন্তু প্রাককালে যারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতল ভূমি এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী পার্বত্য ক্ষেত্রে বসবাস করছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই উক্ত রিসা দিয়ে নারীরা মধ্যাঙ্গে বেধে বুক ঢেকে রাখার প্রথা ছিল । (তাদের মধ্যে অধিকাংশ বৃহৎ 'তিপরা' রাজ্যের অধিবাসী বলে, উত্তর কালে ত্রিপুরার মহারাজারা এই গোষ্ঠীদের "হালাম" নিজ অনুসরণকারী জনগোষ্ঠী আক্ষায়িত করেন ।) । খুব সম্ভবত: সভ্য জনজাতি অথবা আর্যদের পারিপার্শ্বিকতায় বসবাস করতে হয়েছিল বলে সঙ্কোচে এই বুকের আবরনটি ব্যবহারের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল বলে একান্ত ধারনা, তাই এই বস্ত্রের নাম "রিসা" অর্থাৎ স্বল্প পরিসরের বস্ত্র । পরে সেই সমতলীয় কুকিরা ভিন্ন ভিন্ন উনগোষ্ঠীতে বিভাজন হয়ে যায় । যদিও তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেলেও কিন্তু তাদের আচার আচরন ধর্ম বিশ্বাস বেশভূষা হতে সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে যে তারা একই গোত্রের স্বজাত গোষ্ঠী বলে । তাই আধুনিক কালের গবেষকরা ঐ কিরাত গোষ্ঠীর শাখাদের যথার্থই নাম প্রদান করেছেন "পুরান কুকি বলে"। এই গোষ্ঠীরা পার্বত্য ক্ষেত্রে নুতন উপনিবেশ স্থাপন করলেও প্রাচীনকালে তারা সমতলীয় অধিবাসী ছিল, তাই পুরান কুকিরা দেখতে অনেকটা কালচে পীত বর্ন এবং দেহ কাঠামো দৃঢ় পেশীবহুল, উচ্চতায় মাঝারি খাটো, চুল শক্ত এবং কুকড়ানো বলে জানা যায় ।

কিরাতদের একটি শাখা যাকে অপভ্রংশ সমতলীয় গোষ্ঠীরা বাহ্যিক নামাকরণ কুকি বলে অভিহিত করেছিল এই নামটির বর্তমানেও অস্তিত্ব রয়ে যায় । অর্বাচীন কালে এই গোষ্ঠীর একটি ধারা লোহিত বা ব্রহ্মপুত্রের এবং তার পার্শ্ববতী সমতল ক্ষেত্র হতে ধীরে ধীরে পূর্বাঞ্চলের দক্ষিন পূর্ব প্রান্তে ধাবন করেছিল । তারা সুরমা বা খুলুংমা (সুরমা হালুং) উপত্যকার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য ভূমিতে প্রাককালে নুতন উপনিবেশ স্থাপন করে নেয় বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য হতে জানা যায় । খুব সম্ভবত রাজা মহারাজার নির্দেশ ক্রমেই তারা আঞ্চলিক রাজার পার্শ্ববর্তী অরন্য ভূমিকে চাষ করে সেই সব ক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করে নেয় এবং পরে তারা সেই সব ভূমিতেই জুম কৃষির চর্চা সুরু করে ছিল । সমতলীয় আর্যদের অনুসরণে কৃষি কার্যে অনুপ্রানিত হয়ে তারা প্রথম কৃষি কার্যের উদ্যোগ নেয় বলে ঐকান্তিক ধারনা । রাজার অনুমোদন ক্রমেই উক্ত কুকিদের ভিন্ন ভিন্ন কুটুম ভিত্তিক (অর্থাৎ উপগোষ্ঠীদের সুস্থ পরিচালনার্থে) সর্দ্দার বা মোড়ল নিজেদের মধ্যে নির্বাচন করে নিত । কোন আঞ্চলিক রাজার নির্ধারিত আদেশ ক্রমে একশত ছাব্বিশ পরিবারের মধ্যে সীমিত রেখেই ঐ কুকিদের সর্দার বা মোড়লের অধীনস্থ থাকতে হত । এই সর্দারকে কুকিদের ভাষায় কামসিকাউ বলে থাকে । জন প্রবাদেই শুনা যায় " কামসিকাউ রাজানি বরক নক-কুড়িদক নকদক " । এতে প্রমান হয় যে পার্বত্য পল্লীর জুম চাষী কুকিরা কামসিকাউকে

রাজার প্রতিনিধি বলে গোষ্ঠীর রাজা অভিহিত করে থাকেন, তাই রাজ্যের মহারাজাকে উক্ত গোষ্ঠীরা দেবতুল্য বলে প্রভূ বা " ফা " বলে ডাকে। ভিন্ন ভিন্ন কুটুম্ব সমেত ছোট ছোট উপগোষ্ঠী ক্রমে গঠিত প্রতিটি গোষ্ঠীর নাম হচ্ছে যেমন ঃ রাঙ্খল, বেটু, হালাম, খালমা, থাঙচেব এবং সাখচেব, ছাইমাল, চরুই, কলরেং এবং কোলরেন, কুম, মাড়, চুতি, মুনটক, করুম, পুরন, আনল, হিরইলাংগঙ, বাইফেই, মলসম, কাইলেং, বংচের, কর্বং, লালরং ইত্যাদি। তাদের পরস্পরের ভাষা, আচার আচরন এবং সামাজিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য লক্ষগোচর হয়, তাই আধুনিক গবেষকরা সামগ্রিক ভাবে পুরান কুকি বলে অভিহিত করেন। এই সব গোত্রের মধ্যে কিছু সংখ্যক গোষ্ঠী পরস্পরের মধ্যে একত্র হয়ে বিশাল গোষ্ঠী গঠন করে নেয় এবং কামসিকাউ বলে ছোট ছোট গোষ্ঠীর সর্দার এর অস্তিত্বকে পরিত্যাগ করে কয়েকটি গোষ্ঠীর রাজা অর্থাৎ (লাল, পুই, থাঙ) নামে নিজেদের নির্বাচন করে নেয়। প্রাককালে অরন্যে বিতাড়িত জনগোষ্ঠী ছিকামদের অনুসরনেই নব গঠিত উক্ত গোষ্ঠীরাও কোন আঞ্চলিক রাজার অধীনতাকে অস্বীকার করে। কামসিকাউ এর অধীনস্থ পার্বত্য ভূমির ছোট ছোট উপগোষ্ঠীরা উত্তরকালে ঐ নবগঠিত কুকির গোষ্ঠীকেও ছিকাম বলে আখ্যা দিয়েছিল। তারা হচ্ছে যেমন ঃ বেটু, কুম মাড় আরো অনেক গোষ্ঠী অর্থের অনুপ্রানিত আচার আচরনকে ছুড়ে ফেলে দেয়, এবং প্রাচীনতম আচার ছিকাম আচার আচরনে প্রভাবিত হয়েছিল ।বলা বাহুল্য উক্ত নবগঠিত ছিকামরাও মৃত্যুর পর মৃতদেহকে আগুনে দাহ প্রথাটি পরিহার করে কবর দেওয়ার প্রথাকে গ্রহন করে নিয়েছিল।

পরে কিরাত জাতির একটি শাখার যারা অরন্য ভূমিতে পদধাবন করেছিল বলে জানা যায়। তারা বরবক্রের পার্শ্ববর্তী সমতল ক্ষেত্র হতে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিনের পার্বত্য অঞ্চলে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, এবং নিজেদের বর বলে পরিচয় দেওয়ার প্রবনতা ছিল। খুব সম্ভবত অর্বাচীন কালে গোটা বরবক্রের সমতলীয় অঞ্চল জুড়ে ব্যপক ভাবে আর্য এবং অনার্যের অনুপ্রাণিত গোষ্ঠীদের প্রতিপত্তি হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের দখলের সকল ভূমি বহিরাগতদের কাছে হস্তগত হয়ে কৃষি আবাদ ভূমিতে পরিনত হয়েছিল। ফলে সেই সব স্থানের আদিবাসী যারা আঞ্চলিক রাজার বিশিষ্ঠ প্রজা বরবসা বা বরক গোষ্ঠীর একটি শাখা বিব্রত হয়ে পাশ্ববর্তী পর্বতমালার বনাঞ্চলে আরোহন করে এবং নিজেদের মধ্যে নুতন উপনিবেশ স্থাপন করে নেয়। সমতলবাসী আর্যদের অনুসরন করে তারা পার্বত্য ক্ষেত্রে গিয়ে বিকল্প কৃষি পদ্ধতি জুম চাষের চর্চা সুরু করেছিল বলে বিশেষ তথ্য হতে জানা যায়। স্থানান্তর জুম কৃষির জন্য উত্তরোত্তর খন্ড খন্ড হয়ে তারা বিভিন্ন পর্বত মালার বনাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কয়েকটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে পৌছে ছিল এবং স্থান বিশেষে একই গোত্রের নাম বিভিন্ন নামে উপাধী লাভ করে।এই সমগ্র গোত্রই আর্যের আচার আচরনের দ্বারা প্রভাবিত পৌরাণিক হিন্দুর অঙ্গ শৈব ধর্মের ভাবাদর্শে বরবসা গোষ্ঠীরা অনুপ্রানিত হয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য হতে জানা যায়।

(উত্তর কালে উক্ত ধর্মই শাক্ত ধর্ম বলে বিবেচনা করা হয়েছিল)।

একটি গ্রন্থের শীর্ষক জি. পি. সিংহের বইয়ে উল্লেখিত হতে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাককালে এই শাক্ত বা শক্তি ধর্ম প্রবল প্রভাবিত ছিল তা এখানে প্রানিধান যোগ্য : The temples dedicated to Sakti some other temple of Siva were also in existence in the N. E. region where animal sacrfice were performed according to the tribal costoms. The worship of Tamresvari of the Chatigas, Jaintesvari of the Jaintias, the Rana Chandi and Mahamaga of the Kacharis and that of the fourteen Devatas of the Tippahs was associated with human sacrifice in early Medieval time 284 (Pp. 259 Kiratas Ancient India). মধ্যকালে এসে আদিবাসীদের মধ্যে উত্তরোত্তর আর্যানুভাব উদ্ভব হলে প্রাচীনতম শাক্ত বা শক্তি ধর্মের অন্তর্গত প্রথা গুলিকে অচিরেই অবৈধ বলে ঘোষনা হয়েছিল। গোটা আদিবাসীদের মনের এই আবর্তনই উত্তর কালে হিন্দু ধর্মকে সহসা আপন করে নিতে পেরে ছিল, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই হিন্দুর ভাবাদর্শ বিশেষ করে বরবক্রের উপত্যকার সমতল তটভূমিতে উপনিবেশিক অধিবাসীদের মধ্যে উক্ত ধর্মের প্রভাবের ছায়া বেশী প্রতিফলিত হয়েছিল বলে জানা যায়।ফলে উক্ত অঞ্চলের আদিবাসী এবং কিরাত জাতির প্রাচীনতম ও উল্লেখযোগ্য শাঁখা গোষ্ঠী বর্বরাস বা বর্বসাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের রীতি নীতি আচার আচরনে চলার প্রবৃত্তি হয়েছিল এবং তা প্রাককাল হতে চলে এসে আজকালও প্রবাহমান। তাদের এই শাঁখার কয়েকটি গোত্র এবং যারা বিক্ষিপ্ত ভাবে দূর দূরান্তে জুমচাষী কুকিদের সংলগ্নে পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল উত্তর কালে তাদেরও কুকি বলে আখ্যায়িত করেছিল। বস্তুত তারা কুকি নয়। অনেকদিন যাবৎ কুকিদের পারিপার্শ্বিকতায় বস-বাসে করাতে তাদের সামাজিক পরিচালনা এবং শাসন ব্যবস্থায় কিছুটা লেনদেন হয়েছিল। উক্ত বর্বরসা এবং কুকিদের দিন দিন আদান প্রদানে কুকিদের ভাষা ব্যবসা বা বরক গোষ্ঠীর ভাষায় সন্নিবিস্ট হতে দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রকৃত কুকির কয়েকটি গোষ্ঠী সমেত এবং "বর্বসা" বা "বরক" গোষ্ঠীর কয়েকটি গোত্র যারা উর্বর জুম অন্বেষনে উত্তরোত্তর দক্ষিন পূর্ব প্রান্তে ধাবন করেছিল ; এবং সেই সব পার্বত্য ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল উপনিবেশ স্থাপন করে নেয়। (এই সব অঞ্চল পূর্বউপকূল, এবং প্রাককালে বৃহৎ " ত্রিপুরার" ভূখন্ড অংশ ছিল তাই "কৃষ্ণমালাতে"ও"ত্রিপুর - দেশের-কথা" পুরাণ পুথীঁতে এইসব অঞ্চল, কুকিদের অধ্যুষিত অঞ্চল বলে উদ্ধৃত আছে) এককালে বরবক্রের দক্ষিন তীরবর্তী সমগ্র ভূভাগ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তৎকালে আধুনিক করিমগঞ্জ সাব-ডিভিসনের অধিকাংশ স্থান ত্রিপুরার কুক্ষিগত থাকার কথা নিম্নে প্রমান দ্বারা জানা যায় : "A thousand years ago the Karimganj Sub-Division seen to have been included in the Trippera Kingdom" (Allens Assam

Districts chapp II p.22). এই সব স্থানের সমস্ত কুকি জাতি তাদের ও তাদের স্ব স্ব উপগোষ্ঠীর সর্দার বা কামসিকাউরা ত্রিপুরার রাজার অধিনস্থ প্রজা ছিল এবং রায় রাজার অনুমোদিত একটি উপগোষ্ঠীর প্রতিনিধি রূপে প্রাককাল হতে চলে এসেছিল। এই সব রাজা মহারাজার এককেন্দ্রিক শাসনে উক্ত কুকিরা সম্মিলিত ভাবে কুকি, বরক, থাদো (ভাষা ভিত্তিক বৈষম্য) নির্বিশেষে তিপরা রাজার ভূঅংশে বসবাসকারী ছিল। তাদের ভূ-স্বামী ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে সদা মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলার প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু কোন সময়ই "ছিকাম কুকিরা" রাজার অধীনে থাকতে স্বীকার করেনি এবং এই সব রাজার অনুগতদের সঙ্গে সদা বিরূপ ছিল। ফলে গোষ্ঠীর রাজা দ্বারা পরিচালিত ছিকাম বা রাজ অনুসরনকারীদের সহজাত্য গোষ্ঠীর দ্বারা বার বার নিপীড়িত এবং বিতাড়িত হয়েছিল বলে জানা যায়। খুব সম্ভবত ডাঙ্গরফার মৃত্যর পর হতেই ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে গোটা ছিকাম কুকিরা মস্তক উত্তোলন করেছিল এবং তা ৩২ তম ত্রিপুরার রাজার আমল পেরিয়ে সপ্তদশ শতকের অর্ধভাগে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের আমল পর্যন্ত ছিকাম কুকিদের বিদ্রোহ দমনের অভিযান করতে হয়েছিলেন এবং এই অভিযান অনেকাংশে ফলপ্রসু হন।

ফলে এই সব বিদ্রোহীরা বশ্যতা স্বীকার করে তাদের কুক্ষিগত ভূমি প্রাককালে যে অংশ ত্রিপুরার ভূ-অংশ ছিল তাও ত্রিপুরেশ্বরের পুনঃ হস্তগত করা হয় এইসব ঘটনায় আগে পুরাতন কুকিদের একটি শাঁখা উত্তরোত্তর পূর্ব দক্ষিণে ধাবন করে এবং শেষে জুম চাষের উর্ব্বর অঞ্চল থানাংচিতে গিয়ে নুতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে উক্ত গোষ্ঠীরা ছিকাম কুকিদের নিরন্তন অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরে তদানীন্তন ত্রিপুরার সীমানার পাশ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চল হাইচেক এবং মায়ানী হারুং নামক স্থানে এসে নুতন ভাবে বসবাস করতে সুরু করে। তদবধি রূপিনী দফারা পুরাতন কুকিদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে পাশাপাশি বসবাস করতে শুরু করে। তথাকথিত "পুরান কুকিরা" যেমন ঃ লঙ্গাই, সাখচেব-থাঙচেব, রাঙ্খল, কর্বঙ ইত্যাদি। হাইচেক নামক স্থানে রূপিনীরা পূর্বেই এসেছিল এবং উক্ত হাইচেক নামটি রূপিনীরাই প্রদান করেছিল বলে বিশেষ সূত্র হতে জানা যায়। তার আগে রূপিনী দফারা বরবক্রের উপত্যকা হতে উত্তরোত্তর সোজা দক্ষিনে ধাবন করে 'রূফলী' নদীর নিকটবর্তী "কাঙলাই" পর্বতে উপনিবেশ ছিল, বলা বাহুল্য উক্ত গোষ্ঠীর নাম রূপিনী নামে চিহ্নিত হত না। তখন সীমিত জনসংখ্যা বিশিষ্ঠ একটি গোষ্ঠীর গোত্রের নাম ছিল বলে জানা যায় তাহা হল "পায়াংপাঞ্চি"। "পায়াং" হচ্ছে পুরাণীক মূল জাতির নাম আর "পাঞ্চি" অর্থাৎ গোষ্ঠী বা গোত্র। এই সব শব্দটি হালাম, কুকি, বরক ভাষার শব্দ ভান্ডারে পায়াং বা পাঞ্চি শব্দটি লক্ষগোচর হয় না শুধু রিয়াংদের ভাষায় " পাঞ্চি " অর্থাৎ গোষ্ঠী শব্দটি ব্যবহৃত পরিলক্ষিত হয়। তাই পায়াং বা পাইলাং শব্দটি অষ্ট্রীক ভাষা থেকে রপ্ত করা হয় বলে আমার একান্ত ধারনা। সাধারন ভাবে প্রাক আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই পারাং পাঞ্চি বংশ সূত্রের উপর ভিত্তি করেই একটি

কুটুমের উত্তর পুরুষের রক্তধারার সম্পর্কে সম্পত্তির অধিকার নিরুপন করা হয়। বর্তমানেও তাহা একেবারেও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, প্রত্যন্ত অঞ্চালের রূপিনীরা এই সূত্রে সম্পত্তি বন্টনের পদ্ধতি সূত্র হিসাবে সযত্নে সংরক্ষন করে রেখেছে তাহা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

শুধু সম্পত্তির অধিকারের বেলায় পায়াংপাঞ্চি শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাহা আমি পক্ষপাতি নয়, কারন সম্পত্তির অধিকার দাবীদার শুধু পায়াংপাঞ্চির মধ্যে সীমিত কেন? নিশ্চই এই শব্দের মধ্যে অর্ন্তর্নিহিত যথাযথ একটি রক্তের ধারা অর্থাৎ একটি গোষ্ঠীর নাম ইঙ্গিত আছে। তবে কি সেই ' পাইলাং ' - অষ্ট্রীক জাতির ক্ষুদ্র একটি উপগোষ্ঠী যারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই ভারত তথা পূর্ব এশিয়াতে বিক্ষিপ্তভাবে। বসবাস এর অস্তিত্ব ছিলেন, কিন্তু উত্তর কালে তারা বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নামান্তর হন। জে. পি. সিংহের মূল্যবান পুঁথীতে পাইলাংদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন তাহা অনস্বিকার্য যেমন : **Mr. Schmidt in his dio Mon-khmes volker has established an intimate relationship between the Mon-khmes grope of language and various others speeches of Indo-China, South-East Asia Pacific Ocen as far as Eastern Island of the cost of South America and other places. This group of language accordoing to him embrace Mon-khmes ("Palaung" and as of Burma, Riang salveen basin, cham of Cochin China, Munda and Khasi language of India and various others minor forms of speech and aboriginal dilects of Combodia, Annam, Malag-Peninsula, Assam Upper Burma, Nicobar Island, Salween and Mekong etc. 292.** খুব সম্ভবত ঐ পালাং শব্দই উত্তরোত্তর বিকৃত হয়ে পায়াং শব্দের রূপ লাভ করে বলে আমার একান্ত ধারনা। এই আপার আসাম অর্থাৎ বর্তমান কাছার জেলার কথাই **Mr. Schmidt** তার গ্রন্থতে উল্লেখ করেছেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস। প্রাক আর্য যুগ হতে বড়ু এবং কুকিদের সঙ্গে থাকার পর উক্ত পালাং জাতি নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, আচার আচরনের পরিবর্তন ঘটে। ফলে উত্তরোত্তর " বরক " বলে নিজেদের পরিচয় দিতে সুরু করেন। বরক দফার সঙ্গে রূপিনী অর্থাৎ পায়াংরা নিজেদের সঁপে দেওয়ার পর দেখিলেন যে বরক সম্প্রদায়ের আচার আচরন রীতি নীতিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কথা খুবই সীমিত এবং অস্পষ্ট। তাই রূপিনীরা প্রাককালের সেই পায়াংপাঞ্চির উত্তর পুরুষের রক্ত ধারার সূত্রে ভিত্তি করেই সম্পত্তির অধিকার নিরুপন করার পদ্ধতীকে সংরক্ষিত করে রাখেন। তবে সব সময় এই শব্দটি ব্যবহার করতে প্রয়োজন হয় না, এবং যখন কোন প্রয়াত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের প্রশ্ন উত্থাপন হলে, তখনেই পায়াংপাঞ্চির বংশ সূত্রের ভিত্তিতে সম্পত্তির অধিকারী নিরুপন করা হত। যখন কোন প্রয়াত ব্যক্তির ঘরে সম্পত্তির উত্তরাধীকার পুত্র সন্তান যদি না থাকে এবং মেয়ে সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারে না, তখন নিকটস্থ রক্ত সম্পর্ক ভাইপো ঐ সম্পত্তির দাবীদার হয়। যখন এই ভাইপোও যদি না থাকে তখনই প্রয়োজন হয় পারাংপাঞ্চির ভিত্তিতে পুরুষের বংশসূত্র ধরে প্রয়াত ব্যক্তির সম্পত্তির এবং

তার পরিবারকে ভরনপোষনের ভার ধার্য করা। যথাযথ পায়াংপাঞ্চি সগোত্রের ব্যক্তিবর্গের হাতেই অন্যান্য গ্রামবাসীরা উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি এবং পরিবারের দায়িত্ব সঁপিয়ে দিত তার মধ্যে দ্বিমত, বিতর্কের কোন প্রশ্নই উত্থাপন হতে পারে না। কিন্তু নারীর গোষ্ঠী বা কুটুমদের মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারের দাবীদার হতে পারে না। নারীর সম্পর্ককে রূপিনীরা " সন্ধাই " বলে থাকে এই বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আজকাল নারী পুরুষদের সমান অধিকার হওয়াই ঐ পায়াংপাঞ্চি পদ্ধতিতে উত্তরোত্তর দূরিভূত হতে যাচ্ছে। নব্য রূপিনীদের কাছে এই আদিম প্রণালিতে বন্টন প্রক্রিয়া একে বারে নেই বললেই চলে, শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চলে এইসব প্রনালী এখনো পরিহার করে নি।

যুগ সন্ধিতে এইসব উক্ত আদিম প্রনালী বৈধ হয়ে যায়, কত আদি যুগের ভাষা সংস্কৃতি কালের গর্ভে তলিয়ে গেছে তার কোন ইয়াত্যা নেই। যাহা কিছু এখনো বেচে রয়েছে তাহাই গবেষকের নিকট অমূল্য উপাদান। তাই যদিও পায়াংপাঞ্চি উৎঘাটনের প্রনালীতে সম্পত্তির অধিকার নির্ধারিত করা আজকাল অসঙ্গত বলে বিবেচিত হলেও শাখা প্রশাখা পুরুষ রক্তধারা বাহ্যিকতায় সম্পত্তির অধিকার দাবীর অধিকার তাগিদে "পায়াং" শব্দটি সযত্নে রূপিনী গোষ্ঠীর মাঝে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই শব্দটিই আমাদের কাছে প্রাককালের গোষ্ঠী সম্পর্কে উৎঘাটনের এক অন্যতম উপাদান লাভ হয়। এই সব পৌরাণীক শব্দ আদিম প্রনালীর নাম ইত্যাদির সূত্র ধরেই তাদের প্রাককালের কথা অনুধাবন করতে হবে অন্যথায় তা সম্ভব নয়। জনৈক ঐতিহাসিক যথাযথই বলেছেন যে ঃ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বিশেষ স্মরণীয় কাল, ব্যাক্তিত্ব, বীরত্ব, সংখ্যায় গরিষ্ঠ জাতিদের ইতিহাসের পাতায় প্রাধান্য লাভ করে থাকেন। কিন্তু রূপিনীদের আদিম পুরুষ "পায়াং" রা প্রাককালে উপরিউক্ত সর্তের মধ্যে কোনটায় দখল নেয়। ফলে ঐ গোষ্ঠী অর্থাৎ "পায়াং" গোষ্ঠীর নাম উত্তরোত্তর কারণে কারণে বিলুপ্ত হয়ে স্থানের নাম জোড়েই গোষ্ঠীর নাম চিহ্নিত করন হয়ে থাকে; কেননা সেকালে গোষ্ঠী নামের চেয়ে স্থানের নামের গুরুত্ব অধিক ছিল। যেমন স্থানের নাম জোড়েই পায়াং থেকে রূপিনী নামে অভিহিত হয়েছিল তেমনি পাইলাং, উা শেষে জাতিরা স্থানের নাম বিশেষে "নিকবরিস" বলে পরিচয় লাভ করে। এইভাবে প্রত্নতাত্বিক ইতিহাসে তাহা অহরহ দেখা যায়। চাম, পাইলাং, ডা সম্পর্কে মি: স্মীথ আলাদা ভাবে তথ্য সরবরাহ করেছেন যে ঃ **Combodians the chams, and the lesses tribes like the paloungs the was and other. One group of them suiled in to theNicobar Islands and become the Nicobares. Other group i.e. the Ancestors of the Khasis and others penetrated in to erstwhile Assam 293.** এই নির্ষাংশ হতে অতিশয় অনুধাবন করা যেতে পারে যে খাসী ব্যতীত আরো অন্যান্য নিষাদ বা অস্ট্রীক জাতিভূক্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই আসামে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তারা সেখানে স্থায়ী ভাবে উপনিবেশ করে নেয়। খুব সম্ভবত আল্পাইন পাইলাং বা পায়াং গোষ্ঠীরাও অন্যান্ন কিরাতদের সঙ্গে বহুদিন ধরে সম্মিলিত ভাবে লোহিত বা ব্রহ্মপূত্রের

উপত্যকাতে বা তার পার্শ্ববর্তী তটভূমিতে উপনিবিষ্ট হয় । ফলে সংখ্যা লঘু পাইলাং উপগোষ্ঠীরা উত্তরোত্তর তাদের ভাষা সংস্কৃতি আঁচার আচরন সংখ্যায় গরিষ্ঠ বরবসা অর্থাৎ বর্বরসা, ছিনা জাতির ভাষা সংস্কৃতি আঁচার আচরনের সংমিশ্রন ঘটে । ফলত নিজস্ব আদি ভাষা সংস্কৃতি আঁচার আচরন উপাস্য দেব দেবী সম্পুর্ন রূপে দূরীভূত হয়ে ক্রমে বরবসা সংস্কৃতিকে নিজস্ব করে নেয় । বলা বাহুল্য ছিনা বা কুকিদের ভাষা ও উক্ত পাইলাং উপগোষ্ঠীর ভাষায় প্রভাবিত হয় । কারনে কারনে ঐ আষ্ট্রাইন উপগোষ্ঠী পাইলাংরা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ক্ষেত্র হতে উৎখাত হয়ে সুরমা উপত্যকা বা তার পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিতে এসে উপনিবেশ গড়ে তুলে । আবার প্রাককালে সেখান থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিন দিকে ধাবিত হয়ে নির্জন পার্বত্য ক্ষেত্র রূপা নামক স্থানে নুতন ভাবে বসবাস সুরু করেছিল এবং সেখানেই তাদের উপনিবেশ দীর্ঘস্থায়ী লাভ করেছিল ।

উক্ত রূপা নামক স্থানটি একটি খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর অববাহিকা । সেই নদীর নামও ঐ অঞ্চলের নামানুসারে তৌয় রূপিনী নামে সকলের কাছে পরিচিত । কৃষ্ণমালাতেও তৌয় রূপিনীর নাম রূফলী নদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

"হিড়িম্ব দেশের দক্ষিণেতে এক নদী ।
বরবক্র নাম তার ঘোষে অদ্যাবধি ॥
খলংমা বলয়ে ত্রিপুর সকলে ।
কুকি সবে বসতি করয়ে তার কূলে ॥
রূফলি নামেতে নদী তার দক্ষিণ ।
তথাতেই বসতি করয়ে কুকি গণে ॥" (কৃষ্ণমালা)

সম্মিলিত পার্ব্বত্যবাসী কিরাতদের সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থে "কুকি" বলে আখ্যায়িত করেছেন । কিন্তু বাহ্যিক প্রচলিত কুকি নামটি ছাড়াও তাদের আভ্যন্তরীন ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপগোষ্ঠীর নাম প্রচলিত ছিল । এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে তাই পুনরাবৃত্তির নিষ্প্রয়োজন মনে করি । যাইহোক সেই প্রাকৃতিক মনোরম বেষ্টিত অঞ্চলের বসবাসকারীদের লেখক এখানে জন প্রচলিত নাম হিসাবে কুকি বসতি বলে অভিহিত করলেও বস্তুতঃ তারা পুরাণ কুকি । তারা হচ্ছে সেই পাইলাং বা পায়াং উপগোষ্ঠী এবং কিরাত জাতির একটি উপশাখা । তথাকথিত ঐ রূফলী নদী বা রূপিনী নদীটি অন্যান্য নদীর চেয়ে খুব প্রভাবিত নদী ছিল এবং ঐ পাইলাং বা পায়াং; অষ্ট্রীক গোত্রীয় উপগোষ্ঠীভুক্তরা অন্যান্য কুকিরা সেখানে বসবাসের অনেক আগেই এই স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল । সেই রূফলী নদী সেকালে খুব সুখ্যাত ছিল । 'কৃষ্ণমালার' কয়েকটি পংক্তি হতে তা অনুধাবন করা যায়, যেমন ঃ-

সেই নদীর প্রভাব আছয়ে অতিশয় ।
তথা বহু লোকে পূজা তাহান করয় ॥
মনোগত কার্য্যসিদ্ধি সে নদী করয় ।

এই নদীকে কেন্দ্র করে রূপিনীদের মধ্যে নানা রূপকথা, উপকথা প্রচলিত আছে এবং সেই রূফলি নদীকে রূপিনীদের জীবনের ত্রান নদীও বলা হত। খুব সম্ভবতঃ পাইলাং বা পায়াং আল্লাইন উপগোষ্ঠীরা ঐ নদীর পাশ্ববতী পার্ব্বত্য অঞ্চলে সর্বাগ্রে বসতি স্থাপন করে নেন, এবং যারা পরে ধাবনকারী কুকিরা উক্ত গোষ্ঠীকে সেই স্থানের আদিবাসী বলে চিহ্নিত করে। 'রূফলী" নামটি সর্বত্র ভাবে প্রভাবিত থাকাই, ফলে ঐ 'পাইলাং' কিংবা 'পায়াং' গোষ্ঠীর নামটি উত্তরোত্তর গোটা পার্ব্বত্যবাসীর কাছে প্রকট হানি ঘটে ছিল বলে একান্তিক ধারনা। কেন না আধুনিক রূপিনীদের কাছে শুধু দূর সম্পর্কে পুরুষ রক্তের সম্পর্ক উদঘাটনের বেলায় বড়জোর ঐ 'পায়াংপাঞ্চি' নিষ্কাশন করে সম্পত্তির অধিকার নিরূপন করা হত। অন্যথায় ঐ পাইলাং বা পায়াং শব্দটি বিলুপ্ত প্রায়। তাছাড়া এই রূফলী নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটি আকর্ষনীয় প্রাকৃতিক অঞ্চল ছিল বলে ক্রমে আরো অন্যান্য গোষ্ঠীর লোক উক্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নেয়। উত্তরকালে তারাও রূপিনী বা রূফলী বলে পরিচয় লাভ করেছিল। তারা হচ্ছে কাছারী, পুরাণ-কুকি ও আরো অন্যান্য গোষ্ঠী সংমিশ্রনে রূপিনীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক গঠন লাভ করে। লেখক 'কৃষ্ণমালাতে' এক শ্রেণীর লুসাই, কুকিদের লুচি দফা বলে আখ্যান দিয়েছেন। তৎরূপ রূপিনী দফার লোককেও উক্ত পুঁথিতে রূফলী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সন্দেহ নেই যে সেই 'লুচি' শব্দটি আধুনিক লুসাই এবং রূফলী হচ্ছে আধুনিক রূপিনী। সম্ভবতঃ দ্বিজরামগঙ্গা মহাশয় অর্থাৎ কৃষ্ণমালা গ্রন্থের রচয়িতা কাব্যের শব্দলঙ্কারের নিমিত্তই শব্দের তারতম্য ক্রমে বিকৃত রূপে সাজিয়েছেন এবং অনভ্যস্ত উচ্চারনে রূপিনীর, স্থানে রূফলী বলে উল্লেখ করেছেন। নতুবা রূফলী নামক শব্দটি লিখিত রূপে সংরক্ষিত না হওয়াতে কালক্রমে লোকের মুখে মুখে এসে শেষে রূপিনী বলে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় তাও একেবারে উপেক্ষীয় নয়। যাইহোক, এ বিষয় নিয়ে জটপাকানোর নিষ্প্রয়োজন মনে করি এবং আধুনিক কালে এই জনজাতির বা গোষ্ঠীর নাম যে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাই আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি এটা হচ্ছে "রূপিনী"।

এইতো গেল গোষ্ঠীর প্রকৃত উচ্চারনের তারতম্যতার কথা, এখন মূল বিষয়ের উপর আলোচনায় আসা যাক। যারা কয়েকটি গোষ্ঠী সমেত ঐ রূপিনী নদীর উপত্যকায় পরে প্রবেশ করেছিল এবং প্রথমদিকে এইসব গোষ্ঠীদেরও পায়াং গোষ্ঠীর ন্যায় স্ব স্ব গোষ্ঠীর নাম অনুসারে পরিচয় দিতে শুরু ছিল; কিন্তু অচিরেই তা বিলোপ হয়ে পাশ্ববর্তী জনজাতিদের সম্বোধিত নামানুসারে পরিচয় দিতে শুরু করে বলে জানা যায়। এই উপগোষ্ঠীগুলি মিলে পরবর্তী সময়ে যৌথভাবে একটিমাত্র নামাকরণ হয় 'রূপিনী'। তাদের সংমিশ্রিত ভাষা,

সংস্কৃতি, আচার, আচরণ ও সামাজিক শাসন ব্যবস্থা থেকে অনায়াসে এটা অনুধাবন করা যেতে পারে। ঐ পরিচয়কে জানা আরও সহজতর হয়েছে। তাদের উৎকৃষ্ট এবং অপরিহার্য্য আভ্যন্তরীণ বর্ণ বৈষম্যের মধ্য দিয়ে। রূপিনীদের বর্ণভিত্তিক বিভিন্ন শাখার অভ্যন্তরীণ বিশেষ কাজের দক্ষতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী বর্ণ বা উপগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। আবার এই উপগোষ্ঠীগুলি মিলে মধ্যে নামই শুধু উল্লেখিত আছে। কিন্তু এইসব উপগোষ্ঠীর কার্যতঃ কোন শ্রম দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্ক কোন সংস্রবে নেই তারাই হচ্ছে রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তরকালে অন্যান্য উপগোষ্ঠীর লোক, রূপিনীতে অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল, যেমন- কাজারী, কেরজাং, সমজাং, সুতবরিসা ইত্যাদি। তা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তাদের স্ব স্ব উপগোষ্ঠী বিলীন হয়ে রূপিনী বলে নিজেকে পরিচয় দিলেও তাদের চির অভ্যস্ত ভাষা, রীতি নীতিকে সহসা ত্যাগ করা সহজ ছিল না। ফলে স্ব স্ব গোষ্ঠীর ভাষা সাংস্কৃতিক আচার আচরণ, রীতি নীতিকে রূপিনীদের মধ্যে জড়িয়ে প্রভাবিত করার প্রয়াসে ধাপাধাপি শুরু হয়েছিল। তার পরিনামই হচ্ছে উত্তরকালে রূপিনীদের ভাষা স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ, উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক বিকাশ, পূর্ণ বিশ্লেষনযোগ্য রীতি নীতি এবং আদিম প্রনালীর সাম্যবাদ, এই সবই হচ্ছে সম্মিলিত গোষ্ঠীর দ্বারা গড়া রূপিনী জাতির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু যতই অন্যান্য গোষ্ঠীর লোক রূপিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরে ক্রমে স্ব স্ব গোষ্ঠীর ধ্যান ধারনাকে প্রভাবিত করলেও রূপিনীদের মূল গোষ্ঠী ‘পায়াং’ এর প্রভাব একেবারে তলিয়ে যায়নি। তাই উক্ত গোষ্ঠীর ভাষার শব্দ বা অস্তিত্ব উত্তরকালেও রয়ে যায় তা আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি। যেমন ঃ সমাজ শাসনের কয়েকটি শব্দ আইন বা প্রথার কয়েকটি শব্দ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির শব্দ তা একান্তই মৌলিক ও নিজস্ব। বলা বাহুল্য, রূপিনীদের মূল অঙ্গ পায়াং গোষ্ঠী সংখ্যায় অধিক বলে এদের প্রভাব বেশী ছিল। উক্ত গোষ্ঠী থেকেই কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সমগ্র রূপিনী সম্প্রদায়ের সামাজিক শাসন কার্য্যে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। সামাজিক ব্যবস্থায় এই বিষয়ে আরোও বিস্তারিত আলোচনা করব।

এই সংমিশ্রত গোষ্ঠীরা সমবেতভাবে রূপিনী নদীর উপত্যকার পার্শ্ববর্তী তটভূমিতে প্রায় (মিশ্রিত হওয়ার পর থেকে আনুমানিক) সঞ্চাল থেকে ২টি বৎসর একত্রে বসবাস করার পর, তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা মিত্রতা বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে অভিন্ন জাতির সত্বা রূপ লাভ করে। তারাই উত্তরকালে রূপিনী সম্প্রদায় বলে পরিচিতি লাভ করে। ১৪শ শতকের প্রথমার্ধে রূপিনীরা ‘তৌয় রূপিনী’র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিরাট সংখ্যক রূপিনী জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল বলে বিশেষ সূত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক রূপিনী জনজাতি এই স্থানে রয়ে যায় (যারা পরে পুরাণ কুকি থেকে রূপিনী গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিল তারাই সেই স্থানে রয়ে যায়)। উক্ত তৈয় রূপিনী থেকে নানাকারণে উৎখাত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অন্যত্র গিয়ে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে বলে জানা যায়। ঐ তৌয় রূপিনী এবং তার পার্শ্ববতী পার্ব্বত্য ক্ষেত্রের নাম

"কাঙ্গলাই" ছিল ইহা তৎকালে ত্রিপুর রাজ্যের অংশ ছিল অর্থাৎ সমগ্র বরবক্রের দক্ষিণ অংশ ত্রিপুরেশ্বরের অধিকৃত অঞ্চল ছিল এবং ইহাকে তখন "পূর্ব্বকূল" বলা হত। বরবক্রের উত্তর তীরে সমগ্র ক্ষেত্র ছিল (হিরিম্ব বা কাছাড়) রাজার অধিকৃত তা সুনির্দিষ্ট রূপে কৃষ্ণমালাতে উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ-

কাঙ্গংলাই নামে এক পর্ব্বতর শৃঙ্গ।
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ ॥
ইসব স্থানেতে বৈসে যত কুকি চয়।
পূর্ব্ব কুলিয়া বলি তা সবায়ে কয় ॥
বরবক্র নদী রাজ উত্তর কুলেতে।
হিড়িম্ব রাজার অধিকার রাজ্য তাতে ॥
তার দক্ষিণে ত্রিপুর রাজ অধিকার।
কুকিগণ বৈসে যত সে পর্ব্বত মাঝার ॥

(কৃষ্ণমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ২৩)

কৃষ্ণ মাণিক্যের ৩১ তম প্রাক পুরুষ ডাঙরফার মৃত্যুর পর ছিকাম জাতীয় কুকিরা প্রথম ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার দাবী তুলে এবং তা প্রকট হয়েছিল ত্রিপুর রাজার অধীনস্থ আদিপ্রজা গোষ্ঠীদের বিতাড়ন হতে। এই বিদ্রোহের প্রথম শিকার রূপিনীরাই হয়েছিল, তাই তীয় রূপিনীতে বসবাসকারী আদিবাসীদের উপর লুটপাত ভয়ভীতি প্রদর্শন করে উক্ত স্থান থেকে উৎখাত করে দিয়েছিল বলে জনশ্রুতি থেকে জানা যায়। তা অবিশ্বাস্য হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা ডাঙরফার কনিষ্ঠ পুত্র রত্নমাণিক্য গৌড় রাজার সহায়তায় পিতার জীবিতকালে ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিলেন এবং এই যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। তিনি ত্রিপুরার আধুনিক ইতিহাসে প্রথম মাণিক্য রাজা বলে বিবেচিত হন। অনেকদিন যাবৎ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর পিতৃ বন্টনকৃত ভ্রাতাদের অঞ্চল একের পর এক রত্নমাণিক্য আক্রমণ চালিয়ে হস্তগত করে নেন। "সপ্তদশ ভ্রাতা রত্নমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে আত্মবলি দিয়েছিলেন এবং তার পিতা ডাঙরফা নিজের দেশ পরিত্যাগ করে কুকিদেশে "থানাংচিতে" মৃত্যু বরণ করেছিলেন"। এই গৃহ বিবাদে ত্রিপুরা রাজের সুশাসন প্রবল ভাবে বিঘ্ন ঘটে এবং তা প্রায় ধ্বংসরাধিক কাল কেটে যায়। রাজ্যের এই শাসন শীথিলতার সুযোগে রত্ন মাণিক্যের প্রতি অসন্তুষ্ট কুকিরা ত্রিপুর রাজার বিরুদ্ধে চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে। রত্ন মাণিক্য গৌড় রাজার সৈন্য সামন্ত নিয়ে পিতৃ ভূমি ত্রিপুর রাজ্য আক্রমণের কাহিনী রাজমালার প্রথম লহরে উদ্ধৃত আছে। খুব সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে একান্ত ধারনা। এই সময়েই রূপিনীরা তৈয় রূপিনী থেকে উৎখাত হয়ে ছোট ছোট দল নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ ধলেশ্বর নদী বেয়ে

সোজা দক্ষিণে ধাবন করে থানাংচিতে গিয়ে বসবাস করেছিল; আবার কেউবা পূর্ব্ব দিকে মেকলী রাজ্যে গিয়ে ছিকামদের থেকে দূরে বসতি স্থাপন করে। কিছু সংখ্যক রূপিনীরা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে চাথেঙ্গ নদীর সংলগ্নে হায়চেক নামক স্থানে রূপিনীদের নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে। আদিকাল থেকে লোকমুখে শ্রুতি থেকে জানা যায় রূপিনীরা নাকি ত্রিপুর রাজার শেষ সীমান্তবাসী প্রজা। কুকিরা স্বাধীনতার দাবি নিয়ে ত্রিপুর রাজার বিরুদ্ধাচারণ করলে রূপিনীদের পক্ষ থেকে কোন রকম সহযোগিতা পেত না; ফলে উক্ত গোষ্ঠীর উপর আগে থেকে কুকিদের বিদ্বেষভাব ছিল। ত্রিপুর বংশের কোন রাজার শাসনে শীথিলতার পারিবারিক কোন রাজার সিংহাসনের অভিষেকের বিলম্বতার সুযোগে "ছিকাম"রা বেআইনী সংগঠিত (কুকিদের কয়েকটি গোষ্ঠী) স্বশাসন ও বিচ্ছিন্নতার দাবীতে আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠত। খুব সম্ভবতঃ রত্নমাণিক্যের শাসনকালের প্রারম্ভে(১৪৩৬-১৪৪০) ত্রিপুর জাতির উপর বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ ছিকামরা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল। তখন তৈয়ে রূপিনীর কাছে বসবাসকারী আদিবাসী রূপিনীদের উপর হিংসাত্মক হানা, নর হত্যা ও লুন্ঠন শুরু করে। ত্রিপুরার অলিখিত ইতিহাসে ইহা বিরল ঘটনা। ছিকামরা রূপিনীর অধ্যুষিত অঞ্চল 'তৈয়ররূপিনী' নামক স্থানে প্রবেশ করে অতর্কিতে খোঙ্গ বাদ্য (জাংজোঙ) বাঁজিয়ে প্রথমে অত্র এলাকার মানুষকে হতবম্ব করে দিত, তারপর ভয়ঙ্কর. বাদ্যের শব্দে আতঙ্ক মানুষদের অর্তকিতে আক্রমণ করে ধারালো খড়গ দিয়ে কেটে ভূতশায়ী করে দিত। (প্রসঙ্গতঃ যখনই জুমের ফসল উৎপাদনের পরে ঘরে ঘরে বাৎসরিক রসদ মজুত রাখা হত, তখনই ছিকামরা এই হিংসাত্মক হানা (চবাকচাক) সংঘটিত করত। তারপর প্রত্যেক ঘরের বাসন, ভূষন, মুদ্রা এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর দ্রব্যাদি লুটপাত করার পর যথাসম্ভব কৃষিজাত দ্রব্য, গবাদি পশু লুন্ঠন করে নিত। এইসব কৃষি উৎপাদন দ্রব্যাদির মধ্যে যেমন ধান, কার্পাস, তিল ও ভক্ষণযোগ্য গৃহপালিত পশুপাখি মেরে নিয়ে যেত এবং স্থান ত্যাগ করার পূর্বে এই এলাকার ঘরে ঘরে অগ্নি সংযোগ করে দিয়ে যেত; যাতে পুনরায় সেখানে বসবাসের অভিপ্রায় না জন্মে। ছিকামরা হানা শেষ করে যাওয়ার পথে উল্লাসে তাদের ভাষায় জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে যেত; যেমন কোন যুদ্ধ জয় লাভের পর রাজার সৈন্যবাহিনীরা করে থাকেন। প্রাচীনকাল থেকেই হিড়িম্ব (বর্ত্তমান কাছাড়), মেকলী (বর্ত্তমান মণিপুর) এইসব রাজ্যগুলিতে প্রবলভাবে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের অঙ্গ, তান্ত্রিক ও শৈব ধর্মের প্রভাবিত ছিল। রূপিনীরা উক্ত রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী আদিবাসী হলেও তদানীন্তন 'তৈয়ররূপিনী' স্থানটি ছিল ত্রিপুর রাজের অধিকৃত অংশ। ফলে উক্ত স্থানে বসবাসকারীদের মধ্যে কম-বেশী প্রাচীন শৈব ধর্মের প্রভাব ছিল; তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই চারিপার্শ্বে বেষ্টিত কুকিদের অধ্যুষিত অঞ্চলে রূপিনীরা বসবাস করলেও আচার, আচরনে অনেকটা প্রাচীন হিন্দুর শৈব ধর্মকে অনুসরণ করত। সেই স্থানের তদানীন্তন প্রভাবশালী ম্লেচা-কুকি দফার আচার, আচরণ কিংবা সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে রূপিনীর আচার

আচরণ ও সামাজিক ব্যবস্থায় বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের শাসন কর্তা অর্থাৎ হিন্দু প্রভাবিত ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে বিদ্রোহী ছিকাম কুকিদের নানা বিষয়ে দ্বিমত ছিল। ফলে ত্রিপুর রাজার অনুগত প্রজা এবং শাসক গোষ্ঠীর স্বজাতির গোষ্ঠী বলে গোটা 'তৈয় রূপিনী' স্থানে বসবাসকারী নিরীহ রূপিনীদের উপর ঈর্ষা পরবশে 'ছিকাম'রা প্রথম হিংসাত্মক আক্রমণ করে। একটি প্রবাদ বাক্য বহুদিন থেকে রূপিনীদের মধ্যে প্রচলিত আছে 'ছিকাম কিরি" অর্থাৎ ছিকামদের ভয় পাওয়া। রূপিনীদের মধ্যে যারা তৈয় রূপিনী পরিত্যাগ করে উত্তরোত্তর দক্ষিণ পশ্চিমে ধাবন করেছিলেন, তাদের যদি কেউ প্রশ্ন করেন রূপিনীদের একমাত্র উত্তরই হচ্ছে "ছিকাম কিরিই"। ত্রিপুরার ককবরক ভাষীদের মধ্যে অনেকেই 'ছিকাম চবা'কে ভয় পেত। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তারা (রূপিনী ব্যাতিত) অন্যান্য ককবরক ভাষী জনজাতি প্রাককালে ছিকাম চবার শিকার হয়েছিল কিনা তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন। এই "ছিকাম কিরি" বা ছিকাম চবা শব্দটির মধ্যে এক নিষ্ঠুর ভীতিগ্রস্থ মানসিকতার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। তাহলে রূপিনীদের প্রাচীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে (অর্থাৎ যারা তৈয় রূপিনীতে বসবাসকারী) বিশেষ একটা নিরাপত্তার অভাব ছিল তা স্পষ্টই বুঝা যায়। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কেননা তৈয় রূপিনী স্থানটি বরবক্রের দক্ষিণ তীরবর্তী স্থান তদানীন্তন ত্রিপুরার একটি অংশ ছিল, যা ত্রিপুরার রাজপাট থেকে সুদূর দূর্গম স্থান হওয়ায় কোন নিরাপত্তা মূলক বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যেত না। আবার তার মাঝে মাঝে স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদী পেড়িয়ে জলপথ অতিক্রম করে যেতে হত। তদানীন্তন নৌকার ব্যবস্থা খুব কম থাকাতে নৌকার বিকল্প বাঁশের ভেলা ভাসিয়ে জলপথে অতিক্রম করতে হত। খুব সম্ভবতঃ ত্রিপুর রাজার রাজধানী সংলগ্নে থাকার জন্যই তৈয় রূপিনী হতে উৎখাত হয়ে সোজা দক্ষিণ প্রান্তে ধাবন করে, রূপিনীরা একবার জলপথে একবার পদচারণে শেষে চাথেঙ্গ নদীর তীরে উপনীত হলে এবং সেখানেই কিছুদিন বসবাস করেন। তদকালে উক্ত স্থানটি ছিল ত্রিপুর রাজেরঅধীনস্থ প্রজা লাল রুঙ্গিয়া ও বঙ্গ কুকীদের অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও অন্যান্য ছিকাম জাতীয় কুকীর মত নির্মম বৈরী ছিল না। অগত্যা রূপিনী গোষ্ঠীরা সেখানেও বেশী দিন বসবাস করার সুযোগ পায়নি। খবর পেয়ে ছিকাম কুকিরা রূপিনীদের নতুন আবাস স্থানেও আক্রমণ করে। একদিন জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে গোটা রূপিনীদের বসতিতে অর্তকিতে কুকীরা বর্বরোচিত ভাবে আক্রমণ করে। রূপিনীদের প্রতি ছিকাম বৈরীদের এই আক্রোশ তাদের দ্বিতীয়বার আক্রমণ থেকেই অনুমান করা যায়। তবে দ্বিতীয়বার ছিকাম বৈরীরা পূর্ব্বের ন্যায় নর হত্যা ও রক্তের হোলি খেলতে পারেনি। ভয়াবহ 'ছিকাম চবা' সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত রূপিনীরা সদা সর্তক ছিল এবং ছিকামদের উক্ত স্বভাব, রীতি নীতি ও গতিবিধি সম্পর্কেও যথাযথভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলাতে তাদের দ্বিতীয়বারের আক্রমণটি খুব বেশী ক্ষতি করতে পারেনি। বৈরী কুকীরা যখন অদ্ভুত ধ্বনি কুকি ঢোল (জামজুং) পিটিয়ে ধীরে ধীরে রূপিনী বসতিতে আসত বিপদ ধ্বনি

জামজুংএর শব্দে রূপিনীরা সতর্কিত হয়ে, তখন ঝোপঝাপে গা ঢাকা দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল, বলে জানা যায়। "ধুয়ামাপড়া" (এক ধরনের মন্ত্র পড়া মাদক দ্রব্য) সেবনের নেশায় নেশার উন্মাদনায় উক্ত কুকিরা তড়িৎ গতিতে তাদের দুর্বৃত্তি চালিয়ে যেতে পারে। এত দ্রুত গতিতে তারা আক্রমণ করত যে, লুক্কায়িত ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করার মত সময়টুকু তারা ব্যয় করত না। লোক শ্রুতি থেকে জানা যায়, সাধারণ দরজার পাতের আড়ালে গা ঢাকা দিলেও নাকি তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। দ্রুত গতিতে ছিকামদের লুন্ঠনের কাজ দিবালোক না হয় জ্যোৎস্না রাত্রে ছিকামদের এইভাবে খোলাখুলি ঢাক ঢোল পিটিয়ে হানার অভিযানকে " চবা কুফুর" বলা হয় অর্থাৎ সাদাসিধা হানা দেওয়া। এই চবা কুফুর কুকিদের কাছে একটা বীরত্ব প্রদর্শনের রীতি ছিল। এই চবা কুফুরের মাধ্যমে অকুকি গোষ্ঠীদের বিতাড়িত করে নিজ গোষ্ঠীর বা কুকিদের আবাস ভূমি দখল - কুকিদের প্রতিপত্তি বিস্তার করাই তাদের মূলতঃ উদ্দেশ্য ছিল। তাই রাজার স্বজাতীয় গোষ্ঠী অর্থাৎ রূপিনীদের তারা শত্রু ভাবত। তদানীন্তন ত্রিপুর রাজার পূর্ব্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রূপিনী ব্যতীত ত্রিপুরার রাজ্যর বিশেষ অনুগত প্রজা কেউ ছিল না বলে বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের কাছে শুনা যায়।

দ্বিতীয়বারের ছিকাম বৈরীদের হানা রূপিনীদের এক জোটে বসবাসে বিশেষ হানি ঘটেছিল, ফলতঃ আতঙ্কগ্রস্থ রূপিনীরা ভয়ে ছোট ছোট দল নিয়ে বিভিন্ন দিকে সরে পড়ে। এই গোষ্ঠী চাথেঙ্গ নদীর সন্নিবিষ্ট অঞ্চল পরিত্যাগ করে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ধাবিত হয়েছিল বলে জানা যায়। যারা কয়েকটি দল নিয়ে সোজা পূর্ব্বদিকে গিয়েছিল তারা মণিপুরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। আবার যারা দক্ষিণ পশ্চিম ঈশান কোণে দীর্ঘ পদচারনে অগ্রসর হয়েছিল তারা হাইচেক নামক পার্ব্বত্য ভূমিতে গিয়ে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করেন। তথাকথিত বৈরী ছিকামদের উৎপাত থেকে সেই সব স্থানটি মুক্ত ছিল, কেননা ত্রিপুরার রাজার প্রতিনিধি সেখানে বহাল ছিল বলে স্থানটি সুনিশ্চিত এবং নিরাপত্তাধীন ছিল বলে জানা যায়। সেই স্থান লাঙ্গাই নামক এক ধরনের কুকি গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও ছিকাম কুকিদের মত বর্বর ছিল না। রূপিনীদের অপভ্রংশ যারা ধলেশ্বর (ধলাই) নদী বেয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে বাঁশের ভেলায় করে এসেছিল তারা খানাংচিতে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল বলে জানা যায়। সেই সময় ঐ অঞ্চলটি ত্রিপুরার অধীনস্থ বলে ত্রিপুর রাজের একটি থানা ছিল এবং এই থানার নাম অনুসারেই এই অঞ্চলের নাম থানাংচি হয়েছিল বলে 'রাজমালা'তে উদ্ধৃত আছে। খুব সম্ভবতঃ থানার অনতিদূরেই রূপিনীদের আবাসস্থান গড়ে উঠেছিল বলে একান্ত ধারনা। তৎকালীন ঐ স্থানটি পুরাতন কুকিদের আচার আচরণ ও সামাজিক শাসন ব্যবস্থা (ভারতের প্রাচীনতম প্রথার দ্বারা প্রভাবিত) নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে পরিচালিত হত এবং যে লঙ্ঘন করত তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। উত্তরকালে রূপিনীদের সমাজের শাসক

কর্ত্তা হিসাবে "রায়" পদের সৃষ্টি হয় এবং পরে "কামছিকাউ" পদটি নামের মাধুর্য্যই রয়ে যায়। থানাংচিতে বসবাসকালীন পুরান কুকীদের সামাজিক ব্যবস্থার অনুকরণে সামাজিক রীতি নীতি সৃষ্টি হয়েছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপিনীদের লোক ইতিহাসে 'রায়' কিংবা কামছিকাউ মত সমাজ শাসকের সর্দ্দার হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে যারা দক্ষিণ পশ্চিম ঈশান কোণে ধাবন করেছিল এবং তাদের সমাজ শাসক মোড়লকে 'মুন্সী' বলে আখ্যায়িত হত। এই 'মুন্সী' শব্দটি কুকীদের মোড়ল 'মুসদি' শব্দটি ককবরক উৎচ্চারণে বিকৃত রূপ পেয়ে 'মুন্সী' শব্দে নিষ্পন্ন হয় বলে জানা যায়। কিন্তু তৈয় রূপিনীতে বসবাসকালীন মুনশী বলে রূপিনীদের মধ্যে উচ্চপদস্থ কোন সমাজ শাসকের ভূমিকা লোক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে কিছু সংখ্যক কুকি রূপিনী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিল, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাতে দেখা যায় 'তৈয়-রূপিনী' থেকে উৎখাত হয়ে চাথেঙ্গ নদীর উপত্যকায় গোটা রূপিনীরা মিলিত হলেও পরবর্তীতে, কারণে, কারণে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এতে দেখা যাচ্ছে যারা হাইচেক নামক পর্ব্বতো-পড়ি গিয়ে নুতন উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারা তৈয় রূপিনীতে থাকাকালীন অভ্যস্ত প্রাক সামাজিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে কুকি সমাজশাসন তন্ত্রের অনুকরণে রূপিনীদের সমাজ বির্বতন করতে অনেক সময় লেগেছিল।

১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের আমলে আসাম রাজ্যের দুইজন রাজদূত রতন কন্দলী ও অর্জুন দাস বৈরাগী ত্রিপুরা ভ্রমনে এসেছিলেন। তারা বরাক নদী হয়ে ত্রিপুরাতে প্রবেশ কালীন, তখনকার যে বিভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন যা আমরা ত্রিপুর সেনের ত্রিপুর-দেশের-কথা পূর্বে উল্লেখিত তা নিম্নে প্রণিধান যোগ্য : "খাসপুর হতে অনুমান ছয় দণ্ড কালের পথ গিয়ে উদারবনে মুখরা নদীতে নৌকায় উঠিয়া সেই দিনই আমরা বরাক নদীতে পড়িলাম। এই জায়গা হইতে বরাক নদী দিয়া উজাইয়া গিয়া চারদিনে লক্ষ্মীপুরে পৌঁছিলাম, সেই জায়গায় দুইদিন থাকিয়া সেখান হইতে রওনা হইয়া পাঁচদিনে কাছার ও ত্রিপুরার সীমানা রূপিনী নদীর মুখ পাইলাম। সেখানে কোন লোক বাস করে না। সেখানে নদীর দুইধারে পর্ব্বত। রূপিনী নদীর মুখ হইতে তিন দিনে আসিয়া ত্রিপুরা রাজার অধীনস্থ রাংরুং এ উপস্থিত হলাম। সেখানে বরাক নদীর দুইধারে পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে আমাদের দেশের নাগা ও উলফাদের মত লোকেরা বাস করে তাদেরকে কুকি বলে। সেখানে অনুমান তিনশত লোক আছে। তাদের অস্ত্র তীর, ধনুক, ঢাল এবং নাগার মত। তাদের উপর কর্তৃত্ব দিয়া ত্রিপুরার রাজা তাদের একজনকে সর্দ্দার করে দিয়েছেন; এই সর্দারকে লোকে 'হালামছা' বলে। আমাদের দেশের নাগাদের মধ্যে খুমবাউ নাগারা যেমন ঠিক সেই প্রকার। ঐ হালামছা একজনই থাকে। তাদের খাওয়া পরা নাগাদের মত। তবে তারা গরু খায় না। সেই জায়গায় ত্রিপুরার রাজার একজন লস্কর থাকে। তাহাকে জানাইয়া দিলে আমাদেরকে ত্রিপুরার রাজার তরফ থেকে এক রাত্রি থাকার জন্য

দেওয়া হয়। এই লস্কররা মাঝে মাঝে বদলী হয়। এই স্থানে পাওয়া যায় গবয়, হাতীর দাঁত, গেলা মরিচ, সুপারী, পান, ধান, কাওন, তরমুজ, কুমড়া, কচু, আদা, ফুটি, করলা, বেগুন এবং তুলা। এখানে কাছাড় ও মেকলী দেশের মানুষ এসে বেচা কেনা করে। বরাক নদীর পার থেকে আমরা চারদিনে রূপিনী পাড়ায় পৌঁছলাম। রূপিনী পাড়া থেকে রাংরূং লোক ফিরিয়া ছিল। এবার এখানে লোকেরা থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই জায়গায় লোকরা রাংরূংঙ্গীয়াদের মতন কুকি বটে। এই জায়গায় লোকেদের উপর ক্ষমতা দিয়ে ত্রিপুরার রাজা একজন ত্রিপুরাকে সর্দ্দার করে বসাইয়াছিলেন। লোকে তাকে 'মুনশী' বলে। সেখানে তৈয়-জলপাড়া নামে একটি জায়গা আছে; সেখানে লোকেরা এসেএখানের লোকেদের সঙ্গে একসাথে হয়ে আমাদেরকে পূর্ব্বের মত নিয়ে চলল। রূপিনী পাড়া থেকে আমরা চারদিনে ছারঠাং নদীর পাড়ে পৌঁছলাম, সেখানে কুমজাং নামে একটি পাড়া আছে। রূপিনী পাড়া, তৈলজল পাড়া, কুমজাং পাড়া, ছাইরাংচুক এই চারটি পাড়ার মানুষ রাজাকে প্রতি বৎসর কর বুঝাইতে হয়। হাতীর দাঁত গবয় খেসকাপড় গোল মরিচ ও কার্পাস।" (ত্রিপুরা দেশের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ২৮-৩০ বাংলা অনুবাদ, ত্রিপুরা চন্দ্র সেন)।

এই ভ্রমন বৃতান্ত্য থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় যে, পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে (অর্থাৎ ২য় রত্নমাণিক্যের শাসনের একটু আগে) তৈয় রূপিনীতে জনবহুল রূপিনী জনজাতি বসবাস করলেও, পরবর্ত্তীকালে ঐ স্থানটি রূপিনীদের পরিত্যক্ত জনপদ হিসাবেই সেকালে পরিচিতি ছিল। তাই আসামের রাজদূতদ্বয় বরাক নদী হয়ে ত্রিপুরাভিমুখে প্রবেশ কালীন ঐ পরিত্যক্ত জনপদ অতিক্রম করে রূপিনী নদী বেয়ে আসতে হয়েছিল। তারা রূপিনী নদীর দুইধারে শুধু পরিত্যক্ত জনপদের পার্ব্বত্য স্থানের দৃশ্য দেখেছিলেন। কিন্তু কোন রূপিনীভুক্ত ব্যক্তিদের সেখানে তাদের বর্ণনায় দেখা যায়নি। পরে এই রাজদূতরা অনেক দূরবর্ত্তী দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়ে রূপিনীদের আবাসস্থান পেয়েছিল (অর্থাৎ হাইচেক পার্ব্বত্য অঞ্চলের সংলগ্নে নতুন উপনিবেশ রূপিনীদের গ্রাম)। প্রথম রত্নমাণিক্যের শাসনকাল থেকে প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে আসামের রাজদূতদ্বয় ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। কালের ব্যবধানে সেই নতুন স্থানে গিয়ে রূপিনীদের রীতি নীতি এবং সমাজ ব্যবস্থার অনেক কিছু পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে, তা অসম্ভব কিছু নয়। খুব সম্ভবতঃ রূপিনীরা ত্রিপুর রাজার অনুগত এবং আদিপ্রজা হিসাবে নতুন স্থানে এসে নিজেদের ত্রিপুর বলে পরিচয় দিত। কিন্তু মনে প্রাণে তারা রূপিনীগোষ্ঠীভুক্ত জনজাতি, তা গোপন করে রাখত। নিজেদের মধ্যে পরিচয় প্রদানের সময় রূপিনী বলে পরিচয় প্রদান করলেও ত্রিপুরার মহারাজার কাছে ত্রিপুরা জাতি বলে পরিচয় দিত। সেই সময়ে সমগ্র ত্রিপুরায় মহারাজার অধীনস্থ ককবরক ভাষা ভাষীদের ত্রিপুর জাতি বলে পরিচয় দিতে একটা রেওয়াজ ছিল। ত্রিপুর জাতি প্রকারান্তে ত্রিপুরা জাতি হিসাবে তথাকথিত রাজদরবারেও তারা পরিচয় দিতেন। ত্রিপুর মহারাজাও

ককবরক ভাষাভাষী ছিলেন বলে বড়জোর সমগ্র ককবরক ভাষাভাষী প্রজাদের স্বজাতীয় প্রজা বলে স্বীকৃত দিতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি এবং কর প্রদানের বেলায় তাদের কিছুটা শীথিলতা দিত। (প্রসঙ্গতঃ পরে গোটা পুরান কুকিদের হালাম উপাধিও তদরূপ)। কুকীদের কাছে কর সংগৃহকারী কুকিদের সর্দ্দার তথা ত্রিপুরার মহারাজের মনোনীত সর্দ্দারই "হালামছা" উপাধি ছিল। কিন্তু পরে নতুন ত্রিপুরাতে নবাগত গোটা পুরান কুকিদের একতরফা "হালাম" উপাধি বিলিয়ে দিয়ে উন্নাসিকা তুলে দিয়ে ছিলেন। এতে তাদের কাছে থেকে রাজকর আদায়ের পথ সহজ হয়ে যায়। সেই সব ফন্দি, তখনকার প্রজাদের রাজ বশে রাখারই একটি পন্থা মাত্র; অন্যথায় তারা রাজার অধীনে আসবে না। বর্ত্তমানকালের মত পুলিশ, প্রশাসনের মাধ্যমে দমকীয়ে বা অন্যান্য সুবিধা দিয়ে সরকারের আয়ত্ত্বে আনা হত। কিন্তু তদানীন্তন বৃন্দিয়াদের দ্বারা কাঁচা প্রজা, রাজকর প্রদানে অনিচ্ছুক লোকদের দমন করে রাজার কব্জায় আনা হলেও দূর্গম পার্ব্বত্য এলাকায় অস্থায়ী ভাবে বসবাসকারীদের কাছ থেকে কর আদায় করা এক দূরহ ব্যাপার ছিল।

রাংরূংঙ্গিয়াদের আবাস স্থান পেরিয়েই আসামের রাজদূতদ্বয় ও তার দল যখন রূপিনী অধ্যুষিত আবাসস্থানে পৌঁছে ছিলেন। তারা রূপিনীদের সর্দ্দার ব্যাতিত অন্যান্য গ্রামবাসীদের রূপিনীসম্প্রদায়ভুক্ত বলেছেন এবং তাদের সর্দ্দারকে তাঁরা ত্রিপুরাভুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্ব্বেই বলেছি যে সাধারণতঃ ককবরক ভাষাভাষী অর্থাৎ তদানীন্তন রাজভাষা জানা লোকেরা যারা রাজার অধীনস্থ মনোনীত প্রতিনিধিরা রাজার সম্মুখে 'ত্রিপুর জাতি' বলে পরিচয় দিলে, তারা রাজার কাছে সমাদর একটু ভিন্নতর হত। স্বভাবতই বিচক্ষণ রূপিনী সর্দ্দাররা রাজদূতদ্বয়ের কাছে "ত্রিপুরা" জাতি বলে পরিচয় প্রদান করে কোন ভুল করেনি। খুব সম্ভবতঃ রাজার প্রতিনিধি, পাড়ার সর্দ্দার এইসব গোষ্ঠীর উত্তর পুরুষদের উপাধি অনুসরনেই ত্রিপুরার সীমান্তে বসবাসকারী রূপিনীরা নামের শেষে "ত্রিপুরা" পদবী ব্যবহার করতে শুরু করেন। বর্তমানে ভারতের আদম সুমারী লক্ষ করলে দেখা যায় যে, রূপিনীদের বিরাট অংশের নোয়াতিয়া জনগোষ্ঠী বলে পরিচয় লাভ করে। কিন্তু তাদেরই একটি গোষ্ঠীর অংশ হাইচেক নামক পর্ব্বত অঞ্চলে বসবাসকালীন কোন কারনে লঙ্গাই নদী বেয়ে ত্রিপুরার পূর্ব্ব উত্তর অংশে (অধুনা ত্রিপুরা) ধামছড়া নামক এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানে গিয়ে নুতন উপনিবেশ করেছিলেন। তারা সম্মিলিত ভাবে ঐ স্থানে বসবাসের পর একদিন রূপিনী গোষ্ঠীর সর্দ্দার নির্বাচন নিয়ে বিস্তর গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে একটি গোষ্ঠীর আরও একটি সর্দ্দারের আত্মপ্রকাশ হলে এবং এই সর্দারের অধীনস্থ দল অধুনা ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অরণ্য ভূমিতে জলপথে এসেছিল বলে জানা যায়। খুব সম্ভবতঃ উক্ত বিক্ষোভকারী দল পূর্ব্বের আবাস হাইচেক (হাচাক) পরিত্যাগ করার সময় রূপিনীদের মধ্যে সুজাতি লাভের প্রবণতা অর্থাৎ ত্রিপুরাজাতি মর্যাদা লাভের প্রবনতা তখন খুব একটা দেখা দেয়নি। তাই অধুনা দামছড়া এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে

বর্ত্তমানেও রূপিনী গোষ্ঠী বলে পরিচয় দেয় এবং নামের সঙ্গে রূপিনী উপাধি লিখে থাকেন। খুব সম্ভব এই গোষ্ঠী পূর্ব্বের আবাস স্থান দামছড়া(কাছাড় অর্ন্তগত) ত্রিপুরাতে প্রবেশ করে তাদের নুতন আবাস স্থানকেও দামছড়া বলে পুনরায় নাম প্রদান করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই নবাগত গোষ্ঠী যারা ত্রিপুরার দামছড়াতে নুতন বসতি গড়েছিল তারাও লাঙ্গাই জাতির মত আদি কুকিদের সংস্পর্শে এসে "কামছিকাউ" বা কাস্স্কক ও "রায়" সমাজের উচ্চ পদাধিকারী সর্দ্দারের নামাকরণ করেন। (বলা বাহুল্য এই রায় বা কামছিকাউ পদটি ত্রিপুরার প্রচিন রাজা তথাকথিত ত্রিবেগা বলে জানা যায়। এই সময়কার নৃপতিদের দ্বারা পদবী এলাকার সর্দ্দার বলে ধারনা করা যায়। গোটা পুরান কুকিদের (আদিজাতি কিরাতদের উত্তরপুরুষ) মধ্যে রায় এবং কামছিকাউ পদের মর্যাদা বহুদিন পেরিয়ে গেলেও পরবর্তীকালে উক্ত গোষ্ঠীর সর্দ্দার নিজ অঞ্চলে রাজার সমতুল্য মর্য্যাদা পেতেন। সর্বোপরি পুরান কুকিরা ছিলেন খুবই সংরক্ষণশীল; হওয়ায় তাদের আচার আচরণ, রীতি নীতি অন্যান্য আদিবাসীরা রপ্ত করে এবং এইসব আদিবাসী সেটাকে সাঙ্গীকরণ করে নিয়ে শেষে ঐসব কৃষ্টি ও রীতি নীতিকে নিজস্ব বলে দাবী করেন।) যাইহোক এখন মূল বিষয়ে আসা যাক; যদিও রূপিনীদের একটি দল একজন সর্দ্দারকে অনুসরণ করে ত্রিপুরার দামছড়াতে এসে উপনিবেশ গড়ে তুললেও রূপিনীদের বিরাট জনগোষ্ঠী পুরাতন স্থান তথা হাইচেক পর্বতোপরি এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানে রয়ে যায়। এইস্থানে এখনও রূপিনী গোষ্ঠীভুক্ত (ত্রিপুরা) আদিবাসীরা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছে। এইসব স্থান হচ্ছে যেমনঃ কেলতী, ইচামুয়া, দামছড়া (কাছাড়), গগন ছড়া, ছাগল নাইয়া, তৈয়জল পাড়া, বুইট্যাংখাল ইত্যাদি স্থানে। এইসব রূপিনী গোষ্ঠীরা বাহ্যিকভাবে ত্রিপুরা বা তেয়া বলে পরিচয় প্রদান করলেও প্রকারান্তে তারা রূপিনী গোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ এবং তৈয় রূপিনী থেকে উৎখাত হয়ে আসা ত্রিখণ্ডের একটি অংশ। বাকী দ্বিতীয় অংশ থানাংচিতে এবং তৃতীয় অংশটি মেকলী দেশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে স্ব জাতীয় অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে এবং অনায়াসে তাদের রূপিনী গোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ বলে ধরে নেওয়াও এখন সহজ নয়। আদিস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য এলাকায় গিয়ে তারা নিজস্ব আচার আচরণ ও ভাষা ভুলে গিয়ে অন্যান্য জাতির আচার আচরণ এবং ভাষাকে অভ্যস্থ করে নেয়। খুব সম্ভবতঃ তৈয় রূপিনী থেকে উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে ধাবনকারীরা বর্ত্তমানে লালং, বর্মন এবং সিং পদবীধারী কাছাড়ীদের মিলে গেছে।

সাকা রূপিনীদের বর্ত্তমান আবাসস্থান ঃ

রূপিনীদের প্রথম অংশ অর্থাৎ যারা হাইচেক বা হাচুীক পর্ব্বতের সংলগ্নে বসবাস করত তাদের মধ্যে অনেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পরে ত্রিপুরাতে এসেছিল বলে বিশেষ সূত্র থেকে জানা যায়। এখনো তাদের বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে দেখা

যায় । এগুলি হচ্ছে ধৰ্ম্মনগরস্থিত কয়েকটি স্থান যেমন ঃ বৈরাগী বাড়ী, মধুবন, আশীদ্রোন, রাজনগর, পেচারথল, ৮২মাইল ইত্যাদি । কাছাড় থেকে শুরু করে ধর্মনগর পর্যন্ত যে রূপিনীরা বসবাস করত তাদের সাকা রূপিনী (অর্থাৎ উজান রূপিনী) বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকেন । উক্ত গোষ্ঠীরা কাছাড় অন্তর্গত হাইচেক বা হাচীক পরিত্যাগ করে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করার কয়েকটি কারণ ছিল বলে জানা যায় । খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে নুতন সীমানাভুক্ত ত্রিপুরাতে সাকা রূপিনীরা দ্বিতীয়বার ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে ধারনা । প্রথমতঃ কিছু সংখ্যক রূপিনীদের অংশ তারপর উত্তরোত্তর কাছাড় পরিত্যাগ করে ত্রিপুরাস্থিত ধর্মনগরে এসে আবাস গড়ে তুলেছিল বলে জানা যায় । প্রথম যারা এসেছিল তারা হচ্ছে যখন যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য কুকি দমনের জন্য পূৰ্ব্বপকূলবৰ্ত্তী (তদানীন্তন ত্রিপুরার অংশ)স্থানে কুকিদের সঙ্গে যুবরাজের তুমুল যুদ্ধসংঘটিত হয়েছিলেন এবং কিছু রূপিনী গোষ্ঠী যুবরাজের পক্ষে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল । তারাই প্রথম ত্রিপুরাতে বসবাস করতে আসে বলে ধারনা করা যায় । এই যুদ্ধে কোন কোন গোষ্ঠী কৃষ্ণমাণিক্যকে সাহায্য দান করেছিল । কৃষ্ণমালার কয়েকটি পংক্তি থেকে তা জানা যায় এবং সেখানে রূপিনী গোষ্ঠীর নামও সন্নিবিষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নে প্রনিধানযোগ্য ঃ

হেন কালে উপদ্রব পূৰ্ব্বকূলে হৈল ।
বঙ্গ পাড়া থাকি সবে সমাচার পাইল ॥
খুচু দফা এক কুকি লুচি দফা আর ।
সে সব না থাকে অধিকার ত্রিপুরার ॥
তারা আসি পূৰ্ব্বকূলে দস্যুবৃত্তি করি ।
মনুষ্য মারিয়া ধন লৈয়া যায় হরি ॥
তা দেখিয়া যুবরাজ বিষাদ ভাবিয়া ।
হিড়িম্ব দেশেতে গেল পরিবার লৈয়া ॥
সে রাজার পাশে যুবরাজ লিখিল ।
তোমার দেশেতে মোর পরিবার রৈল ॥
পূৰ্ব্বকূলে আমাপ্রজা বৈসে কুকিগণ ।
দস্যু আসি তা সবাকে করে বিড়ম্বন ॥
তে কারণে পূৰ্ব্বকূলে আমি চলি যাই ।
আমা পরিবারগণ রাখি এই ঠাঁই ॥
হিড়িম্ব রাজার পাশে লিখিয়া লিখিয়া লিখন ।
যুবরাজ পূৰ্ব্বকূলে করিল গমণ ॥
রাংখল পাড়াতে গিয়া হৈল উপস্থিত ।
বাৰ্ত্তা পাইয়া কুকি সব আসিয়া মিলিল ॥

ছাকাছেক খামাচেক চরাই রাঙরঙ্গ ।
রাংখল ছাইরেম ছাঁতে ছাইমার বঙ্গ ॥
লাঙ্গাই রূপিনী তিনপঁই কুঙ্গ জন ।
এসব প্রকৃতি কুকি আসিল তখন ॥
এসব কুকিকে আনি কহে যুবরাজ ।
তোমরা সকলে কর যুদ্ধ হেতু সাজ ॥
যুবরাজ আদেশে হরিষে কুকিগণ ।
সজ্জ হৈল সব কুকি যুদ্ধের কারণ ॥

(কৃষ্ণমালা তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা ৫০-৫৫)

ত্রিপুরার রাজাকে ছিকাম কুকিদের দমনের সহযোগীতার পর উক্ত সাহায্যকারীদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী সমেত রূপিনীরাও ত্রিপুরাভিমুখে এসেছিল বলে ইতিহাস সূত্রে প্রমান পাওয়া যায় । কারণ এতবড় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ছিকাম কুকিদের সংলগ্নে থাকা তাদের পক্ষে ক্ষণে ক্ষণে বিপদের আশঙ্কা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তথাকথিত ধর্মনগরস্থিত অঞ্চল অব্দি ছিকাম কুকিরা দস্যুবৃত্তি করতে সক্ষম ছিল না । কেননা সেই স্থানে ত্রিপুরার মহারাজার পেয়াদারা সদা তৎপর থাকত। ধর্মনগরস্থিত কয়েকটি অঞ্চলে কৃষ্ণমালায় উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, তদানীন্তন যুবরাজকে একাধিক গোষ্ঠীর হালাম সম্প্রদায় সাহায্য করেছিল । এখনও এই উক্ত স্থানে প্রভৃতি সম্প্রদায় বসবাস করছে । ছাকাচেব খামাচেব, চরাই (চরুই), রাঙরুঙ্গ, বঙ্গ (বঙ্গচের) ছাইমের প্রভৃতি সম্প্রদায় যারা কৃষ্ণমাণিক্যকে কুকি (ছিকাম) দমনের কাজে সহায়তা করেছিল এবং এই সমগ্র গোষ্ঠীরা রূপিনীদের সংলগ্নে বসবাস রত আছে ।

এইতো গেল ঐতিহাসিক কারনে উজান রূপিনীদের ত্রিপুরাস্থিত ধর্মনগরে আসার একটি কারণ । কিন্তু উক্ত রূপিনীদের জনপ্রবাহিত লোক-কথার বর্ণিত একটু ভিন্ন দর্শায় । অরুন দেববর্মার (উপজাতি গবেষনা কেন্দ্রের গবেষনা সহায়ক) সংগৃহিত তথ্যাবলী হতে জানা যায় যে, চা বাগান স্থাপনের সময় বৃটিশদের উৎপীড়নে নাকি উক্ত রূপিনীদের একটি অংশ কাছাড় থেকে উৎখাত হয়ে ত্রিপুরাভিমুখে চলে আসতে হয়েছিল । রাজনগরের বাসিন্দা জয়ন্ত ত্রিপুরা (রূপিনী) হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীও শ্রীদেববর্মার পাণ্ডুলিপির বিবরণ অনুযায়ী ঃ "আজ থেকে আনুমাণিক ১৫০-২০০ শত বৎসর আগে বৃটিশরা আসাম অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করার সময় (আনুমাণিক লর্ড কর্নওয়ালিস্ সময়) তৈয় রূপিনীর কাছে বসবাস করতো তাদের মধ্যে দুই ভাই প্রচণ্ড পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন । তাদের একজনের নাম পুরুষরাই অপরজনের নাম পোষরাম । তাঁরা যাদুমন্ত্রের গুণে বলীয়ান বীর যোদ্ধা ছিলেন । গাটা রূপিনী গোষ্ঠীর উপর অত্যাচার চালাতে এমনকি বৃটিশরাও ঐ দুই ভায়ের প্রতিপত্তিতে এড়িয়ে যেতে হত এবং ঐ অংশটি দখল করার সাহস পেত না ।

স্বীয় উদ্দেশ্যে সাধনে অটল বৃটিশরা এই অঞ্চল অধিকৃত করার জন্য প্রায়শই রূপিনীর উপর অত্যাচার শুরু করলে, তখন উক্ত দুই ভ্রাতা মন্ত্রের বলে সোনার মাছরূপ ধারণ করে উজান থেকে প্রবাহিত রূপিনী নদীর জলে স্রোতের সঙ্গে বেয়ে নিম্নে অবতারণ করে অতর্কিতে বৃটিশদের আক্রমণ চালাতেন। ফলে ইংরেজরা উক্ত দুই ভায়ের আকস্মিক আক্রমনের প্রতিরোধের জন্য দিবা-রাত্র সদা সতর্ক থাকতে হ'ত।

একদিন যুদ্ধশেষে জলপথে উজান বেয়ে এই দুই ভাই ফিরার পথে, এমন সময় হঠাৎ ইংরাজদের ধোপানী উক্ত যুগল সোনার মাছটি দেখে ইংরাজ সেনাপতিকে তৎত্র অবগত করে। তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজ রূপিনী নদীর অববাহিকায় ৭খণ্ড লোহার জাল পেতে তাদের ধরার প্রতীক্ষা করতে থাকে। যখন দুই ভাই জলপথে বেয়ে আবার যুদ্ধ করার জন্য আসার সময় অকস্মাৎ লোহার জালে আটকে পড়েন এবং নিজেদের মুক্ত করতে ধারালো তলোয়ার (সাংছা) দিয়ে একের পর এক ৬টি লোহার জাল কেটে ফেলেন এবং আর একটি কাটার সময় ইংরাজরা সাড়া পেয়ে যায়। বন্দুকধারী ইংরেজরা জাল তুলা সুরু করলে ঐ দুই ভাই স্থির করলেন যে ইংরেজদের হাতে ধৃত হওয়ার পূর্ব্বে আত্মহত্যাই শ্রেয় বলে নিজেদের তলোয়ার দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

তারপর রূপিনীদের একমাত্র ভরসা হাইছা দুই সেনাপতি বা সর্দ্দারের মৃত্যুর পর ছিকামদের ভয়ে, না হয় ইংরেজদের অত্যাচারের ভয়ে, অনেকেই ত্রিপুরাভিমুখে পালিয়ে আসে। তারপরও যারা ঐ অঞ্চলে (কাছাড়) ছিল, ইংরেজরা তাদের ত্রিপুরায় যাওয়ার জন্য বিব্রত করত। বর্তমানে তারা কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে। তখন থেকেই তারা রূপিনী গোষ্ঠীভুক্ত কথাটি গোপ্ত রেখেছিল বলে একান্ত ধারনা আর সেইজন্যেই নিরাপদে তারা সেখানে বাস করতে পেরেছিল। "রূপিনীদের হাইছা হওয়া নাকি অত্যধিক কষ্টকর, উজান রূপিনীদের (সাকা রূপিনী) একটি প্রবাদ আছে। ঐ দুই ভাই নাকি মৃত্যুর আগে বলে গেছেন যে বনের সাদা মোরগ ও সাদা মথনা (গবয়) দিয়ে "তৈয় রূপিনীতে" পূজা দিলে নাকি তাঁরা আবার পূনর্জন্ম নেবেন। রূপিনী হাইছাদের মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে, তখন হালামরা বিদ্রুপ করে একটি কথা বলতো "রূপিনী হাইছা চকালুক, মানে রূপিনীদের রাজা বা সেনাপতি ফাঁদে পরে মরেছে"।

স্যাকা (উজান) রূপিনীদের আদি বাসস্থান ও বর্ত্তমান বাসস্থান প্রসঙ্গে মধুবন নিবাসী দ্রোন সিং ত্রিপুরা (রূপিনী) ও বিষ্ণু ত্রিপুরাকে (রূপিনী) জিজ্ঞাসাক্রমে অরুন দেব্বর্মা জানতে পারেন যে, " পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা মেকলী দেশ, বর্মা সীমান্ত হয়ে দক্ষিণে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে ঢাকা, উত্তরে পুরো সিলেট ব্রহ্মপুত্র পার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই সময়ে কাছাড় অঞ্চল ও ত্রিপুরার রাজ্যের অংশ ছিল। তৈয় রূপিনীর উৎস মুখ থেকে কিছু দূরবর্ত্তী অঞ্চলের চারিপাশে বিক্ষিপ্তভাবে রূপিনী গোষ্ঠীর আবাস স্থান আজও বিদ্যমান আছে। কিন্তু দেশ কাল, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারনে বর্ত্তমানে তারা "বর্মন" উপাধি ধারণ

করে কাছাড়ি, ডিমাছাতে অংশে মিশে গেছেন। এখানকার রূপিনীরা লাংলং বা তেয়া বলে তাদের চিহ্নিত করে থাকেন। মনুষ্যপুর, দমনপুর, দীননাথপুর, সোনাপূর, ফাকুয়া, বরুঙ্গা ইত্যাদি গ্রামে এখনো তারা বসবাস করছেন।

ত্রিপুরাস্থিত মধুবনে তাদের আসার পিছনে দ্রোনসিং ত্রিপুরা বলেছেন যে, তৎকালীন সময়ে ইংরেজরা বা ঐ এলাকার বাসিন্দাদের ত্রিপুরী বংশোদ্ভব বলে ত্রিপুরাতে যাওয়ার জন্য প্রায়ই বিব্রত করত। যার ফলে দ্রোনসিং ত্রিপুরার (রূপিনী) পিতা আরাম রূপিনী আনুমাণিক ১০০বছর আগে তার আত্মীয় স্বজন সমেত ত্রিপুরায় চলে আসেন এবং প্রথমে তিনি ধর্মনগরস্থিত অফিসটিলার কাছে বসতি স্থাপন করেন। পরে উর্ব্বর জুম চাষের খুঁজে অগ্রসর হতে হতে বর্ত্তমানে মধুবনে এসে স্থায়ীভাবে বসতি করেন। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্যরাও কাছাড় পরিত্যাগ করে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল।

সাকা রূপিনীদের মধ্যে দেব্বর্মা কিংবা ত্রিপুরা লেখার একটি কাহিনী আছে, তা অরুন দেব্বর্মার সংগৃহীত লিপি থেকে জানা গেছে। শ্রী দেব্বর্মার জিজ্ঞাসাক্রমে বিষ্ণু ত্রিপুরা চমকপ্রদ ঘটনা বিবরণ নিম্নে উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ পূর্ব্বে মহারাজার আমলে ত্রিপুরার সমস্ত প্রজার তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতি সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে সমগ্র প্রজাকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তখন বিষ্ণু ত্রিপুরার গ্রামবাসীদের মধ্যেও দুইজন প্রতিনিধিকে রাজদরবারে পাঠানো হয়। প্রতিনিধি হিসাবে আলম রূপিনী ও তার সাথীরা সাত দিন সাত রাত্রি পদব্রজে আগরতলায় উপস্থিত হন। একের পর এক সবাই স্ব স্ব জাতি-ধর্ম রাজাকে জানায়, যখন তিনি নিবৃত্তে এক কোনে বসা প্রতিনিধিদের উপর নজর পরেন এবং রাজা তাদের প্রশ্ন করেন যে, "তাদের জাতি বা ধর্ম কি ? অশিক্ষিত লোকটি দরবারে হাজারো পাত্রমিত্র পরিষদের সম্মুখে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে গদ গদ করে বলে ফেলেন যে তারা "কৃষ্ণমন্ত্রী" জাত, বলতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত জাতি। তখন রাজা কিছুটা রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে কোথায় কৃষ্ণ আর কোথায় তোমরা ! তোমরা আবার কি করে কৃষ্ণের মন্ত্রী জাত হলো।" রাজা তাদের কথায় অসন্তুষ্ট হন। রাজার রুষ্ট চেহারায় উক্ত প্রতিনিধিরা ভয়ে রাজদরবার পরিত্যাগ করে অনাহারে অনিদ্রায় দূর্গম পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

অতঃপর মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য ধর্মনগর পরিভ্রমনকালে রূপিনীদের আবাসস্থান পরিদর্শন করেছিলেন। রূপিনীদের আচার আচরণ ও ভাষা দেখে তাদের নোয়াতিয়া বা নুতন ত্রিপুরা ভেবে তখন মহারাজা তাদের ত্রিপুরা উপাধি ধারণকরতে বলে যান। তদ্বধি গোটা ঐ অঞ্চলের রূপিনী গোষ্ঠীভুক্তরা নামের সঙ্গে ত্রিপুরা বা দেব্বর্মা লিখতে শুরু করেন। কাছাড়, মণিপুর এই সমস্ত রাজ্যের সন্নিকটস্থ বসবাসকারী রূপিনীরা কাছাড়ী ও মণিপুরীদের সম্প্রদায়ের আচার আচরণ ও রীতিনীতি এবং সামাজিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে

নেয়। এমনকি পোষাক পরিচ্ছদ ও একাত্ম করে নেন।

সাকা রূপিনীদের আবাস স্থানান্তরের লতিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

রূপাঅঞ্চল বা তৈয়রূপিনী
(উত্তর কাছাড়)

↓

চাথেঙ্গ নদীর উপত্যকা
(দক্ষিণ কাছাড়)

↓

হাইচেক পার্ব্বত্যভূমি
(দক্ষিণ কাছাড়)

↓

অধুনা ত্রিপুরা

↓

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
৮২মাইল (ধলাই)	দামছড়া (ধর্মনগর)	রাজনগর (ধর্মনগর)	মধুবন (ধর্মনগর)	বৈরাগীবাড়ী (ধর্মনগর)	বাড়ীধুম (ধর্মনগর)	পেচারথল (ধর্মনগর)

খামা রূপিনীদের আদি ও বর্ত্তমান বাসস্থান

প্রাক-মাণিক্য যুগ থেকেই 'রূপিনী' নামে একটি গোষ্ঠী 'তৈয়রূপিনী' অঞ্চলে অনেক যুগ ধরে বসবাস রত ছিল। কিন্তু রত্নমাণিক্যের শাসনকালে ছিকাম কুকিদের বর্বরোচিত আক্রমণে রূপিনী গোষ্ঠী সেই স্থান থেকে উৎখাত হয়ে চাথেঙ্গ নদীর উপত্যকায় কিছুদিন আবাস গড়ে তুলেন। উক্ত কুকিরা পুনরায় রূপিনীদের নুতন আবাস স্থানে গিয়ে হানা দিলে সেখান থেকে বিরাট জনসমষ্টি তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তারা যে স্থানে গিয়ে উপনিবেশ করেছিলেন এইসব স্থান হচ্ছে যেমন ঃ তথাকথিত ত্রিপুর রাজ্য (অধুনা ত্রিপুরা), পূর্ব্বকূল (দক্ষিণ কাছাড় তদানীন্তন ত্রিপুরার অংশ), মেকলী দেশ (মণিপুর), হিড়ম্ব দেশ (উত্তর কাছাড়), থানাংচি (অধুনা মিজোরাম) প্রভৃতি অঞ্চল। সেখানে তারা নুতনভাবে বসবাস করেছিল বলে বিশেষ সূত্র থেকে জানা যায়। প্রথম অংশটি উত্তরকালে সাকা রূপিনী বলে পরিচিতি লাভ করে এবং দ্বিতীয় অংশটি উত্তরোত্তর নিম্ন দেশে চলে আসায় তাদের "খামা রূপিনী" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

তৃতীয় অংশ যারা ' তৈয় রূপিনী' সংলগ্ন রাজ্যে গিয়ে গা ঢাকা দেয় তারা ক্রমশ অন্য জাতিতে বিলীন হয়ে যায়। তারা এখন বর্মন, লালং, তেউন, কাছাড়ী হিসাবে আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। তাদের ঃ লক্ষিপুর, বিষ্ণুপুর, শিলচর প্রভৃতি স্থানে এখনো দেখা যায়।

এখন আসা যাক, দ্বিতীয় অংশের রূপিনী গোষ্ঠীতে যারা তৈয়রূপিনী পরিত্যাগ করে চাথেঙ্গ নদীর উপত্যকায় নুতনভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই চাথেঙ্গ নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে বসবাসকারী রূপিনীরা খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত হয়নি। এই অঞ্চল হতে উক্ত স্থান থেকে ধলেশ্বরী নদীর জলে বাঁশের ভেলা উপর চেপে সোজা দক্ষিণাভিমুখে গিয়েছিলেন এবং তথাকথিত থানাংচিস্থিত (মিজোরাম), ছাইরাংচাক নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই অঞ্চলটি পুরান কুকিদের অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল (প্রাচীন কিরাত জাতি)। তাদের ধর্ম, বর্ণ আচার-আচরণ মিল হওয়াতে সহসা রূপিনীরা ঐ স্থানে আশ্রয় পান। তাদের উত্তর পূর্ব অংশে ছিল কুকিদের আবাস অঞ্চল। (উক্ত ছিনা কুকিদের ধর্ম, আচার-আচরণের সঙ্গে পুরান কুকিদের আচার, আচরণ, ধর্ম-বিশ্বাস, রীতি-নীতির মিল ছিল না। তথাপি ভাষায় কিঞ্চিৎ মিল ছিল। তাদেরই সগোত্র বিদ্রোহী "ছিকাম"রা আগে রূপিনীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল।) কিন্তু আইজল সংলগ্ন ছাইরাঙচাক অঞ্চলে তারা দস্যুবৃত্তি করত না; তাই রূপিনীরা নিবৃত্তে ঐ ছাইরাঙচাক নামক নুতন আবাস ভূমিতে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাক আর্য ভারতীয় আদিবাসী পুরান কুকিরা প্রাচীন হিন্দু শৈব্য ধর্মে প্রভাবিত এবং রূপিনীরাও ঐ শৈব্য ধর্মেই অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাই পরস্পরের মধ্যে হানাহানি ও বিতাড়ন প্রভৃতি কুকর্মে লিপ্ত হতেন না।

রূপিনীরা ঐ ছাইরাঙচাকে পুরাণ কুকিদের দেশে গিয়ে সুপ্রতিবেশী হয়েছিলেন বলে স্থানটির নাম ছাইরাঙচাক বলে আখ্যায়িত হয়েছিল বলে একান্ত ধারনা। 'ছাই' অর্থাৎ রছায়া, 'রাঙচাক' অর্থাৎ সোনা; সংযোজন হয়ে সোনারছায়া। ধলেশ্বর নদীর দুই ধারে অরন্যময় পার্ব্বত্য ভূমি ছিল এবং এই অরন্যে একটি শ্বেত হস্তীর উৎপাতে চারিদিকে আলোড়ন পরে যায় কিন্তু কেউবা ওটাকে ধরতে সাহস ছিল না। একদা রূপিনী গোষ্ঠীর একজন সাহসী যুবক উক্ত শ্বেত হস্তী চলার পথ চিহ্নিত করে এবং ঐ পথে একটি মায়ুঙয়ারাই (অর্থাৎ হাতীর ফাঁদ) তৈরী করে ঐ শ্বেত হস্তীটিকে ফাঁদে ফেলে ধৃত করেছিলেন বলে জানা যায়। অতঃপর উক্ত শ্বেত হাতীকে থানাংচি রাজার কাছে নিয়ে গেলে রাজা ঐ যুবকের সাহস এবং বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হন এবং গৌড়বর্ন সুন্দর চেহেরা দেখে রাজা উক্ত যুবকের জাতি, ধর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি রূপিনী গোষ্ঠীভুক্ত বলে পরিচয় দেন বলে কথিত আছে। বলাবাহুল্য প্রাককালে এইসব অঞ্চলে শুধু রূপিনীরাই হাতীর ফাঁদ তৈরী করতে জানত (মায়ুঙউারাই) তাই থানাংচি রাজ সাদরে গোটা রূপিনীদের যারা ছাইরাঙচাক নামক নুতন স্থানে বসতি স্থাপন করেছেন তারা সবাইকে রাজার রাজধানীতে স্থান দিয়েছিলেন। থানাংচি রাজ তাদের আইজলের হাতীশালার সংলগ্নে আবাস স্থান প্রদান

করে হাতী ধরার কাজে বহাল রেখেছিলেন ।

অন্যদিকে উদয়পুরে ধণ্যমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আসীন হয়ে রাজ্য শাসন করছিলেন । তিনি খুব প্রতাপশালী ছিলেন এবং বাহুবলে একের পরএক অঞ্চল হস্তগত করে নেন । তিনি অদৃষ্টপূর্ব শ্বেতহস্তীর কথা শুনে ঐ হাতী ত্রিপুররাজের কাছে প্রেরণে বার্তা পাঠালে, থানাংচি রাজ তা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । ফলে ত্রিপুররাজ থানাংচি আক্রমণ করেন এবং আট মাস যুদ্ধ করার পর থানাংচিরাজ পরাজিত হয়ে ত্রিপুররাজ ধণ্যমাণিক্যের কাছে বৈশ্যতা স্বীকার করেন বলে রাজমালায় উদ্ধৃত আছে । তখন থানাংচি পুনঃরায় ত্রিপুর রাজার হস্তগত হয়েছিল বলে জানা যায় । ত্রিপুররাজ শ্বেত হস্তী সমেত তার রক্ষনাবেক্ষণকারী গোষ্ঠী, রূপিনীদের নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের তদানীন্তন মায়নী হালুং (মায়াগাথু) নামক স্থানে পুনঃর্বাসন দেওয়া হয় । রূপিনীদের পুনঃর্বাসন এর সুযোগ সুবিধা দেখে থানাংচির সমগ্র পুরান কুকি ধীরে ধীরে মায়ানী হালুংভিমুখে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং রূপিনীদের পাশাপাশিই তাদের বসবাস গড়ে উঠে । তৎকালীন ঐ অঞ্চল রিয়াঙ্গ(রিয়াং)এর অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল । তখন সম্মিলিত ভাবে রিয়াং, বারখীল পুরান কুকি, রূপিনী আরও অন্যান্য গোষ্ঠীরা সুখে দিনপাত করেছিলেন বলে বিশেষ সূত্রে জানা যায় । বলাবাহুল্য এইভাবে অনেকদিন বসবাস করাতে রূপিনীদের সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতিতে বিকাশ লাভ করে । এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় অনেকদিন একই স্থানে থাকার ফলে একে অপরের সংস্কৃতি ভাষা রীতি নীতি আদান প্রদান হয়ে থাকে । প্রসঙ্গত তৎকালীন এই মায়ানী হালুং তথা সমস্ত চট্টগ্রাম পার্শ্ববর্তী রাজরাজাদের লোভনীয় স্থান ছিল; ফলত; বার বার ত্রিপুর রাজার নিকট হতে এ অঞ্চল হস্তচ্যুত হয়ে আরাকান এবং মুসলমান দখলে চলে যেত । তাই যারা ত্রিপুর রাজার অনুগত প্রজা এবং অন্যান্য আশ্রয়কারীদের সেখানেই পুনঃর্বাসন দেওয়া হত । এরা ছিল যেমন রূপিনী, রিয়াং, কর্বং, মলসম, মরসই কৈরেং, তেয়া, উায়া, লঙ্গাই, খামচের ও কাইপেং, বংছের ইত্যাদি জাতিরা বারখীল পুরান কুকিভুক্ত ছিল । কয়েকটি গোষ্ঠী ব্যতীত পরবর্তী কালে তারাই হালাম উপাধি লাভ করেছিলেন ।

ঐতিহাসিক বনর্নানুযায়ী ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে "মায়ানী হালুং" তথা সমগ্র চট্টগ্রাম ধণ্যমাণিক্য পুনঃদখল করে নিয়েছিলেন এবং দখলের দুই বৎসরের মধ্যে থানাংচি দখল করে নেয় । ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে রূপিনীরা মায়ানী হালুং এ এসেছিলেন । ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে গোটা রূপিনী গোষ্ঠীর যারা রূপা বা রূপিনী নদীর উপত্যকায় থেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎখাত হয়েছিলেন এবং এখানে সেখানে কিছুদিন বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করার পর সোজা থানাংচিতে চলে আসেন । এতে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, ১৪৬৭ খৃঃ থেকে ১৫১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর অবদি রূপিনীদের থানাংচিতে বসবাস ছিলেন ।

ধন্যমাণিক্যের পরবর্তী ৭ম রাজা অমর মাণিক্যের (১৫৭৭-৮৬) শাসনকালে রূপিনীরা মায়ানী হালুং পরিত্যাগ করেন এবং তার সংলগ্ন কোন এক পার্ব্বত্য অরন্য ভূমিতে

পুনরায় বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে জনশ্রুতি থেকে জানা যায়। তিনি প্রজাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেও তাঁর রানী খুবই সুহৃদয় এবং প্রজাবৎসলা ছিলেন। তৎকালে রানীকে সবাই মাতা ইস্ত্রী বলে ডাকতেন। তখন সমস্ত চট্টগ্রাম আরাকানীদের হাতে চলে গেলেও মায়ানী হালুংটি ত্রিপুরার অধিকৃত রয়ে যায়। তাই ত্রিপুরার রাজা বৎসরান্তে উক্ত স্থানে বসবাসকারী ১২ খিল বা সম্প্রদায় হতে খাজনা আদায় করে নিতেন। পূর্বে প্রত্যেক ত্রিপুরার রাজাই উক্তস্থানে বসবাসকারী ১২ খীল গোষ্ঠী থেকে খাজনা আদায় করে নিতেন। প্রাককালে প্রত্যেক ত্রিপুরার রাজাই উক্তস্থান হতে কম বেশী খাজনা বৎসরের শেষে নিতেন, কিন্তু অমর মাণিক্যের খাজনা আদায় একটু ভিন্ন ও অশ্লীলতা পূর্ণ ছিলেন; তাই উক্ত মায়ানী হালুং এর অধিবাসীরা তাঁর উপর প্রবল ক্ষোভ ছিলেন।

যখন আদিবাসীদের ঘরে ঘরে জুমের ফসল তোলার কাজ শেষ হয়ে যেত তখন পাড়ায় পাড়ায় উঠে অমর মাণিক্য তাঁর সশস্ত্র বৃন্দিয়া সহ নিরীহ ১২ খীলভুক্ত জনজাতি হতে খাজনা আদায় করতেন। তাঁদের সম্মুখে সুন্দর নারী দৃষ্ট হলে রাজপাটে ধরে নিয়ে আসতেন কেউ তা প্রতিবাদ করার সাহস হত না। রাজার এই সব আচরণ নীরবে সহ্য করতে করতে চরম অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। তাই নিরীহ ১২ খীল জাতিরা তার প্রতিবাদের জন্য কিছু না কিছু উপায় খুঁজছিলেন।

একদিন ১২খীলভুক্ত হালাম দফার একটি সম্মিলিত সভা আহুত হয় এবং এই সভায় সমবেত ভাবে একটি বাক্যে সিদ্ধান্ত নেন, তা হল সেই বৎসর তারা রাজাকে খাজনা দেবেন না। তার সঙ্গে প্রত্যেকটি দফারই চুক্তি ছিল যে, যার বসতিতে রাজা প্রথম পদার্পন করবেন ঐ গোষ্ঠীর লোকই রাজাকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে। ১২ খীল দফার রায় (অর্থাৎ ১২টি গোষ্ঠীর সর্দ্দার) আরও সতর্ক করে দেন যে, কেউ যেন ঐ শর্ত লঙ্ঘন না করে এবং তখন প্রত্যেক দফার পাত্রমিত্ররা "রায়" এর নির্দেশ শিরধার্য্য বলে মাথা পেতে নিতে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

রাজা যখন খাজনা আদায় করার জন্যে হাতীতে চড়ে উপস্থিত হন এই সময়ে ঐ ১২ দফা গোষ্ঠীরা স্ব স্ব উপাস্যদেবতাদের জন্য হাঁস, মোরগ, গবয় ইত্যাদি উৎসর্গ করে পূজা অর্চনা শুরু করে দেন। প্রথমে রাজা হাতীতে চড়ে মলসম বসতিতে প্রবেশ করেন তিনি দেখেন বসতির প্রবেশদ্বারে মলসমরা সন্নিবিষ্ট ভাবে পূজায় ব্যস্ত। পূজার কারন রাজা জিজ্ঞেস করাতেই তারা উত্তর দেয় যে, রাজা আসবেন শুনে তাঁর মঙ্গলার্থে পূজায় করা হচ্ছে। তখন মহারাজ খুশী হয়ে "লাঙগী" খাবার একটি সোনার চুঙ্গী এবং জল ঢালার জন্য রূপার পাত্র উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি জানতেন না যে, রাজাকে আক্রমণের জন্য তাদের উপাস্য দেবতাকে অর্চ্চনা করছেন। এইভাবে একের পর এক বসতি পরিদর্শন করে তিনি দেখলেন সবাই ত্রিপুর রাজার সুস্বাগত জানিয়ে পূজা করছে। তিনি পাড়ায় পাড়ায় উঠে অনায়াসে খাজনা সংগ্রহ করতে থাকেন এবং

কোন দফার (জাতি) নিকট অপ্রীতিকর ব্যবহার ও খাজনা বাধা পাননি। রাজা ১১দফার কাছে খাজনা সংগ্রহের পর একটি দফার বসতিতে যান। তারা কামছিকাউ নামক তাদের রাজার অধীনে ১২৬ পরিবার নিয়ে গড়া একটি পাড়াতে ছিল, তারাই হচ্ছে রূপিনী দফা।

অতঃপর মহারাজ ও তার দেহরক্ষী সমেত ঐ রূপিনী বসতিভিমুখে ধাবন করতেই তিনি লক্ষ করেন বসতিতে অন্যান্য দফার মতই উক্ত গোষ্ঠীরা তাদের পাড়ার সম্মুখে সমবেত হয়ে পূজা অর্চ্চনায় ব্যস্ত রাজা হাতীর পিঠে চেঁপে ধীরে ধীরে রূপিনীদের বসতির সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখেন অজ্ঞ এবং সরলমনা রূপিনীরা মনে করেছে যে, রাজা এগার দফাদের পরাভূত করে এবার তাদের আক্রমণ করতে এসেছেন। রাজা নিঃসন্দেহে আগের মতই স্বাভাবিক ভাবে রূপিনীদের বসতির মুখ্যদ্বারে প্রবেশ করেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করেন যে সমবেতভাবে ঐ পূজার কারণ। তখন তাদের মধ্যে একজন অস্ত্রধারী রুক্ষ উক্তিতে উত্তর দিয়ে দেয় "তোমাকে মারার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, বলেই অতর্কিতে রাজার বুকে লক্ষ করে এক বিষাক্ত তীর ছুড়ে দেয়। ভাগ্যবশত লক্ষচ্যুত তীর রাজার বাম উরুতে বিদ্ধ হয় এবং আর্তনাদ করে হাতীর পিঠ হতে মাঁটিতে পড়ে সেবেলায় তিনি বেঁচে যান। এই অকস্মাৎ আক্রমণের জন্য রাজা সত্যই প্রস্তুত ছিলেন না, তাই সবাই হতভম্ব হয়ে পড়েন। রাজার দেহরক্ষী বৃনন্দিয়াদের সাথে প্রবল যুদ্ধে সঙ্ঘটিত হয়, এই অবসরে রাজা হামাগুড়ি দিতে দিতে একাকী এক বিধবার ঘরে গিয়ে বিষযন্ত্রনায় মুর্চ্ছা অবস্থায় যান। কিন্তু ঐ বৃদ্ধা বিধবাটি রূপিনী জাতিভুক্ত হলেও রাজার উপর তার কোন ক্ষোভ ছিলেন না, তাই রাজার ক্ষত স্থানে নানান বন্য ঔষধ প্রলেপ দিয়ে সুস্থ করে তুলেন। তারপর তিনি রাজধানীতে পৌঁছামাত্রই আজ্ঞাবাহী বৃন্দিয়াদের আদেশ করে দেন যে মায়ানী হারুং এ বসবাসকারী সমগ্র রূপিনী গোষ্ঠীদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে কেঁটে হত্যা করার জন্য। রাজাকে আক্রমণের পরিনাম রূপিনীদের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তা সেদিন অটল রূপিনীরা পিছিয়ে যায়নি। ভোর হতে না হতেই রাজার আজ্ঞাবাহী বৃন্দিয়ারা যথাক্রমে ঐ স্থানে ঘিরে টহল দিতে থাকে। সেদিন রূপিনী বংশের উষ্ণ রক্তের প্লাবনে ভাসিয়ে দেয় পবিত্র মায়ানী হারুং এর মৃত্তিকার বুকে রাজাকে আক্রমন করার ক্ষোভে প্রতিশোধের জন্য আজ্ঞাবাহী ঘটকরা সমগ্র রূপিনীকে হত্যা করতে থাকে। পরিশেষে বড়জোর দুই ভগ্নি-ভ্রাতাকে বাঁচিয়ে রাখে, তারা দেখতে খুবই সুন্দর ও নিষ্পাপ ছিলেন। তারপর ঐ বালক বালিকাকে চতুর্দ্দশ দেবতার কাছে উৎসর্গ করার জন্য রাজপাটে মহারাজার কাছে নিয়ে আসে। তাদের আজীবন কারাবাস হবে, না বলী হবে এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ক্রমে রাজদরবারে ভগ্নি-ভ্রাতাদ্বয়কে হাজির করা হয়। যখনি হাতকড়াই ঝুলানো যুগল ভাই ও বোনের অপূর্ব্ব সুন্দর ও নিষ্পাপ মুখ রাজ পরিবার এবং সমস্ত পরিষদবর্গ বিস্মিত ও বিমোহিত হয়ে যান। সবিস্ময়ে সবাই একই সুরে বলতে থাকে "এই বালক বলিকা !

দরবারে বিচারের শুনানীর পর তখন রাজা তাদের মৃত্যুদণ্ড ব্যতিত আজীবন কারাদণ্ড দেবেন। সন্তান সন্ততিহীনা রানী অতৃপ্তনয়নে ঐ বালক বালিকার দিকে চেয়ে থাকেন; এবং মনে মনে ভাবতে থাকেন কি অপরাধে এই পবিত্র এবং কোমল দুই ভাই বোনদের শাস্তি পেতে হবে একি বিচার ? তিনি বিনয় ভাবে পরিষদ বর্গের কাছে দাবী রাখেন যে, "আপনাদের বিচারে ভগ্নী-ভ্রাতাদের প্রদত্ত শাস্তি যাইহোক না কেন, কিছু জিনিষের বিনিময়ে মুক্তির পণ প্রদান করে তাদেরকে আমার স্বীয় সন্তান-সন্ততি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে কি ?" বলাবাহুল্য এর পূর্ব্বেও অনেক নীরিহ প্রজাদের এইভাবে শাস্তি প্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়ে রানী নিজের 'জন' বা জুলাই গোষ্ঠীর নাম প্রদান করে দিয়েছিলেন। তাই পরিষদবর্গের কাছে তা নুতন কিছু ছিল না। মহারানী তত্র হাতের বোনা মেয়েদের বুকের আচ্ছাদন (রিছা জঙ্কতক) হাতের বোনা একটি পাগ্রী (সেবং পগ্রী) নিপুন কারুকার্যে হাতের বোনা জামা (কানচুরুই রাইসু) দরবারে পরিষদবর্গের সম্মুখে দুই ভাই ভ্রাতার মুক্তি পণ হিসাবে রাজাকে উপহার দেন। তবু আইনত ঐ যুগল ভাই বোনকে কারাগারে ফেলে দিতে হয় এবং সেখানে গিয়ে সহৃদয় এবং মমতা ভরা রানী তাঁর স্বীয় এক গোছা চুল কেটে প্রদান করেন এবং তাদের হাত নিয়ে নিজের স্তন স্পর্শ করান। সেই দিন থেকে রূপিনীর গোত্ররা "মাতাইস্ত্রীর জন" অর্থাৎ রানীর প্রজা বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন এবং তারা রানীর সেবা যত্নের জন্য রাজ মহলেই বসবাস করতে হতেন। উত্তরকালে রূপিনীর অপভ্রংশ "জরাই" বা "জুলাই" জাতি বলে পরিচয় লাভ হন।

জুলাই জাতি বলতে শুধু রূপিনীদের বুঝাত, তা নয়; কয়েকটি জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে "জুলাই" বলে আর একটি গোষ্ঠীর সাধারণ নাম। তারা সাধারনতঃ রাজাকে খাজনা না দিয়ে রানীকে বাৎসরিক জুমে উৎপন্ন ফসল বা পশুপাখী দিতেন। সামান্যতম অংকে পণ হিসাবে বুঝাতে হত। সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের একটি পুঁথি লেখা থেকে জুলাই বিষয়ে তা আরও পরিস্ফুট লাভ করেছে। নিম্নে তা প্রণিধানযোগ্য, যেমন ঃ" ইহারা প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কোন ভাষার সঙ্গে কুকি ও মণিপুরী ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হালাম, রিয়াং, নওয়াতিয়া, জুলাই জাতীয় সাধারণ নাম ত্রিপুরা শব্দের অপভ্রংশ তিপরা এবং এদের ভাষা সমুদয়ের নাম তিপরা ভাষা।

জুম, কৃষি এবং জঙ্গল আবাদই এদের প্রধান কার্য্য। বুছাড়া, লাম্প্রা প্রভৃতি এদের উপাস্য দেবতা। এদের অধিকাংশের আচার ব্যবহার হিন্দু ধর্মের মত নয়।

একসময় রাজদ্রোহ অপরাধে কিছু ত্রৈপুর প্রজার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তদানীন্তন ত্রিপুর রাজমহিষী দয়া পরবশ হয়ে ত্রিপুর-পতির কাছে তাদের প্রাণ ভিক্ষা চান। মহিষী সন্তান হীনা ছিলেন, রাজা মহিষীর প্রার্থনা পূরণ করলেন। তিনি কারামুক্ত ব্যক্তিদের এক বাটি দুগ্ধ পান করতে দিয়েছিলেন। বাটিটি রূপার নির্মিত ছিল। দুধ দান করবার পূর্বে মহিষী তাকে আপন স্তন স্পর্শ করিয়ে ছিলেন। ঐ দুধ পান করার পর তিনি বিদ্রোহীদের

বললেন আজ থেকে তোমরা আমার পুত্র স্থানীয় হলে। তিনি তাদেরকে কয়েক গাছি চুল চিহ্ন স্বরূপ প্রদান করেছিলেন সেই পর্যন্ত তারা রানীর "জুলাই" নামে পরিচিত হয়।" (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী। পৃ ঃ ৩৬২)।

উপরিউক্ত বৃত্তান্তে সার নিষ্কাষণ করলে দেখা যায় যে রূপিনীরাও মায়ানী হালুং থাকাকালীন রাজদ্রোহে লিপ্ত হয়েছেন এবং পরে দুই ভগ্নি-ভ্রাতাদ্বয় মহারানীর সহায়তায় জীবন ভিক্ষাও পেয়েছেন। তাহলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে রূপিনীরাও 'জুলাই' জাতি। আবার উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে সমতলীয় ভূমিতে এসে উপনিবিষ্ট হয়েছেন বলে উজান রূপিনীদের কাছে খামা রূপিনী (পশ্চিমা রূপিনী) আর একটি সাধারণ পরিচয়। খামা রূপিনীর সাকা রূপিনী প্রকান্তরে তারা সবাই তৈয়ে রূপিনী থেকে উৎখাত হয়ে আসা রূপিনীর উত্তর পুরুষ। ঘটনা চক্রে কারণে কারণে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে এবং ছড়িয়ে পড়ে দুখণ্ডে দুই দিকে সুদূর অজ্ঞাত এবং অজানা দেশের মাঁটিতে।

জুলাই বা রূপিনীরা মায়ানী হালুং (বর্ত্তমানে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার ডম্বুরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থান) থেকে উৎখাত হয়ে সোজা উত্তরাভিমুখে ধাবন করেন। খুব সম্ভবত উদয়পুর রাজপাটকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াসেই তারা তাদের গতি স্থির করেছে বলে, একান্ত ধারনা। তারপর রাজধানীকে সুদূর পাশ্চাত্যেফেলে এসেছে ভেবে, তারা উত্তর পশ্চিমে প্রবেশ করে; কোন এক অরণ্যভূমিতে লুক্কায়িতভাবে জুমিয়ার উপর উপজীব্যে অতিবাহিত হন। ঐ অঞ্চলটি ছিল খোয়াই নদী একটু উত্তরে গিয়ে মনু নদীর উৎপত্তিস্থল স্থান। ঐ স্থানেও তাদের নিরাপত্তা ছিল না, কেন না, সংলগ্নে সমার নামক স্থানটি রাজার খুবই আনাগুণা ছিল, তাই তাদের আবাস স্থানের কথা ত্বরায় রাজার কাছে পৌঁছে যাবে। প্রসঙ্গতঃ (রূপিনীদের এই সব গুপ্ত এবং নিবৃত্তে কিছুদিন বসবাসের ইঙ্গিত উত্তরকালে কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। খুব সম্ভব খমা (খোয়াই) এবং মনু নদীর উৎস স্থলের সংলগ্নে বর্তমান যে স্থান আছে এই সব অবস্থানের নাম পূর্বে কিছু কিছু ভিন্ন নামে পরিচয় ছিল। তাই এইসব অরণ্যভূমির নাম নিষ্কার্ষণকরে বের করা খুবই দূরহ ব্যাপার)। (যাইহোক রূপিনীদের এইসব স্থানে বেশীদিন বসবাসের ইঙ্গিত লোক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই এইসব কিরাত আবাস স্থানের নাম বিলুপ্তই প্রায়। শুধু নদী অববাহিকায় কিছুটা সাক্ষী বহন করে রয়েছে।) এই অবস্থায় তারা দুই খণ্ডে দুই নদীর অববাহিকায় বাঁশের ভেলায় চাপিয়ে অপভ্রংশ দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে (অর্থাৎ নদীর স্রোত যে দিকে ভাসিয়ে নেয়) অপরটি উত্তর পূর্ব্বদিকে ভাসিয়ে কিছু দূরে গিয়ে অবতরণ করে। অন্যদিকে যারা দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে ভেসে যায় তারা কল্যাণপুর নামক স্থানে অবতরণ করে তার সংলগ্ন তদানীন্তন "মাড়ক হাদু" নামক স্থানে পর্বতোপরিতে নুতন ভাবে আবাস স্থাপন করে নেন। বলাবাহুল্য যে স্থানে প্রথম অবতরণ করেছিল তদানীন্তন সেই সমতলীয়বর্ত্তী স্থানটি জলাভূমি এবং নল খাগড়ার বন ক্ষেত্র ছিল, তাই তারা পর্বতো পরিতে আবাসভূমি বেছে নেন। এই

পর্বতের নাম হচ্ছে মাড়ক হাদু ।

মাড়ক হাদু নামক স্থানে (বর্ত্তমানে বড়মুড়ার সবচেয়ে উচ্চ শৃঙ্গ) এসে রূপিনীরা লবনের অত্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেন। সেই জন্যে তারা এই উচ্চ শৃঙ্গে লবনের কূপ নির্মান করেন। এই লবনের কূপের অস্তিত্ব এখনোও উক্ত স্থানে রয়ে গেছে। কিন্তু আমার দাদুর পিতামহ পর্যন্ত অবতারনা বাইরে ছিল। এতে অমরা উপলব্ধি করতে পারি যে বৃটিশ শাসনের অনেক পূর্ব্বেই রূপিনীদের একটি অংশ সেই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে নেন । খুব সম্ভবতঃ১৫শতকের শেষভাগে রূপিনীর এক অংশ মাড়ক হাদুতে উপনীত হয় । শুধু রূপিনীদের এই সময় কূপ খননের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় লবন উতরণ করে নিত। এই রকম বিবরণ আসাম বুরঞ্জীতে উদ্বৃত পাওয়া যায় । যেমন ঃ The out regent possession of the salt wells by the hill people and the secretary of salt in the plains in those days could not be tolerated by the ahom kings. The people earned a handsome money as a source of economy. Therefore, this polentical field of the salt stood as another cause for fighting between the Ahom king Shahummung alias Dihingia Raja and the owners of the Mohong well in 1536 A.D. The Ahom king own the war and succeded in possening the wells. The goboka and Borhat wells were also later acquired by the Ahoms. The previous owners however, not deprived of the salt. Manufacturer were mutually dhared by vtherelation in a controlled manner. There were several other salt springs in the Tangsa area called sum or sim for salt. These were untouched by the Ahoms. (Assam Burangi. P. 20).

উপরিউক্ত বিবরণ থেকে আমরা কিছুটা উদঘাটন করতে পারি যে তখনকার দিনে লবন বাজারে সহজ লব্ধ ছিল না এবং এইসব লবন রাজড়াজারা দ্বারাই বিলি হয়ে থাকে। এই লবন খনির জন্য অনেক সময় যুদ্ধ ও সংঘটিত হয়ে যেত। যেহেতু রূপিনীরা মায়ানী হালুং এ থকাকালীন ত্রিপুর রাজার সঙ্গে বিরোধপন্ন হয় আবার মাড়ক হাদুতে বসবাস পরেও রাজার সঙ্গে সংশ্রব ছিন্ন আরও বেশী হয়ে যায়। রাজার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা হওয়াই হচ্ছে লবনের অভাব জনিত দূর্ভোগে মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাককালে যারা রাজদ্রোহী তারা বিনা লবনে খাদ্য-হার গ্রহণ করার অভ্যস্ত করে নিতে হয়; এর প্রমান বিনা লবন এবং মশলা ব্যতিত পানহারের ব্যতিভ্যস্ত আদৌ ত্রিপুরায় কয়েকটি গোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে তৎকালীন বিচারে, রূপিনী গোষ্ঠীরাও রাজদ্রোহী হলেও বিনা লবনে পানহার চলত না, কারন পূর্ব্বেই অভ্যাসের দাস করে নিয়েছিল; তাই রাজার কাছ থেকে লবন সরবরাহের অন্তরায় হয়ে, শেষে ২৬৯ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন মাড়ক হাদুতে এসে এবং নিরূপায় হয়ে লবন কূপ খননের উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। বস্তুতঃ এই লবন কূপ খননের প্রেক্ষাপট হতে আরও সার নিক্ষেপ করে যে, প্রাককালে উক্ত রূপিনী গোষ্ঠিরা

নিতান্তই ত্রিপুর রাজার অধিনস্থ প্রজা ছিলেন, এবং তার দ্বারাই লবন প্রাপ্তের অনুকূলতা হত। তখনকার দিনে রাজরাজাড়া লবন বিলির মাধ্যমেই সাধারণ প্রজাদের বশীভূত করে রাখার আর একটি সাধারণ ফন্দি ছিল। আসলকথা হচ্ছে তৎকালীন সাধারণ প্রজারা প্রয়োজনবোধে ইচ্ছা হলেই লবন কূপ খননের উদ্যোগ নিতে পারত না। ফলতঃ রূপিনীরা গুপ্তভাবে রাজার অন্তরালে এবং রাজার পেয়াদাদের অনদিগমন দূর্গম বনভূমিতে এবং শুধু স্বগোষ্ঠীর প্রয়োজনে লবন কূপ খননের উদ্যোগ নিয়েছিল বলে একান্ত ধারনা। কিন্তু এই লবন খনির কতটুকু লবন উত্তোলনের ফলপ্রসূ হয়েছিল তার ইঙ্গিত পায়নি। 'সম বিয়াল' (অর্থাৎ লবনের অভাব) বলে যে লবন খনি নির্মান করা হয় এই স্থানটিকে সম খল হাদু বলে এখনো লোক চিহ্নিত রেখেছে। এটা ভৃগুদাসবাড়ী থেকে প্রায় ৯-১০কিলোমিটার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (সম্ < অর্থাৎ লবন, খল < অর্থাৎ ভাণ্ডার বা খনি বা গাঁথা সংযোজন হয়ে "সমখল")। আমার দাদুর পিতামহের সময়, উক্ত সমখল কূপের গভীরতা এত দীর্ঘ তল ছিল যে বনের সবচেয়েতে দীর্ঘতম ১০টি বাঁশ কেঁটে জুড়ে কূপের জলে গেড়ে দিলেও, নাকি উক্ত কূপের তলদেশে নাগাল পেত না। আবার উক্ত জুড়ানো বাঁশটি ছুড়ে দিলেও শুধু ক্লং করে শব্দ ধ্বনিই শুনা যায়, এটা শূন্য ভূগর্ভেরই একটি প্রকট হত। কিন্তু বাঁশের কোন চিহ্নই আর দেখা যেত না। কত গরু বন্য জন্তু ঐ কূপে ডোবে তলিয়ে গেছে কিন্তু এর পচা গন্ধ পর্যন্ত কেউ পেত না। এই কূপের পাশেই প্রাচিনতম বেলগাছ আজও বিদ্যমান। ঐ বেল গাছ স্বীয় পত্র অপেক্ষায় পর-গাছার পাতায় বেল গাছের পাতার রূপ লাভ করে এবং দূর থেকে উক্ত গাছকে কেউ বেল গাছ বলে চিনতে কষ্টসাধ্য। খুব সম্ভবত এই গাছের পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রকে জুড়েই রূপিনী জুলাইরা উক্ত স্থানে প্রথম আবাস হয়েছিল বলে অনুধাবন করা যেতে পারে।

লোকশ্রুতি থেকে জানা যায় জলের অভাবে নাকি ঐ 'সমখল হাদু' থেকে উৎখাত হয়ে একটি দল মাড়ক হাদুর (অধুনা বড়মুড়া) পূর্ব্ব পাদদেশে অবতরণ করেছিল বলে জানা যায়। অদ্রংশ আরও কিছুদিন উক্ত পর্বতোপরিতে থাকার পর মাড়ক হাদুর পশ্চিমাভিমুখে এবং সমতলীয় ক্ষেত্র থেকে অনুচ্চ পাহাড়ে বিরাট জনগোষ্ঠী সমেত স্থানান্তর করে নেয়। সেই নুতন আবাস স্থানের নাম হচ্ছে বলচুকচাক হালুং নামে তদানীন্তন খ্যাত ছিল। (প্রসঙ্গতঃ হালুং কথাটি রূপিনী জুলাই গোষ্ঠীরা প্রায়শই ব্যবহার করে থাকে কারণ তদানীন্তন পাহাড়ের পাদদেশ ক্ষেত্র বিস্তীর্ন প্রসারিত হলে তাকে হালুং বলে অভিহিত করে থাকে। আবার "আসাম বুরঞ্জিতে" উদ্ধৃত আছে পার্ব্বত্য উপত্যকার সমতলীয় ক্ষেত্রে সাধারনত আসামের রাজরাজাড়ার রাজপাট নির্মাণ করত। রাজার এই বাসভবনেই তৎকালীন আসামের আদিবাসীরা "হালুং" বলে অভিহিত করে থাকেন। যাইহোক রূপিনীরা কি অর্থে নিরূপন করে "বলচুকীচাক" হালুংয়ের নাম প্রদান করেছিল আজকাল তা নির্নয় করতে গেলে ব্যাপক অর্থে উপনীত হয়ে থাকে।)

এই বলচুকীচাক হালুং বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জুলাই রূপিনীরা সম্মিলিত ভাবে একশত বৎসরের অধিক কাল ধরে বসবাসের ইঙ্গিত জ্ঞাপন হয়। অতঃপর একদা সমগ্র বসতি জুড়ে ("জঙ্গলাপা" অর্থাৎ) গুটি বসন্তের প্রকৃপে মহামাড়ি ফেলেছিল বলে জানা যায়। ফলতঃ সমতল ভূমিতে তারা পাতিত হয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বের আবাস স্থান থেকে উৎখাত হয়ে যায়। রূপিনীরা তখন বিভিন্ন ছড়ার তদ্‌ভূমিতে অবতরণ করে ছোট ছোট বসতি গড়ে তুলে। বলাবাহুল্য তদবধি তারা সমতল ক্ষেত্রে কিছু কিছু চাষ আবাদের সূচনা করেছিল, এবং তার পাশাপাশি জুমচাষ হচ্ছে তাদের মুখ্য উপজীব্য। এইসব নুতন বসতির নাম হচ্ছে যেমন ঃ হাওড়া নদীর উৎপত্তিস্থান খাংথীনবাড়ী বা খানথীংকামি, বেলফাঙ কামি, আরও পশ্চিমে সাধুকামী বা চন্দ্রসাধুকামি, আরও পশ্চিমে বিশ্বমণি সদ্দার কামি বা ততবাক। এইসব গ্রাম বসতি হাওরা (সাইদ্রা) নদীর তটভূমিতে এসে নুতন বসতি গড়ে উঠে। অপভ্রংশ রাইমা ছড়ার অববাহিকার তটভূমিতে যারা নুতন বসতি গড়ে তুলেছিল তারা হচ্ছে যেমন আথুককথাং কামি, আরও পশ্চিমে গিয়ে "গাথালুং"কামি আরও কিছু পশ্চিমে বৃহত্তম বসতি হচ্ছে ভৃগুদাসকামি। আবার এই বসতিকে কামি কতর অর্থাৎ বড়বসতি বলেও তদানীন্তন খ্যাত ছিল। এই দুইটি নদীর তটভূমি থেকে উত্তরোত্তর অনেক উপবসতিতে বিভক্ত হয় এবং তা বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সূচনা হয়। বস্তুতঃ ক্রমাগত ভাবে সমতলীয় উপর কিছু কিছু চাষ আবাদের চর্চা শুরু হয় এবং তখনই তারা স্ব স্ব কুক্ষিগত সমতল ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য বক্ষনাব্যক্ষনের জন্য এইসব বসতি পরে স্থাপন করে নেয়। বড় বসতি থেকে একের পর এক ছিন্ন হয়ে উত্তরোত্তর যে কয়েকটি নিত্যনুতন উপবস্তি গঠন হয়, এইসব উপবসতির নাম হচ্ছে যেমন প্রথমে সাইদ্রা হালুং (হাওড়ার তটভূমি) থেকেই শুরু করি; চম্পা কামি, এবং বড়দোয়ারকামি এই দুইটি পাড়া মূলতঃ সাধুপাড়া থেকে ছিন্ন হয়ে অন্য আর একটি পাড়ার নামে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। রাইমা ছড়ার অববাহিকার তটভূমি বড় বসতি থেকে উৎখাত হয়ে যারা কিছু জনসমষ্টি নিয়ে নুতন নুতন বসতি গঠনের নাম হচ্ছে যেমন ঃ রক্তিয়াকামি, নবীনসিংপাড়া, ডাঁকতুকক্কুকামি, তুইছাছিতারামা পাড়া, ধমতী কামি, তৈয়কলই পাড়া প্রভৃতি। মূলতঃ এইসব গ্রাম ভৃগুদাসকামি এবং গাথালং থেকে ছিন্ন হয়ে গিয়ে উত্তরোত্তর উপবসতি গড়ে তুলা ছাড়া আর কিছু নয়।

এইসব স্থানে বসবাসকারী রূপিনীরা (জুলাই) সমতলের বনভূমিকে নিষ্কার্ষন করে নেয় এবং উক্ত স্থানে লাঙ্গল ধরে কিছু কিছু কৃষি চর্চায় ব্যতিভ্যস্ত হলেও মূলতঃ তারা কখনো জুমকৃষির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। বিংশ শতকের অর্ধভাগে রূপিনীদের মধ্যে অধিকাংশ সমতলীয় ক্ষেত্রের উপর ব্যাপক ভাবে কৃষি চর্চার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। সম্প্রতী রূপিনীদের মধ্যে হালচাষের উপর ভিত্তি করে কৃষিবৃত্তি দিন দিন আরও প্রসার লাভ করে থাকে। তবে জুম চাষ প্রনালীতে কৃষিকাজ যে একেবারে ছুড়ে ফেলে

দেয় তা নয় বসতির আশেপাশে অনুচ্চমুড়া টিলাতে ধান, পাট, তিল, তরিতরকারীর রোপন করে তাদের আদিম প্রনালীকে অক্ষুন্ন রেখে দেয়।

মড়ক হাদুর পশ্চিম পাদদেশের রূপিনীদের (জুলাইদের) আবাস স্থান লতিকা নিম্নে দেওয়া হল যেমন ঃ

সমখল হাদু
↓
বলচুকচাক হালুং এবং তার পাশ্ববর্তী হালুং
↓
- রাইমা হালুং
  - খানথীং
  - আথুকথাং
    - উপবসতি
      - রক্তিয়া
      - নবীনসিং
      - তৈয়কলই
      - উকতুকু
  - গাথালুং
  - ভৃগুদাস
    - তৈয়ছাসিতরা
- সাইদ্রা হালুং
  - বেলফাঙ
  - সাধুকামি
  - বিশ্বমণিসর্দ্দারকামি
    - উপবসতি
      - চাম্পা
      - বড়দোয়ার
      - ছিকামতৈয়ছা
      - নারেং

অন্যদিকে জুলাই রূপিনীদের একটি অংশ "মাড়ক হাদুর" (বর্ত্তমান বড়মুড়া) পাদদেশে বসবাস শুরু করেন। তখন এই স্থানটির নাম ছিল "মড়হালুং" অর্থাৎ মাড়ক হাদুর সমতলীয় ক্ষেত্র। আবার একটি ছড়া ঐ মড়াহালুঙ্গের বিস্তীর্ন সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে সুজা পূর্ব্বাভিমুখে। ঐ ছড়াটির নামও মাড়ক হাদুর নাম জুড়েই নামকরণ হয়ে থাকে "মড়তৈয়ছা" বা মড়ছড়া। খুব সম্ভবতঃ ঐ ছড়াটি মাড়ক হাদু থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলেই মড়তৈয়ছা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য প্রাককালে ঐ সমতলীয় স্থানবর্ত্তী দিয়েই রূপিনী গোষ্ঠীরা মাড়কহাদুতে গিয়ে আরোহন করে বলে জানা যায়। তৎকালীন ঐ সব সমতলীয় ক্ষেত্রটি জলাভূমি এবং নলখাগড়ার বন ছিল, তাই সেখানে বসতি গড়ে তুলার মত অনুকূলতা ছিল না। মাড়ক হাদু বা মড়ক হাদু থেকে উত্তরোত্তর অবতরণ করে একটি রূপিনী (জুলাই) গোষ্ঠীর অংশ পূর্ব্ব পাদদেশে বিরাট জনবহুল নিয়ে বসতি গড়ে উঠে। প্রথমতঃ অনুচ্চ মুড়ার উপর ঐ বসতিটি গড়ে উঠেছিল, জলের অনুকূলতার জন্য। ঐ বসতিটি নাম রাখা হয়েছিল "তৈয়চাংমা" উত্তরোত্তর ইহার

বিকৃতি এবং দ্রুত উচ্চারণে শব্দটি রূপান্তর হয় "তৈয়চাকমা" । (তৈয়ে = অর্থাৎ জল; চাংমা = অর্থাৎ শীতলতা) । যখন রূপিনীরা বড়মুড়াস্থিত (মাড়ক হাদু) সর্বচ্চ শৃঙ্গ সমখল হাদু নামক স্থানে বসবাস করত এবং উক্ত স্থানে ভীষণ জল অভাবে পড়েছিল । পাহাড় থেকে চুয়ে চুয়ে পড়া যৎসামান্য জল দিয়ে চালিয়ে যেতে হত । স্নান-পানের দৈনন্দিন অপরিহার্য্য কাজটুকু । পর্ব্বোতপরিতে এতদিনে জলাভাব থাকার পর বিস্তীর্ন জলাভূমি সমতলভূমিতে পতিত হয়ে তারা ভীষন শীতলতাঅনুভব করেন । তাই রূপিনীদের প্রথম বসতিটি তৈয় চাকমা বলে নামকরণ হয়ে থাকে । তখনো তারা জুম কৃষির উপর উপজীব্য ছিল । তাই তারা জনবহুল নিয়ে উক্তস্থানে জুড়ে সুবিশাল বসতি গড়ে উঠেছিল । যখনি আদিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু অংশ হালচাষের চর্চা শুরু হয়, তখন, যে যার সম্ভব আবাদ উপযোগী ক্ষেত্র দখল করার উদ্দেশ্যে বিক্ষিপ্তভাবে সরে পড়ে এবং দখলকৃত ভূমির পার্শ্ববর্তী স্থানে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে । ইহাই উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে উপবসতিতে পরিনত হয়ে উঠে । এইসব উপবসতি হচ্ছে যেমন ধনচাকমাকামি, তারাচান্দকামি, মান্দালংকামী, কালীকুমার পাড়া, বড়দোয়াড় পাড়া ইত্যাদি । এইসব উপবসতির মূল আদিবসতি হল তৈয়চাকমা পারা ।

আবার রূপিনীদের অপর একটি জনগোষ্ঠী মায়ানী হালুং থেকে পলায়নের সময় দল থেকে বিচ্যুত ঘটে । এই দলটি বিভ্রান্ত হয়ে অমরপুরের উত্তর অংশের কোন এক বনাঞ্চলে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা যায় । পরে ঐ স্থানের নাম রূপাহালুং প্রকান্তরে রূপালুংগা নামেও সবার কাছে পরিচয় হয়ে থাকে (অম্পি বাজারের অনতিদূরে অবস্থিত)। এই দলহারা রূপিনীদের এক অংশ জন বিরল বনভূমিতে বেশীদিন বিরতি নেয়নি খবর পেয়েই উক্ত দলটি পদচারণে ছুটে এসেছিল মাড়ক হাদুর উদ্দেশ্যে । মাড়ক হাদু কোন হদিশ না পেয়ে শেষে মাড়ক হাদুরই সংলগ্নে দক্ষিন অংশে অনুচ্চ পাহাড়ের উপর বসতি স্থাপন করে নেয় । তদানীন্তন ঐ স্থানে লাঙ্গাইদের আবাস ভূমি ছিল এবং তাদের সংমিশ্রনেই গড়ে উঠে এক বিরাট বসতি । রূপিনী ও লাঙ্গাইদের ঐ নুতন উপনিবেশকে'ছিতককামি' বলে অবগত ছিল । কিন্তু সেই স্থানটির নাম বির্বতন হয়ে কোন একটি নামে আজকাল আত্মপ্রকাশ করে । বর্ত্তমানে সেইসব স্থানে রূপিনীরা আর নেই; তাই নির্দিষ্ট রূপে, সেই স্থানটি চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য । খুব সম্ভবতঃ 'সরদুক ছড়াই' বোধ হয় ছিতকের আগের অবস্থান । বর্ত্তমানে সেই স্থানটিতে রাংখল গোষ্ঠীর অধ্যুষিত স্থান । তাই রাংখলদের ভাষায় ছিতক শব্দটি বিকৃত হয়ে সরদুক শব্দান্তর লাভ হয়েছে বলে ধারনা করা যেতে পারে ।

ঐ ছিতককামিতেই দলহৃত রূপিনী একটি অংশ অমরপুর থেকে পদচারণে এসে প্রথম উপনিবিষ্ট হয়েছিল বলে জান যায় । অতঃপর মাড়কহাদুর পূর্ব পাদদেশের সমতলীয় স্থানবর্তীতে পর পর কতিপয় উপবসতি গড়ে উঠেছিল । তারমধ্যে হাওয়াই বাড়ীতে জনসমষ্টি নিয়ে উপবসতি স্থাপিত হয় । তখন ঐ অঞ্চলে 'পাইতে রখুম, বেটু কুকিদের আবাস স্থান

হলেও তারা ত্রিপুর রাজের বশীভূত প্রজা ছিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় আর দুর্বৃত্তি কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায় না। প্রসঙ্গতঃ তথাকথিত এককালে ঐ স্থানবর্ত্তী অঞ্চল তিপরা জাতিরা বসবাস করত এবং পরে তারা ঐ স্থান থেকে উৎখাত হয়ে, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে নেয়। যখন কোন এক ত্রিপুরার রাজার কাছে উক্ত কুকিরা আত্মসমর্পন করলে রাজার আয়ত্তাধীনে রাখার জন্য এবং উজান থেকে তাদের নিয়ে এসে উক্ত স্থানবর্তী অঞ্চলে পূর্নবাসন গড়ে বসানো হয়েছিল বলে লোকশ্রুতি থেকে জানা যায়। 'হায়াই' শব্দটি কুকিদের ভাষা হলেও রূপিনীরা উক্ত স্থানে বসবাসের পরও স্থানের নাম অক্ষুন্ন রয়ে যায়। (হা < অর্থাৎ মাটি উঁই বা য়াই = তিপরা জাতি; সংযোজন হয়ে হায়াই বাড়ী)। তাহলে হায়াই বাড়ী রূঙবেল, তৈয়কয়কামি, চিন্দ্রাই কামি প্রভৃতি স্থানে এসে রূপিনীরা উপবসতি স্থাপন করে। তখনও কুকিরা ঐ স্থানে ছিল এবং সংমিশ্রনভাবে তারা বসবাস করে, একে অপরের শোক দুঃখের অংশীদার হয়ে উঠে। অতঃপর ঐ কয়েকটি উপবসতি থেকে আজকাল আরও উপবসতির প্রকট লাভ হয়। যেমন শনলংকামি বা মুংকুরুই সর্দ্দার পাড়া, রূপাছড়া, ছিকাম তৈয়চাকমা, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে সরে পড়ে। তারমধ্যে ছনলং পাড়া এবং তৈয়কয় পাড়াতেই রূপিনীদের সংখ্যায় অধিক। তৈয় কৈই পাড়াটি কলই, রাংখল, দেব্বর্মা পারিপার্শ্বিক ঘিরে রূপিনীদের বসতি গড়ে উঠেছে এবং রূপাছড়াতে, রূপিনীদের সংখ্যায় অন্য বসতি অপেক্ষায় অনেক কম। এইসব বসতির চেয়ে সবচেয়েতে সীমিত লোক সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠা হচ্ছে ছিকাম তৈয় চাকমা রূপিনী পাড়া। মাড়ক হাদু অর্থাৎ বড়মুড়ার পূর্ব্ব পাদদেশের ভূমিতে সংক্ষিপ্ত রূপিনীদের আবাস স্থান লতিকা নীচে দেওয়া হল। যেমন ঃ

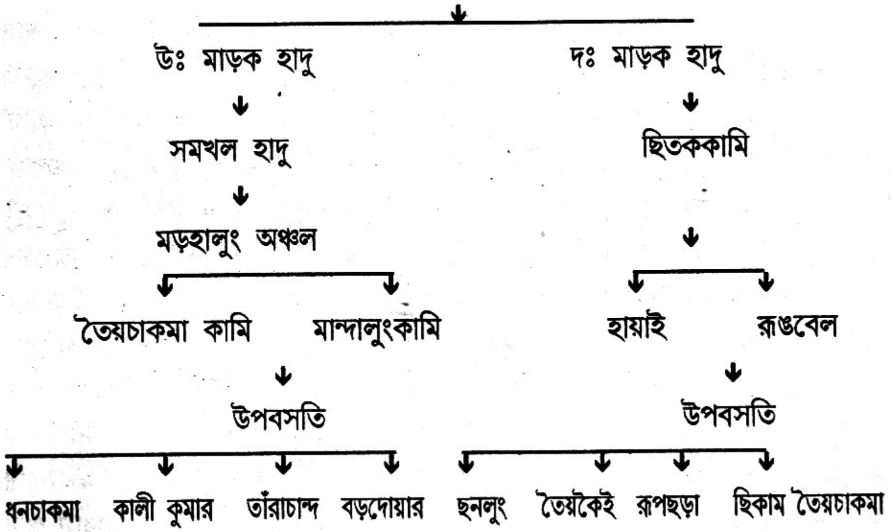

রূপিনী(জুলাই)গোষ্ঠীরা সব সময় জলের সুবিধার্থে নদী বা ছড়া এই সব উপত্যকা পার্শ্ববর্তী স্থানে আবাস গড়ে উঠতে লক্ষ্য করা যায়। তৈয় রূপিনী থেকে শুরু করে সুদূর পথে বিরতি, বিরতির মধ্য দিয়ে বড়মুড়ার উপত্যকা পর্যন্ত শুধু সম্‌খল হাদুকে বাদ দিয়ে প্রথমতঃ জলের অনুকূলতা যেখানে ছিল সেখানেই তাদের বসতি গড়ে উঠার প্রবনতা দেখা যায়। একদিকে জুমচাষের জন্য আসা যাওয়ার অনুকূল স্থান অন্যদিকে জলের সুবিধা; মূলতঃ এই দুইটি অসুবিধাকে লক্ষ রেখে প্রাককালে রূপিনীদের জীবন যাত্রা গড়ে উঠে। সমতল ভূমিকে কুক্ষিগত করার প্রবনতার উদ্যোগ অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে। যখনি আদিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু অংশে সমতল ভূমির উপর হাল চাষের চর্চা শুরু হয় তখন রূপিনীরাও ধীরে ধীরে সমতলে চাষ আবাদ শুরু করে।

রূপিনীদের আরও একটি অংশ যারা মায়ানী হালুং থেকে রাজধানী এড়িয়ে পালিয়ে আসার সময় মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং শেষে জুম চাষের অন্বেষণে উত্তরাভিমুখে ধাবন করে। পরে গয়না মালুং এসে ছোট একটি বসতি গড়ে উঠে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চলে আসা চাকমা, রিয়াং ত্রিপুরা, সাথে সেইস্থানে কতিপয় রূপিনী পরিবার সংমিশ্রণ ভাবে বসবাস করে।

উত্তরকালে কারণে কারণে সাধুপাড়া, বড়দোয়ার পাড়া, হায়াই বাড়ী থেকে উৎখাত হয়ে ঐ গয়নামা হালুংগে রূপিনীদের জন সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে শুরু হয়। তখন উক্ত বসতি থেকে সরে গিয়ে কিছু উপবসতি এবং সীমিত লোকগোষ্ঠীতে গড়ে উঠে। এইসব উপবসতি হচ্ছে যেমন ঃ - ময়নামা, ছৈলেংটা, সিন্ধুকুমার, ইত্যাদি। আজকাল মনুঘাট বাজারের সংলগ্নেও কিছু কিছু রূপিনীদের আবাস গড়ে উঠতে দেখা যায়। ত্রিপুরার রাজার রাজধানী থেকে অনেক দূরে উক্ত রূপিনী অংশ বসবাস করে বলে ত্রিপুর রাজের সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই ঐ অঞ্চলের বসবাসকারী রূপিনীরা জুলাই কথাটি অস্বীকার করে থাকে। তাদের অস্বীকারে ত্রিপুরার মহারানীর ভূষিত উপাধি একেবারে ব্যর্থ যায়নি; রাজার অসন ভোজনে হাজির হওয়ার সময় তারাও জুলাইদের দলে আসন লাভ হত এবং যা কিছু রানীকেই পন হিসাবে প্রদান করতে হত। মনু নদীর সংলগ্নে বসবাসকারী রূপিনীদের স্থান লতিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

গয়নামাকামি

↓

উপবসতি

↓ ময়নামা | ↓ ছৈয়লেংটা | ↓ সিন্ধুকুমার

উপরিউক্ত মাড়ক হাদুর পশ্চিম-পাদদেশে এবং পূর্ব্ব পাদদেশে স্থানবর্তী অঞ্চল জুড়ে অবস্থানকারী রূপিনীদের বিরাট অংশ জুলাই প্রজা বলে রাজার দ্বারা ঘোষিত ছিল, এবং বৎসরান্তে ত্রিপুরার মহারানীকে কানসুমারী 'পন' হিসাবে প্রদান করতে হত। তার পাশাপাশি মনু তটভূমিতে বসবাসকারী রূপিনীদের একটি অংশ জুলাই বলে আত্মপ্রকাশের অনীহা প্রকাশ পেলেও প্রকারান্তে ঐ গোষ্ঠী জুলাই প্রজা ছিল। উত্তরকালে সাকা রূপিনীদের (উজান রূপিনী) কাছে ঐ জুলাই জাতিই খামা রূপিনী বলে অর্থাৎ পশ্চিমা রূপিনী বলে চিহ্নিত করণ হয়ে থাকে। ভূপতি ত্রিপুর রাজের আঙিনায় উক্ত খামা রূপিনীদের কি দূরদশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা সাকা রূপিনীদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে যায়। তাই তাদের লোক ইতিহাসে জুলাই উপাধি ভূষনের নেপথ্য কাহিনীটি প্রচলিত নেয়। তাছাড়া সাকা রূপিনীরা অচিরেই ত্রিপুর জাতি বলে পরিচয় দিলে ত্রিপুরার মহারাজার কাছে তিপরা জাতি বলে আখ্যা লাভ হয়েছিল বটে, কিন্তু রাজসদন থেকে সুদূরপ্রান্তে বসবাসের ফলে উত্তরকালে তাঁর অনুরুক্ত প্রজাদের নব্য উপাধি (দেব্বর্মা) থেকে, অগত্যা সাকারূপিনীরা বাদ পরে যায়। শেষে উত্তরকালে ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশকারী নবাগত গোষ্ঠীভুক্ত মনে করে - ত্রিপুরার শেষ রাজা বীরবিক্রম কিশোরের আদেশক্রমে সাকা রূপিনীদের নোয়াতিয়া কিংবা ত্রিপুরা সম্প্রদায় দলে সন্নিবিষ্ট করে যান। তখন থেকে গোটা সাকা রূপিনীরা নামের সঙ্গে উপাধি হিসাবে "ত্রিপুরা" লেখার সূচনা হয়। এই গোষ্ঠীসমূহ নামের সঙ্গে "ত্রিপুরা" লেখা এবং আত্মপরিচয়ে দিলেও নোয়াতিয়াদের আচার আচরণ, রীতি নীতি এবং তাদের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে একটা খাপখেয়ে উঠতে পারত না। ফলতঃ মণিপুরীদের আচার আচরণ রীতি নীতিকে একাত্ম করে নেয় এবং আজবধি এই অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হয়নি। এই বিপন্ন গোষ্ঠীরা না হতে পারে মনিপুরী, না ত্রিপুরা, না হতে পারে রূপিনী। যতই তারা অলক্ষ্যে রূপিনী বলে আত্মপরিচয় দিলেও বাস্তবিক তারা 'ত্রিপুর জাতি'। তার সাক্ষ্য প্রমান হচ্ছে ভারতের আধমসুমারীতে নোয়াতিয়া সংখ্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তার পাশাপাশি রূপিনীর অংশের জনসংখ্যা উক্ত আধম সুমারীতে বাদ পড়ে যায়।

অন্যদিকে খামা রূপিনীরা এখনো তাদের রূপিনী গোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ স্বীকার করতে প্রস্তুত, এবং তারা জাতিভ্রষ্ট সাকা রূপিনী (উজান রূপিনী) স্ব জাতি থেকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সদা মর্মাহত; তা প্রমান পেয়ে থাকে এপার ওপার রূপিনীদের বিরহ বিচ্ছেদএক করুন বেদনার ধ্বনি ফুটে উঠে রূপিনীদের লোকসংগীতের সুমধুর ঝংকারে। যদিও তারা রূপিনী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন হয়ে উত্তরোত্তর স্বজাতির ধ্যান ধারনা রীতি নীতি থেকে বিমুখ করে নিলেও লোকইতিহাসের জনপ্রবাদের পৃষ্ঠাই তাদের অস্তিত্বের স্মৃতি গাঁথা রয়ে যায় বটে; কিন্তু ভাবি কালক্রমে উত্তরোত্তর লোপ স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে কালের গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেক জাতি এইভাবেই হারিয়ে যায়। তার খবর আদৌ কে রাখে। এখনো সময় আছে সাকা রূপিনীরা অবিলম্বে নিজেদের মধ্যে সংস্কার

করে পূর্ব্বের ভ্রান্তকে ত্বরায় নিষ্পত্তির অত্যন্ত প্রয়োজন বলে একান্ত ধারনা। কালান্তরে এই বিভ্রান্ত গোষ্ঠীরা আরও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং এ বিষয় নিয়ে তাদের শিক্ষিত মহলের পক্ষ থেকে পূর্ব্বেই সতর্ক থাকা উচিত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে খামা রূপিনীরা ছিলেন খুবই সংরক্ষণশীল। তাদের আদি অবস্থান তৈয় রূপিনী থেকে শুরু করে জুলাই জাতি আখ্যালাভের পরেও সেই প্রাচীনতম শৈব্য ধর্মের শাখা তান্ত্রিক ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রাখে। আচার আচরণ, রীতি-নীতিকে মোটেও হানি হতে দেয়নি; বরং অন্যের জাতি থেকে রপ্ত করে নিজস্ব জিনিষকে আরোও সমৃদ্ধ করে তুলেন। তার বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে রূপিনীদের ভাষা, লোক সঙ্গীত, হাতের শিল্প, রূপকথা ইত্যাদি অদ্বিতীয়। পূর্ব্বে তাদের পারিপার্শ্বিকে যারা ছিলেন তারা হল যেমন - পুরন কুকি, লাঙগাই জাতি, হারবাং, তৈয়া, উায়া, রিয়াং ইত্যাদি। খুব সম্ভবতঃ রূপিনীদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক শাসন ব্যবস্থার প্রাককালে ঐ গোষ্ঠীসমূহ থেকে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল বলে অবতারনা করা যেতে পারে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আদি থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র রূপিনী গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত উপনিবেশ স্থান লতিকা নিম্নে দেওয়া হল। যেমন ঃ

তৈয়রূপিনী নদীর উপত্যকা
(বরাক নদীর দক্ষিণ অংশ)
↓
চাথেঙ্গ নদীর উপত্যকা
(প্রাক ত্রিপুরা অংশ কাছাড়)
↓ ↓ ↓

হাইচেক পর্বত
(অখণ্ড ত্রিপুরা)
↓
ধর্ম নগর
(ত্রিপুরা)
↓
৮২ মাইল মনুনদীর তটভূমি
(ধলাই)

কমজাং
(মণিপুর)

ছাইরাঙচাক
(লুসাই পাহাড়)
↓
মায়ানী হালুং
(পাঃ চট্টগ্রাম)
↓
অমরপুরের কোন এক স্থান
↓
মাড়ক হাদু বা বড়মুড়া
↓ ↓
পূঃ সমতলভূমি
(মাড়ক হাদু)

পঃসমতলভূমি
(মাড়ক হাদু)

উপরিউক্ত অঞ্চল সমূহের মধ্যে কয়েকটি স্থানকে বাদ দিলে প্রায় সমগ্র স্থানেই আজও রূপিনী সম্প্রদায়দের দেখা যায়। শুধু এতটুকুই তারতম্য যে একটি রূপিনীর অংশ কাছাড়স্থিত আসাম রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত বলে আসাম সরকারের আয়ত্বে এবং তাদের অপভ্রংশ ত্রিপুরার ভূখণ্ডে বসবাস করে বলে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শাসন আয়ত্বে বসবাস করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে সূদূর প্রসারিতভাবে খণ্ডে খণ্ডে হয়ে যাওয়াতে একেবারে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে পরে। এইভাবে বহুদিন বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ফলে এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবার দেখা যায় অশুভ সীমার রেখা উদ্ভব। তা হল এপার রূপিনী ওপার রূপিনী। তার পাশাপাশি রূপিনীর একটি অংশ হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে উন্নাসিকা পূর্ণ উপাধি নিয়ে রূপিনীদের কুকি জাতি পর্যায়ে ফেলে যান; আবার আর একটি রূপিনীর অংশ নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীন সঁপিয়ে দিয়ে ত্রিপুরার রাজারা একটি গোষ্ঠীতে দুইটি দফা বা জাতি সৃষ্টি করে যান। ফলতঃ তাদের বিচ্ছিন্তার প্রবনতা উত্তরকালে আরও প্রবল হয়ে উঠে তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতঃ ত্রিপুরার মহারাজরা উপাধি, গোত্র, বর্ণ, আখ্যা দেবার আগে, কোন সুস্থ্য চেতনায় বা বিশেষ জেনে শুনে বন্টন করেনি, তাহাই জ্বলন্ত প্রমান। অন্যথায় একটি গোত্রে দুইটি গোষ্ঠীর উদ্ভব কি করে সম্ভব ?

এইভাবে মহারাজ সদনে যারা সদা রাজার সহমর্মিতায় বসবাস করছে তাদের রাজার স্বজাত গোষ্ঠীর প্রকান্তরে দেববর্মা উপাধি বিলিয়ে এক অংশকে উন্নাসিকা তুলে দিয়েছিল বটে আবার তাদেরই অপভ্রংশ নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রূপিনী,কলই, রাজার সহজাত্য হওয়ার দাবী থেকে একেবারে তাচ্ছিল্য করে দেন। অথচ প্রাককালে ত্রিপুর রাজার কাছে এইসব গোষ্ঠীরা আদিকালে ত্রিপুরজাতিভুক্ত বলে রাজার কাছে স্বীকৃত ছিল। আবার বিশাল কুকি জাতির মধ্যে কয়েকটি নরম পন্থী কুকিদের উন্নাসিক পূর্ণ রাজার উপাধি ভূষণ 'হালাম' শব্দটির দ্বারা ১২টি দফায় কুকিদের লাগাম ঝুলিয়ে রাখেন।

রূপিনীদের প্রাককালে যে রীতি-নীতি, আচার-আচরণঅনুসরণ করে এসেছে তা উত্তরোত্তর সংস্কার সাধিত হয়ে বর্তমানকালে এসে অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন লাভ করে থাকে। এটা যুগেরই একটি ধর্ম। কিন্তু যারা এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করার জন্য আধুনিকতার উষ্ণ বাতাস যাদের অঙ্গে স্পর্শ করেনি তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত পুরানো সংস্কারকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। ফলতঃ এইসব আদিবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, চালচলন এবং গতিবিধি অনেকাংশে অপরিবর্ত্তিত রয়ে যায়। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের গতিবিধির উপর পর্যবেক্ষণ করেই রূপিনীদের প্রাক জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনুধাবনের পথ প্রশস্ত হয়। তার পাশাপাশি লোকশ্রুতি বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা থেকেও প্রাককালের তথ্য সম্বলিত ঘটনা আরোও উদ্ধার করা হয়। তাছাড়া আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এবং শ্রুত ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কিছু স্মৃতিগর্ভে সংরক্ষণ করেছি সবটাই বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়নি এবং বা কলমের আঁচড়ে, আঁচড়ে এই শ্রুত সংরক্ষণ হঠাৎ হঠাৎ

উঁকি দিয়ে তথ্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে থাকে। লোকশ্রুতি থেকে, বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের কথা, ব্যক্তিগত অবতারনায় যতটুকু আমার ক্ষীণবোধে ধরে এবং স্থূল ধারনাকে যতদূর সম্ভব প্রাক এবং বর্ত্তমান রূপিনীদের দৈনন্দিন জীবন ধারা, এখানে ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি।

পঞ্চম অধ্যায়

রূপিনীদের মূল বৃত্তি

আদি মানব জাতির মধ্যে কিরাত জাতির একটি শাখা যখন প্রাকৃতিক গুহা অভ্যন্তরীন বসবাসের ব্যতিভ্যস্ত ছিল এবং যখন তারা ঘর বানিয়ে বাস করার চেতনাটুকু উন্মেষ হয়নি; তখন পশুর ন্যায় ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। একমাত্র উদর পূর্তির জন্যই সারাদিন ঐ বর্বর জাতিদের তৎপর থাকতে হত। শুধু রাত্রিতে থাকার জন্য চাই নিরাপত্তা-পুর্ন আবাস। তাই রাত্রিতে স্ব স্ব আস্তনা গুহাতে ফিরে যেত। এই বর্বরোচিত সময়ে তারা কৃষি কাজ করার সময়ও পেত না এবং তার প্রনালী সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। এই সম্পর্কে জি, পি, সিং এর পুথিঁতে উল্লেখিত একটি তথ্য এখানে প্রণিধান যোগ্য। যেমন ঃ The oldest branch of Kiratas tribes and latter disgnated as Negritors and Tibeto Burman tribes are believed to have been both in the in the Polacolithie and in the Neolithic stage of culture. They were not equipped with the knowledge of agriculture and cattle breeding . They were food gathetrs rathers them food produces. (Kiratas in Ancient India. P. No. 175)

উপরি উক্ত তথ্য থেকে, সার নিষ্পন্ন হয় যে ঘরে, ঘরে, বসে স্বীয় উৎপাদনের ফসল ভোগ করার বুদ্ধি উন্মেষ হয়নি। কিন্তু তখনো পাপী পেটের জন্য আহার করতে হয়। তাই অনির্দিষ্ট এবং বিক্ষিপ্ত বনভূমি থেকে তাদের খাওয়ার যোগ্য উপাদান কুড়িয়ে

সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের বিশেষ কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। এই আদিম মানবরা বিশেষ করে বৃহৎ বনভূমি থেকে কুড়িয়ে নিজের জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য্য আহার সংগ্রহ করা তা বিশেষ সময় সাপেক্ষ তো বটেই, এবং কষ্টসাধ্যও ছিল। এইসব ফল, মূল ভক্ষনযোগ্য উদ্ভিদ উত্তরোত্তর অপ্রাচুর্য্য হয়েও যেতে পারে। এইভাবে তাদের বুদ্ধি ধীরে ধীরে উন্মেষ হয় যে, যা কিছু তাদের প্রিয় খাদ্যের দ্রব্যাদি বসতির সংলগ্নে রোপন করে এবং এই গাছ থেকে প্রয়োজনে ফল, মূল সংগ্রহের পথকে সহজতর করে দেয়। এইভাবে বৃহৎ আকারে এবং সযত্নে উত্তরোত্তর রোপনের কাজে উদ্যোগ নেওয়াই পরে জুমকৃষি(হোক) কাজ বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। এই জুমচাষের অনুকূলতা থাকার জন্যই সম্ভবতঃ কিরাত জাতির উত্তর পুরুষ বিক্ষিপ্ত সরে ছিটে নানান প্রকারের গোষ্ঠী প্রকটিত হয়ে প্রাককাল হতে চলে এসে আজও দেখা যায় পার্ব্বত্য অঞ্চলে বসবাস করতে।

যেহেতু রূপিনীরা প্রাচীন জাতি কিরাতদের বংশে উদ্ভব বলে জুমচাষ একটি তাদের অন্যতম বৃত্তি। নিজের কায়িক পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে যা কিছু জুম কৃষির মধ্যে উৎপাদন হত তাই পরিবারের এক বৎসরের রসদ হয়ে যেত। জুম চাষের খাদ্যদ্রব্যাদি রসদই উৎপাদন হয় তা নয়; এই কৃষি কার্য্যের দ্বারা তদানীন্তন লোকের তথা পরিবারের নানান নিত্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতের কাঁচা মাল প্রচুর পরিমানে যোগান হয়ে থাকে। তাই জুম কৃষি কাজ সম্পন্ন করেই পরিবারের বহুমুখী অভাব প্রশমিত করে নিতে পারলেও তা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিকের উপর নির্ভরশীল হতে হয় এরজন্য চায় সময়, কাল বৎসরের প্রাকৃতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখেই জুম চাষ আরম্ভ করতে হত।

জুম চাষের পদ্ধতি ঃ (হুক তাংখুং কাইমুং)

প্রথমে পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক গৃহকর্তা ঘুরে ঘুরে জুমের স্থান নির্বাচন করে নেয়। অতঃপর এই নির্বাচিত জুম ক্ষেত্রের জন্য পরিবারের সকলের অভিমত নিতে হয়। এই ক্ষেত্রের উপর লোকের কোন অশুভ অভিযোগ না থাকলে এবং পরিবারের সকলের মত নিয়ে উক্ত ক্ষেত্রটি দখলাধীন স্বরূপ একটি চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া হত। তাকে রূপিনীদের ভাষায় (উখাল খালমা) বলা হত। এই চিহ্ন গেড়ে দিলেই সবাই জেনে গেল ঐ স্থানে বা ক্ষেত্র কোন ব্যক্তির দ্বারা কুক্ষিগত হয়ে গেছে এবং এই চিহ্ন যে অবজ্ঞা করবে সামাজিকভাবে তার শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

অতঃপর পরিবারের সবচেয়ে বয়ঃজেষ্ঠ্য ঐ দখলকৃত নুতন জুমক্ষেত্রের স্বল্প মাটি একটি কাঁচা বাঁশের চুঙ্গাতে ভরে নিয়ে এবং ঘরে এসে তার শয়নের বালিশের নীচে চেপে রাত্রিতে ঘুমাতে হত। উক্ত জুম চাষেব ফলপ্রসূ ইঙ্গিত যদি স্বপ্নতে দৃষ্ট হলে ত্বরায় নুতন জুমে নিরানুর শুরু করে দিতে হ'ত; আর যদি অশুভ ইঙ্গিত স্বপ্নতে দৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে ত্বরায় অন্য জুমক্ষেত্র অন্বেষণের জন্য উদ্যোগ নিতে হয়। প্রসঙ্গতঃ তদানীন্তন বিশেষ কুসংস্কার ছিল যে জুমের হাওয়ার দূষে জুমিয়া পরিবারের যে কোন ব্যক্তির মধ্যে রোগগ্রস্থ বা অনেককিছু ক্ষতিসাধন হতে পারে। অনেক সময় পরিবারে যে কোন ব্যক্তি উক্ত কারনে মৃত্যু ঘটে থাকে। তথাকথিত ভাষায় জুমচাষের পরিপ্রেক্ষিতে নানারকম ক্ষতি স্বীকার করাকে রূপিনীদের ভাষায় হুকনঙ্গ বলে। অর্থাৎ জুমের হাওয়াই রোগ স্বীকার বলে নির্নয় করা হত। ফলে রূপিনী সম্প্রদায়রা অনেক ভেবেশুনে নুতন জমুক্ষেত্রতে পা বাড়াতে হয়। তারপর চৈত্র মাসের প্রথম ভাগেই জুম নিরানুর কাজ শুরু হয়ে যায় তাকে রূপিনীদের ভাষায় "হুকচাং" বলে। বিশেষ করে জুম ক্ষেতে বাঁশ বন হলেই সবচেয়েতে কৃষি ফলন বেশী হয়ে থাকে এবং কাঁটা নিরানু কাজও খুবসহজতর করে তুলে। সাধারণভাবে এইসব ক্ষেত্রেই জুমচাষের চর্চা হয়ে থাকে এবং বড় বড় গাছ বেতের বনে জুম ক্ষেত্র হিসাবে বাদ পড়ে যায়। জুমের সমস্ত বাঁশ ও ছোট ছোট গাছ কেঁটে পরিষ্কার করে এবং তাকে পুরানোর জন্য ছোট ছোট স্থুপ বানিয়ে শুকিয়ে রাখা হয়। তারপর ১৫ থেকে ২০দিন ঐ কাঁটা ঝোঁপ ঝাঁপ শুকিয়ে যাওয়ার পর আগুনে পুরিয়ে ছাই করে ফেলা হত এবং এই ছাই জুমক্ষেত্রের সার এর বিকল্প রূপে ফসলের উৎপাদনকে আরও সহায়তা এনে থাকে।

এইভাবে জুমক্ষেত্রটি পুরে দগ্ধ হয়ে গেলে দুই থেকে তিনদিনের পরে উক্ত ক্ষেত্রে আবার সপরিবারে যেটা অগ্নি দগ্ধ হতে পারিনি এবং বাদ পরে গেছে এইসব আবার কেটে অন্যদিকে ছুড়ে ফেলা হত। আগুনে দগ্ধ বাকী জুম ক্ষেত্র পুনরায় কাঁটা-নিরাকে "হুকখুলমুন" বলা হত। এইসব কাঁটা-নিরা শেষ করার পর যখন জুম ক্ষেত্রে বীজ রোপন-রোপনের অনুকূলতা এসে যাবে তখন শুধু প্রাকৃতিক বর্ষনের প্রতিক্ষায় বসে থাকতে হয়। এইভাবে জুম আবাদ ক্ষেত্রের উপযোগী হতে হতেই বৈশাখ মাস এসে পরলে এবং কিছু না কিছু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকেই। যখনিই বৃষ্টি পড়বে তখন তারা সপরিবারে জুমক্ষেত্রে বীজ বপনের জন্য উঠে পড়ে লেগে যায় এবং শীতল মৃত্তিকাতে সম্ভাবনাবীজ আরও উৎকর্ষ লাভ হতে পারে। অনেক সময় বৃষ্টি না হলেও বীজ বপনরে কাজ চালিয়ে যেতে হয় কেননা বৃষ্টির প্রতিক্ষায়, যদি বীজ বপনের কাজ বিলম্বিত হয়, তাহলে ফসল ফলনের পক্ষে তা বিষম হানি ঘটতে পারে।

যখন জুমের ফসল ক্রমে বৃদ্ধি হয়ে মৃদু বাতাসে খেলতে থাকে তখন সময় হয়ে উঠে জুম নিরানুর কাজ; তাকে "হুক তাগুমা" বলে রূপিনীদের ভাষায় অভিহিত করা হয়।

পরপর দুইবারে জুম ফসলের মৃত্তিকায় নিবিড়ে ছারিয়ে দেওয়া হয়; এতে ফসলের উর্ব্বরতা এবং বৃদ্ধির পক্ষে খুবই সহায়ক হয়ে থাকে। পাশাপাশি ধান বা অন্য ফসলের নিচের মাঁটি উল্টে যাওয়াই অপ্রয়োজনীয় গাছ গাছড়া জন্মানো প্রতিরোধ হয় এবং ধান বা অন্যান্য ফসলাদি ফলন বৃদ্ধি হয়। রূপিনীদের ভাষায় প্রথম জুম ফসল নিরানুকে "মাইইয়াসীকাওতাওমা" এবং দ্বিতীয়বার ফসল নিষ্কাষন থেকেই ধান ব্যতিত অন্য শাকসব্জী কিছু কিছু আদান হয়ে থাকে। এই ফসলের ফলপ্রসূ হচ্ছে চিংড়া(থাইসুমু)শসা জাতীয় ফল (দেরামপাই) আরও অনেক কিছু। প্রসঙ্গতঃ প্রথম ফসল নিষ্কাষন থেকে দ্বিতীয়বারে নিষ্কাষণ পর্যন্ত রূপিনীদের স্ব স্ব পরিবারের যুবক-যুবকতীদের সমবয়সী দিন বদলীর পদ্ধতিতে কার্য্য সম্পাদনের দল গঠন করে এবং ঐ দলের দ্বারা একে অপরের কাজের প্রয়োজন উদ্ভব হলে ত্বরায় উক্ত দল নিয়ে সম্পন্ন করে থাকে। এই সমবায় পদ্ধতিতে যথাসময়ে নিজ কাজ থেকে তাড়াতাড়ি সমাধান করতে পারে এবং অপরের কাজের তাগিদেও যথা সময়ে সম্পন্ন হয়ে উঠে। প্রত্যেক পরিবারের সদস্যের মধ্যে কমপক্ষে ১ থেকে ২জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরাই এইসব দিন বদলী বা সমবায় পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করতে হয় এবং পরিবারের যে কোন কাজে সহজতর এবং ত্বরান্বিতে কাজ হয়ে উঠে।

যখন সোনালী রঙ বরণ করে সমগ্র ফসল শরতের প্রারম্ভে মৃদু বাতাসে দুলতে থাকে এবং তখন জুমের ধান পক্ক হয়ে উঠেছে বলে রূপিনী পল্লীতে আনন্দে আর ধরে না। তখন বন্য জীব জন্তুদের ফসল নষ্ট এবং ভক্ষনের প্রতিরোধের জন্য পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি জুমক্ষেত্রস্থিত টংঘরে নির্মাণ করে দিয়ে রাত্রিতে টহলের জন্য আশ্রয় নিতে হয়; কেননা রাত্রিতে বন্য জন্তুর ফসল নষ্ট এবং ভক্ষনের তৎপরতা প্রবল হয়ে উঠত। তাই রাত্রিতে নানান ডোল এবং বাঁশ প্রহার শব্দতে এইসব বন্য জন্তুদের তাড়িয়ে দিতে হয় অন্যথায় জুমের ফসল টিকিয়ে রাখা কষ্টকর হয়। যে দিন যথাক্রমে এক পাক ঘুরে এসে দিন বদলীর দল যথা যত নিজের কাজের পালাই পড়বে, সেই দিন ত্বরান্বিত ভাবে এক দিবসেই সমগ্র জুমের পাকা ধান কেটে উক্ত টংঘরে অস্থায়ী মজুত রাখা হয়। ধান কাটার সময় ধানের গাছটা বাদ দিয়ে অর্থাৎ খড়টা বাদ দিয়ে শুধু ধানের ছড়িটা কেটে তুলে নিত; তাতে অল্প জায়গাতেই প্রচুর ধান মজুত রাখা যায়। তারপর ঐ মজুতকৃত ঘর থেকে পরে ফসল বসতিতে এনে মাড়ায়ের জন্য উত্থান বা কোন একটি ঘরে মজুত রাখা হয়। তারপর এটাকে মাড়ায় করার পর, ধান বৎসরের রসদ হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। শুধু ধান নয় জুম ক্ষেত্র থেকে আমদামিকৃত ফল ও সব্জী বৎসরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়ে থাকে। এই ফসল ও পক্ক সব্জী মধ্যে যেমন ঃ তিল, কার্পাস, মক্কা, অরল, কুমড়া, চালকুমড়া, নানান তৈল বীজ এবং মশলা জাতীয় দ্রব্যাদি। ৫ থেকে ৬মাস সংরক্ষিত রাখতে পারে এইসব ফল মূল হচ্ছে যেমন ঃ শসা, চিংড়া, আদা, ওলকচু আরও অনেক কিছু।

জুমের ধান কেটে তুললেই জুমের কৃষির ফসল শেষ হয়ে যায় তা নয়। ধান কাটার পর তিল কাটা শুরু হয়ে যায়। তিল কাটা শেষ হলে আবার কার্পাস তুলা সংগ্রহের সময় এসে পরে। ততক্ষণে রূপিনীরা নবান্ন উৎসব হয়ে যায়। সাধারনতঃ এই উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কোন নির্দিষ্ট দিন তিথি মাসে করতে হবে, এই রকম কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। নুতন ধান পাওয়ার পরেও আহারের আগে "রংতক" পূজা করা হয়ে থাকে এবং এই দিনই নবান্ন উৎসব (মাইকতালচামা) সীমিতভাবে ছোট ভোজনের আয়োজন হত। গরিয়া পূজা, কের পূজার ন্যায় ঐ নবান্ন ভোজন এত ব্যাপকতা লাভ হত না, কেননা পল্লীর মধ্যে সকলেই সাধ্য অনুসারে কিছু কিছু তা পালন করতে বাধ্য তাই। তবে সমর্থ ব্যক্তিরা অনেক সময় শূকর, পাঠা বলি দিয়ে এইসব নবান্ন উৎসবের সমারোহে ভোজন আয়োজন করে থাকে। যারা অসমর্থ তারাও কিছু না কিছু নবান্ন উৎসব করলেও ক্ষুদ্র আয়োজনে এবং পারিপার্শ্বিকদের মধ্যে সীমিত রেখেই ভোজন শেষ করে দিতে হয়। যাই বলুক না কেন রংতক পূজা ছাড়া কোন ব্যক্তিই ভোজনে অন্নহার করা নিষিদ্ধ ছিল এবং এই রংতীকদ্বয় পূজা সম্পন্ন হলে জুম চাষের সরঞ্জাম এবং লোহা দ্রব্যাদিকে নুতন অন্নের মুয়া বানিয়ে অর্পন করতে হয়। ঐ অন্ন নিবেদনের মধ্যে কাঁচিই শুধু বাদ পড়বে; এর সঠিক কারন জানিনা তবে তদানীন্তন কিছু না কিছু কারন থাকতে পারে। এইসব কারন লোকশ্রুতি থেকে জানা যায় কাঁচি নাকি বাকী সরঞ্জাম তাককাল, নিরানি, কোদাল, কুড়াল, কাঁচির ন্যায় দাঁত নেই বলে তদানীন্তন আদিবাসীরা উক্ত বস্তু সমূহে নুতন অন্ন নিবেদন করে থাকে। তবে এই সব উপহার, নিবেদন, "রংতক" পূজা সম্পন্ন হওয়ার পরে সব কিছু হয়ে থাকে। এই রংতীক হচ্ছে বিরাট দুইটি ঘাটকলস বা মটকা এর ভিতর জুমের নুতন চাউল কানায় কানায় পুরে দিয়ে তাকে ঢেকে রাখে। অতঃপর ঐ যুগল মাটির কলসটিতে মালা ঝুলিয়ে দিয়ে, কয়েকটি সিদূরের টিপ বসিয়ে ঐ ঘট কলসদ্বয়ের পাদদেশে পূজার ব্যবস্থা করা হত। মোটকথা ঐ মাটির কলসদ্বয় থেকে "মাইনকমা" (লক্ষ্মী) পূজার গদ হিসাবে সাজানো হয়। এই পূজা সম্পন্ন করার পর নুতন অন্নের মোয়া প্রসাদ রূপে টাক্কালের উপর, কোদালের উপর আবার কুড়াল, নিড়ানী (দাখুখা) এবং ধার ঘষার পাথর (হুলং) খাড়া (নংখাই) উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম দরজা ইত্যাদি বিতরণ করতে হয়। তবে কাঁচিই শুধু এই নুতন অন্ন থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ কাঁচি (চেখরা) ব্যতিত জুমের ধান কাটাই অসম্ভব।

সমতল ভূমিতে পতিত হওয়ার পর এই নবান্ন উৎসব আজকাল অবশ্য উত্তরোত্তর বর্জন করেছে এবং কালজয়ের জন্য দিন দিন আচার আচরণ পরিবর্ত্তন করে ফেলেছে। কিন্তু যারা এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করছে জুমের উপর ভিত্তি করে চলে থাকে। ফলতঃ তারা আধুনিক সমাজ থেকে দিন দিন পশ্চাৎপদ হয়ে তলিয়ে যায়। এই কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে রূপিনীরা সমতল ভূমিতে পতন হবার পরই তাদের জীবন

যাত্রা অনেকটা অন্যধাচে নিয়ে যায়। তাকে বলতে হয় যে মিশ্রন সংস্কৃতি মাঝে নিজের জীবন ধারাকে সাঁপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয় উত্তরকালে একে আধুনিক জীবন যাত্রা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। সমতল ভূমিতে অবতরণ করার পর তাদের কৃষি সরঞ্জাম এক ভিন্নতর নামে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত করতে হল। এইসব কৃষি সরঞ্জাম সমূহে আদিবাসীদের ভাষায় কোন নুতন নাম প্রদান করতে পারিনি তাই অগ্রজ জাতিদের ভাষায় অনুকরণ করেই তাদের কৃষি সরঞ্জামের নাম রয়ে যায়। বলাবাহুল্য এইসব কৃষি সরঞ্জামই উত্তরোত্তর বিকৃতির রূপ লাভ হয়ে আদিবাসীদের ভাষায় সন্নিবিষ্ট ঘটেছে। যেমন ঃ লাঙ্গল > লাংঘর, পাজড় > পাঞ্জল, জোয়াল > জুয়াড়, অইল > লাই ইত্যাদি অগ্রজ জাতিদের ভাষায় অনুকরনে কৃষিকার্য্যে দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা সমূহ। কৃষি সরঞ্জামের ভাষা ব্যবহার থেকে সার নিক্ষেপ করে থাকে যে আদিবাসীরা জুমচাষের সময় কোন সময় এইসব বস্তুসমূহ ব্যবহার করেনি তাই আদিবাসীদের ভাষায় উক্ত সরঞ্জামের নাম অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। যেটা বিদ্যমান তাও ধারকৃত ভাষা।

বর্তমানে রূপিনীরা সিংহভাগই কিছু কিছু সমতল ক্ষেত্রের উপর কৃষি চর্চা করতে দেখা যায়। যারা দূরদর্শী তারা অনেক আগে থেকেই সমতল দেশে অবতরণ করে আগেভাগে সমতল ক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করে নেয় এবং তাদের উত্তর বংশধর এখন তা উপভোগ করছে। প্রাককাল থেকে যারা সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করেছে তারা শুধু কৃষি ক্ষেত্র নিয়েই উপভোগ করছে তা নয় অগ্রজ জাতিদের সংস্পর্শে এসে তারা শিক্ষা দীক্ষায় অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে। কিন্তু দূর্ভাগ্যের ব্যাপার প্রাককালে যারা কাঁদাতে পারা দেওয়া এবং কাদা স্পর্শ কাতর ব্যক্তিরা এখনো বন দপ্তর দ্বারা সংকুচিত করা পার্ব্বত্য অঞ্চলে জুমের উপর ভিত্তি করে নিজের পরিবারের ভরণ পোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। যুগ সন্ধির সচেতনতার অভাবে তারা সেই আদিম প্রনালী জুম কৃষি থেকে এর সীমিত উৎপাদন এবং জীর্ণ পুরাতন দ্রব্যাদি ও রীতি নীতি নিয়ে সদা ব্যতিব্যস্ত। বাইরের জগতের আকাশচুম্বী আধুনিকত্বের ছায়া তাদের অঙ্গে স্পর্শ করতে দেয়নি, আদৌ।

আমি নিজেই রূপিনী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং প্রাককালে আমার পূর্ব্বপুরুষও জুমচাষী ছিলেন বটে। কিন্তু আমার ৩ম পুরুষ প্রয়াত ৺চন্দ্র নারায়ন রূপিনী থেকেই প্রথম সমতলভূমিতে অবরতণ করার সঙ্গে সঙ্গেই নলখাগড়া বন এবং সমতলীয় বনাঞ্চল ক্ষেত্রকে কেঁটে নিরিয়ে আবাদ ক্ষেত্রে পরিনত করেছিলেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রেই সরকারী নথিভুক্তভাবে বর্ত্তমান আমার দাদুর পিতা প্রয়াত ৺চন্দ্রনারায়ন রূপিনীর দখলাধীন রয়ে যায়। কিন্তু চন্দ্র নারায়নের পিতা কৃষ্ণকান্ত এবং তার পিতা রঘুমণি ছিলেন মাড়ক হাদুস্থিত (বড়মুড়া) পবতোপরিতে বসবাসকারী এবং তারা সবাই জুম চাষী ছিলেন। রূপিনীদের অনেকদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা কঠোর কায়িক পরিশ্রমের পরও জুম কৃষির উৎপাদন এত সীমিত ছিল যে বড়জোর বৎসরের খোরাক মিটাতেই টানা হেঁচড়া হয়ে যেত। সম্পত্তির

বাহুল্য, পোষাক পরিচ্ছদের বাহুল্য তদানীন্তন একেবারে নেই বললেই চলে। বস্তুতঃ তদানীন্তন জুম চাষীরা শুধু কায়িক পরিশ্রমের জোরেই একমুঠো খেতে পায়। এর ব্যতিক্রম হলে অনাহারে থাকা ছাড়া তাদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তৎকালীন ঐ পর্বতোপরিবাসীদের নিজস্ব সত্ব বা সম্পত্তি নেই বলেই তাদের এই দূর্ভোগ করতে হত। অন্যদিকে রূপিনীদেরই একটি অংশ নবজাগরনের সাড়া পেয়ে কিছু পূর্ব্ব থেকেই নিম্ন ভূমিতে ধাবন করে চাষ আবাদ চর্চা করে উঠে। তারা আদিম প্রনালী জুম কৃষিকে আঁকড়ে না ধরে, সমতল ভূমিতে হাল চাষের কৃষি চর্চায় কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল বটে কিন্তু প্রথম, প্রথম তারা একেবারে জুম থেকে বিচ্যুত হতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে যে নুতন কৃষিতে পত্তন হয়ে, তারা ঐ নুতন পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা ছিল না।

ঐ নুতন উপনিবিষ্ট সমতলবাসীদের উত্তরোত্তর সামগ্রীকভাবে শ্রীবৃদ্ধি তদাপি পর্বতোপরিতে বাসকারীদের কাছে লক্ষ এড়িয়ে যায়নি। এই কৃষি প্রতিযোগী ক্রান্তি যুগে রূপিনী গোত্রের আর একটি ধারা সমতল ভূমিতে উপনিবেশ হয়ে উক্ত ভূমির বনাঞ্চল বা নলখাগড়ার বনকে অবাধ গতিতে দখলের অভিযান চালাই। পরবর্ত্তীকালে এইস্থান বা ক্ষেত্রগুলি আবাদ ভূমিতে পরিনত হয়ে স্ব স্ব দখলে চলে যায়। বলাবাহুল্য রূপিনী গোত্রের এই দ্বিতীয় ধারা, যারা পরে সমতল ভূমিতে অবতরণ হয়েছিল এই দলের মধ্যে আমার দাদুর পিতা ৺চন্দ্র নারায়ণ রূপিনীও সন্নিবিষ্ট ছিল বলে জানা যায়। আমার দাদু রামধন রূপিনীর কাছে শুনেছি তার পিতা নাকি স্বহাতে টাক্কাল ধরে বিশাল বনভূমি এবং নলখাগড়ার অঞ্চলকে কেঁটে নিরিয়ে দখল করেছিলেন এবং শেষে কোদাল হাতে উঁচুনীচু সরিয়ে আবাদক্ষেত্রের উপযোগী করে তুলে ছিলেন। তৎকালীন রূপিনীরা হাল চাষের মাধ্যমে কৃষি চর্চা শুরু করলে ঘরে ঘরে সবাই গরু পালা সূচনা হয়। ঐ গরু রাখার তাগিদে প্রয়োজন হয়ে উঠে গোয়াল ঘরের। অন্যের অনুসরণে ঘরে ঘরে গোয়াল ঘর গড়ে উঠলেও ঘৃনায় গোবর স্পর্শ করার অনীহা হোক, বা গোয়াল ঘর পরিষ্কার প্রয়োজনবোধের অজ্ঞতায় হোক, মোটকথা, তৎকালীন গোয়াল ঘর পরিষ্কার করত না। এই রকম পরিবেশে গৃহপালিত অপরিহার্য পশুদের রাখা অমানবিক বিচার বলে আমার দাদুর পিতা সজাত্য গোষ্ঠীর কাছে ঘোষনা করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম হাতে স্পর্শ করে গোয়াল ঘরের গোবর বাইরে নিক্ষেপ করে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে গরু রাখার উদ্যোগ নেন। এই জমাকৃত গোবর শাকসব্জীর ক্ষেতে ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানু, তিনিই প্রথম স্বজাত্য গোষ্ঠীর মধ্যে প্রদর্শন করেছিলেন। দাদুর কাছ থেকে আরও জানা যায় যে তথাকথিত দুধ ছিল গোটা রূপিনীদের অবৈধ আহার। কিন্তু ৺চন্দ্রনারায়ণ রূপিনী সেই অবৈধ আহার দুধ প্রথম পান করে তার স্বাদ এবং গুণাগুণের সকলের মধ্যে অবগত করে দিয়েছিলেন এবং এই দূরসাধ্য করে তিনি খুবই লোকান্তরিত কুড়ে নিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়। তখন থেকে গোটা রূপিনীদের কাছে দুধ আহার্য্য হিসাবে প্রচলন হয়ে

যায়।

সমতল ভূমিতে পতন হবার পর গোটা রূপিনীরা উদ্যান সংরক্ষণ, এবং পুকুর কাটা শাকসব্জীর উৎপাদনে প্রবল জোরদার হয়ে উঠে। ফলতঃ রূপিনীদের বাড়ীর চৌহদ্দিতে ঘরে ঘরে সুপারী, নারকেল, আম, কাঁঠাল আরও অনেক কিছু ফলের গাছ রোপন করতে দেখা যায়। এইভাবে সমতল ভূমিতে এসে কৃষি চর্চার সঙ্গে সঙ্গেই রূপিনীদের জীবন চর্চার গতিও উত্তরোত্তর বিবর্তন ঘটতে থাকে। মূলতঃ মানুষের বৃত্তির পরিবর্তনের পাশাপাশি জীবন মানও কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। এর ফলপ্রসূই উত্তরকালে রূপিনীরা শিক্ষাকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করে নেয়।

খাদ্য আহরণ ঃ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রাচ্য আদিবাদীদের সাধারণতঃ কিরাত বা কিরাতা বলে অভিহিত ছিল এবং তারা প্রাকৃতিক গুহাতে বসবাস করে প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের খাদ্য আহরণ করে উদরপূর্তি ছাড়া অন্যত্র কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। কেননা তৎকালীন এই কিরাত জাতিরা উৎপাদন কার্য প্রনালী কৃষিকাজ এবং তার সরঞ্জাম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল। প্রাচীনকালে কিরাতরা, সমতলীয় ভূমিতে বসবাসের নিদর্শন থাকলেও তৎকালীন তারা কৃষি চর্চায় অভ্যস্ত ছিল, এমন কোন প্রমান এখনো পাইনি। তবে কোন কোন অংশের কিরাতরা গুহাতে বসবাস করে, এই কথাটি অনেকাংশে স্বীকার্য এবং তা জে. পি. সিংহের পুঁথিতে কয়েকটি উদ্ধৃত তথ্যাদি থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে; এই তথ্য নিম্নে প্রদান হয় যেমন ঃ **The discovery of some caves in the hill areas North-East India prove the existance of some older branch of the Kirata population in the prehistoric time. We have some recorded evidence of these caves existing in the Khasijaintia Hills, the Garo Hills, the North Cachar Hills and Naga Hills of Manipur (P. 173 Kiratas in Ancient India).**

আর্য জাতিরা যখন সমগ্র পূর্ব্বখণ্ডের সমতল ভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করে ছিলেন, এবং ব্যাপক ভাবে সমতল ভূমির কৃষি চর্চার অভিযান চালান তখন কৃষিকার্য্যে অজ্ঞ বর্বর জাতি কিরাতরা (তৎকালীন যারা সমতলে ছিল তারা) আপোষেই এইসব স্থান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হয়। অতঃপর তাদের খাদ্য প্রাচুর্য বনাঞ্চল পার্ব্বত্য ভূমিতে আরেহন করেছিল বলে জানা যায়। সমতল ভূমির অরণ্য অঞ্চলকে লুপ্ত করে আর্যরা চাষ আবাদ করার পদক্ষেপ নিলেও পার্ব্বত্য বনাঞ্চলের উপর কৃষিচর্চা গড়ে তুলা তাদের কোনদিনও দৃষ্টিক্ষেপ ছিলো না। তাই কিরাত জাতিরা আর্যজাতির মুক্ত কবলিত অঞ্চলে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবাধে বিচরণ করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এইসব অঞ্চলে আরোহণ করে বন্যজন্তু শিকার ও খাদ্য আহরণ সমতল ভূমির অপেক্ষা আরও সহজতর হয়ে উঠে; তবে মৎস্য কিছুটা কমে যায়। খুব সম্ভবতঃ কিরাত জাতিরা সমতল বনাঞ্চলে থাকাকালীন

বৃক্ষছায়া এবং বৃক্ষগোড়ি দেশের সুরুঙ্গে থাকার অভ্যস্ত হয়েই, পরে পর্বতোপরিতে আরোহন করার পর প্রাকৃতিক গুহাকে তাদের বাসা হিসাবে বেছে নেয় এবং তা আরও সুনিশ্চিত বাসা খুঁজে পায়। মূলতঃ এইসব গুহার ভিতর আস্তনা গড়েই দিনের বেলাই সর্বক্ষণ তারা খাদ্য আহরনে ব্যতিভ্যস্ত থাকত। এবং তাহাই প্রাককালের মূল বৃত্তি রূপে বরণ করে নেয়। এক্ষেত্রে তৎকালীন আর্য জাতির বৃত্তি এবং কিরাত জাতিদের বৃত্তি একেবারে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সময় প্রাচ্য খণ্ডের কিরাত জাতিরা লৌহা ব্যবহার সম্পর্কে উন্মেষ হয়নি। প্রস্তরখণ্ডের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র এবং শারীরিক বলই তৎকালীন অসাধ্য কাজ সম্পন্ন করে নিতে পারত। এই সম্পর্কে এ. স্মীথের অভিমত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন ঃ The wild race or savage, covering themselves with the skins of beasts, having cloud like nails strong enough to rip up roa fish and split softer kinds of wood and ignorant of the use of iron. (10) তা ধীরে ধীরে সমাজ বিবর্তন হয়ে উঠলে মানুষের সচেতনতা উত্তরোত্তর উন্মেষ হয়ে উঠে। তারপর তারা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বর্জন করে লোহার যুগ ব্যবহার শুরু করে। তখন থেকে প্রাকৃতিক উপাদানের উপর কেবল নির্ভরশীল না হয়ে স্বহাতে গড়ার উন্মেষ হয়। ফলে কিরাতদের জীবন যাত্রার মান অনেকটা পরিবর্তন হয় বলে ধারনা করা যায়। তা Ktesias the Knidiam নামক পুথিঁতে উল্লেখিত বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে তা নীচে প্রণিধানযোগ্য। যেমন ঃ The sheep oxen and asses of the Kiratas were very small. They also practised primitive system of Agriculture. They began to produce crops, fruits and vegetables. Their food consisted of fruits vegetable, roots, nuts wild pulse, cereals, flesh of animals, row fish etc. The dress which they used were the barks of trees and skins of animals. (Page No. 46)

খাদ্য আহরণ, সমতল ভূমির অপেক্ষা আরও সহজতর হয়ে উঠে, তবে মৎস্য শিকার বস্তুত জুমচাষ আর্যদের অনুকরনে গড়ে উঠেনি এই আদিম কৃষি চর্চা সূচনা হয়ে সেকালের মানুষের প্রয়োজন তাগিদে। কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাদ্য আহরণের পরিবর্তে এবং তার বিকল্প ব্যবস্থাই হচ্ছে জুম চাষের সূচনা এবং অনির্দ্দিষ্ট শতাব্দি ধরে কিরাত জাতি তথা উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে এই পদ্ধতি বহাল রয়ে যায়। জুম কৃষির ফসলের দ্বারাই সেকালের উক্ত আদিবাসীদের খাদ্য আহরণ সমস্যা থেকে অব্যহতি পায়নি, যা কিছু জুম ফসলের দ্বারা আমদানী হত এর মধ্যে যা কিছু সংরক্ষণযোগ্য কাঁচামাল সমূহ বৎসরের রসদ হিসাবেগাঁট করে রাখা হলেও পচনশীল কাঁচামাল সমূহ প্রতিনিয়তই সংরক্ষণ যোগ্য নয়। এইসব ক্ষনস্থায়ী খাদ্যসামগ্রীর কাঁচা মাল উত্তরকালে আদিবাসীদের দৈনন্দিন মূল খাদ্যের সঙ্গে আনুসঙ্গিক খাদ্য হিসাবে প্রচলিত রয়ে যায়। অর্থাৎ ভাত (মাই) খেতে গেলে তরিতরকারি (মুই) প্রয়োজনবোধ হলে উক্ত আদিবাসীদের মধ্যে আবার বনভূমি

থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। এইসব শাকসব্জী, ফল-মূল আনুষঙ্গিক খাদ্যসামগ্রী জুমের মূল শস্যের রূপিনীরা সাধারণতঃ উৎপাদন করলেও বিশেষ করে সীমিত সময়েই তা উপশম হয়ে থাকে আর বাকী সময়ে আবার খাদ্য আহরণ ছাড়া উক্ত গোষ্ঠীদের বিকল্প ব্যবস্থা তৎকালীন ছিল না।

সাধারণতঃ এইসব বনের শাকসব্জী তৎকালীন রূপিনীরা আনুসঙ্গিক খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করত যেমনঃ বন্যসিম (সিবাই), বাঁশের করুল (মুইজা), বন্য শাক (দালুপাত), ফুল বা আলু (থা) নানান বন্য ফল (বথাই উাথাই) গছ্যা ওল (মিখুমুর) মৃত্তিকা ওল (মিখুমহাপলক), বন্য বাদাম (থাইবাই) এবং মধু এইসব হচ্ছে উল্লেখযোগ্য । শিকারের লব্য কাঁচা মালের মধ্যে যেমন মাছ (আ), মাংস উল্লেখযোগ্য। তবে জুম চাষ আরম্ভ হলে এইসব খাদ্য অনুসন্ধানের কাজে তারা কিছুদিন বিরত নেই। কেননা জুম চাষের মাধ্যমে তাদের বৎসরের রসদ মূল খাদ্য উপাদান ধান, যে কোন ভাবে তুলে সংরক্ষিত রাখতে হবে। তবে জুম চাষ চলাকালীন কাজের অবসরে আশেপাশে যা কিছু সংগ্রহ করত তাই খাদ্যের আনুসঙ্গিক তরীতরিকারীর খাদ্য মিটিয়ে নিত।

শিকার ঃ সাধারনতঃ রূপিনীরা তীরধনু সমেত সশস্ত্রভাবে পশুপাখি শিকার প্রাককালে করলেও কৃষি যুগ থেকে ফাঁদের সাহায্যে পশু-পাখি ধরার সুচনা হয়। এইক্ষেত্রে ছিকাম কুকি এবং আর্যজাতির শিকারে সঙ্গে আমূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং ফাঁদ যন্ত্রের সাহায্যে জন্তু শিকার আর্যরা অজ্ঞ ছিলেন এবং ছিকাম কুকিরা জানলেও কার্যতঃ তারা ব্যবহার করত না। (অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খেলা এবং লক্ষ সিদ্ধহস্ত নিয়ে প্রতিযোগিতাই ছিকাম কুকিদের মধ্যে অন্যতম খেলাধূলা ছিল এবং প্রাককালে এইসব নিয়েই উক্ত কুকিরা ব্যতিভ্যস্ত থাকত। তাই ফাঁস বা ফাঁদ সাহায্যে পশু পাখি শিকার করা প্রাককালে ছিকাম কুকিরা কোন প্রয়োজনই ছিল না।)

এই ফাঁদের সাহায্যে পশুপাখি ধৃত খুব পৌরাণিক। কিন্তু খুবই উন্নত ধরনের পদ্ধতি ছিল এবং তা সাময়িক শিকার পদ্ধতি একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মাত্র। (অন্যদিকে সশস্ত্রভাবে পশুপক্ষি শিকার করা দৈনন্দিনের বৃত্তি বলে অনুধাবন করা যেতে পারে।) এটাই বুঝা যায় প্রাককালে রূপিনীরা বিশেষতঃ মাংসাশী ছিল না। তাই পশু পাখি শিকার বৃত্তি খাদ্য আহরণের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বলাভ করেনি। তবু তারা অবসরের সুযোগ বুঝে এই শিকার চর্চা করে থাকে। এইসব ফাঁদ পেতে পশু পক্ষি শিকার করার কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন ঃ- দুক, খই, জঙতর 'দুককিতিক, মায়ুং-উরাই ইত্যাদি সেকালে প্রসিদ্ধ ছিল। শুধু মাংস আহরণের উদ্দেশ্যেই এইসব ফাঁদ পাতেনি, বসতিতে এবং জুমের ক্ষতি সাধনে তিক্ত হয়েও উক্ত ফাঁদ বা ফাঁস পেতে রূপিনীরা পশুপাখি ধরত।

প্রাককালে রূপিনীদের সবচেয়েতে উন্নতর পশুশিকার পদ্ধতি হচ্ছে 'দুক'। এই

দুক যন্ত্রে কোন লোহা এবং পাথরের ব্যবহার কোনক্রমেই প্রয়োজন নেই। শুধু কাঁচা বাঁশ এবং দড়ির মাধ্যমেই ঐ যন্ত্রের সরঞ্জাম। প্রথমে জন্তু জানোয়ারদের আসা যাওয়ার পথ নির্ধারণ করে নিতে হয় এবং জানতে হবে তা কি ধরনের জন্তু। তারপর ঐ স্থানে জন্তুর উচ্চতা মাপ অনুসারে এর পথে 'দুক' নামে ফাঁদ সাজিয়ে রাখা হত। যেমনঃ সবচেয়েতে সংকীর্ণ বন্যজন্তুর রাস্তায় ঝোপ ঝাঁপ, আড়াল করে একটি ''এডফং'' নামে ৭ফুট লম্বালম্বি শক্ত কাঁচা বাঁশের লাঠি গেড়ে বসানো হয়। তারপর তাকে ধনু আকারে আঁকড়ে জোড়ে হেলিয়ে টানা হলে, ঐ টানা দড়ি বা বেতটাকে চাবির মত একটি খাদে আটকিয়ে রাখা হয়; যাতে চাবিতে টান পড়া মাত্রই উক্ত এড়ফংটি ছুটে গিয়ে চার ফুট লম্বালম্বি বল্লমকৃত (সুনঠাৎ) একদিকে সূক্ষ্মাগ্র অপরদিকে গোদা মুখে যাতে প্রহার করে। ঐ চাবির মত খাঁদের সঙ্গে জড়িয়ে একটি সূক্ষ্ম দড়ি (দুকছা) সোজা এবং আড়াআড়িভাবে টানা দিয়ে সরিয়ে রাস্তার অপর পাশে বেঁধে রাখা হয়। যখনি কোন বন্য জন্তু উক্ত ''দুকছা'' দড়ির টানে চাবি খুলে গিয়ে ''এডফংটি'' তীব্রগতিতে 'সুনঠাৎ' এ র গোদা মাথায় প্রহার করবে। এই আঘাতে সুনঠাৎ ত্বরিৎ গতিতে সমান্তরালভাবে ছুটে গিয়ে দুকছা অতিক্রমরত জন্তুর উদর বা মধ্যাঙ্গে বিদ্ধ হয়ে আড়াআড়ি দুইটি বাঁশের খুটিতে আটকে যাবে। পরের দিন ফাঁদকারী আধা মড়া এবং না হয় মড়া অবস্থায় ''মই' অর্থাৎ শিকারের জন্তু অনায়াসে পেয়ে থাকে।

জঙ্গতর ঃ এটা অনেকটা পিঞ্জরাকৃতি ফাঁদ। সাধারণতঃ বসতি বা বিরাট জন আবাস স্থানে গণ উদ্যোগেই এই ফাঁদ সাজানো হয়ে থাকে। কোন হিংস্র জন্তু জানোয়ার দ্বারা রাত্রিতে বসতি এবং গবাদি শালায় হানা দিয়ে, পালিত পশু নিয়ে যায় এবং অনেক সময় মানুষের উপর হানা দিলে, তা মানুষের মৃত্যুর কারণও হয়ে থাকে। তখন সমগ্র জন উদ্যেগে হিংস্র জন্তু জানোয়ারকে ধরে দেখার কৌতুহল হলে, তখনই, গেড়ে তুলে বিরাট পরিধিতে তৈরী এক দরজা বিশিষ্ট পিঞ্জাকৃত ফাঁদ। হিংস্র জন্তুর পদচিহ্ন নির্ধারণ করে উক্ত জন্তু বসতিতে প্রবেশ পথে, ঐ ''জঙ্গতর'' গেড়ে বসাতে হয়। কার্যতঃ এই ধরনের ফাঁদে প্রহার এবং বিদ্ধকরণের কোন সারঞ্জাম সন্নিবিষ্ট নেই, শুধু এক বিশিষ্ট দ্বার দিয়ে 'মুই' অর্থাৎ জন্তুকে ঢুকিয়ে দিয়ে চাবির পদ্ধতিতে দরজা বন্ধের প্রকল্প। সীমিত আকারে একটি দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট মজবুতভাবে গড়া ছাদ সম্পন্ন পার্শ্ব বেড়া পিঞ্জরার আকার তৈরী করে, এবং তার মধ্যে একটি সংকীর্ণ আকারে প্রবেশাদি দ্বার রাখা হয়ে থাকে। এই পিঞ্জরার ভিতর একটি কুকুর কিংবা ছাগল বেঁধে এর বাঁধন দড়ি সঙ্গে সংযোগে দরজা বন্ধ করার চাবির সঙ্গে একটি দড়ির টানা থাকে। যখনি হিংস্র জন্তু বসতিতে অবস্থান করবে টের পেয় ঐ পিঞ্জরায় বাঁধা গবাদি জন্তু ডাক দেবে এবং ডাক শুনে এমনি হিংস্র জন্তু সংকীর্ণ দরজা পেরিয়ে পিঞ্জরায় আভ্যন্তরীণ বাঁধা কুকুর কিংবা ছাগলটিকে টানা হেচড়া শুরু করবে, তখন তীব্রগতিতে বন্ধন প্রনালী চাবিটি টান পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। এমনভাবে

ঐ পিঞ্জরার ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে ছুটে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। পরেরদিন সকালে বসতির লোক সকলে ঐ আবদ্ধকৃত হিংস্র জন্তুকে পরিস্ফুটভাবে দেখে থাকে।

মায়ুংউারাই ঃ এই ফাঁদ পদ্ধতিটি রূপিনীদের প্রাচীনতম প্রনালী। বলাবাহুল্য এই 'মায়ুংউারাই' প্রনালীতে থানাংচিতে উপনিবেশের সময় অসাধ্য ধৃত শ্বেত হস্তীকে ধরতে সক্ষম হছিল বলে জানা যায়। পূর্ব্বউক্ত জঙ্গতর মতই অনেকটা গণ উদ্যোগে এই ফাঁদ তৈরীর পরিকল্পনা নেয়া হত। যখন কোন বন্য হস্তী বসতিতে উৎপাত করে ঘরবাড়ী ক্ষতিসাধন এবং শস্যক্ষেত্রে অনিষ্ট করে, অনেক সময়ই মানুষ মেরে ফেলে। এই অবস্থায় বসতি লোক সব এক জায়গায়উক্ত হাতীকে ধরার জন্য উক্ত হাতীর "লামতর" অর্থাৎ হাতী ধাবনের পদ চিহ্নিত করে অর্থাৎ যে পথে উক্ত হাতী সচরাচর আসা যাওয়া করত সেই সব পথে বিরাট আকারে কূয়া খনন করা হয়ে থাকে ২০-২৫ ফুট গভীর এবং তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান কূয়া খনন করে নিতে হয়। এরপর গর্ত থেকে নুতন মাটি উত্তরণের কোন চিহ্ন না রেখে পুরাণ মাটিতে উপরিভাগ পাতলা লেপে বাঁশ আড়াআড়ি করে ছাঁদ তৈরী করে নিতে হয়। এই ছাদ এমনভাবে লেপে দেয়া হয় যে, যখনি হাতী উপর দিয়ে পাড়া দেবে তীব্র গতিতে ডিগবাজী খেয়ে শূন্যগর্ভে পড়ে যাবে। হাতী আগেভাগে জানার কোন সুবিধা নেই যে উক্ত স্থানটির নীচে শূন্য গর্ভে সন্নিবিষ্ট, কেননা এমনভাবে প্রকৃতির সামঞ্জস্যে সাজা হাতী কেন, মানুষও বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারবে না যে উক্ত স্থানে ফাঁকা আছে। তারপর উক্ত কূয়াতে গিয়ে হাতিটি আটকে পড়লে একে ধারালো অস্ত্র এবং বল্লমের বিদ্ধতে হাতিটিকে মেরে ফেলা হয়। হাতীর যুগল দাঁত এবং চামড়া সেকালে আদিবাসীদের অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু হাতীর মাংস সাধারণতঃ রূপিনীরা ভক্ষন করে না।

দুককিতিং ঃ এটা সচেতন গৃহপালিত পশু এবং মানুষের মধ্যে চোর বা অসৎ অবলম্বনকারীদের ধরার প্রয়াসে এই দুককিতিং মাধ্যমে ভাল ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বসতি বা একটি ঘরে চোরের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু কোন প্রকারে ঐ চোরকে ধরার সম্ভব নেই তখন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। তাই চোর যে বাড়ীর চৌহদ্দির বেড়া অতিক্রম করে, চুরি করতে আসবে, সেই স্থানেই অর্থাৎ ঐ প্রবেশকারী মুখ্যদ্বারের মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গোপনভাবে ফাঁস পেতে রাখে। "এড়ফং" নামক ১৪ফুট লম্বা এবং মোটা কাঁচা বাঁশকে মাটিতে মজবুত ভাবে গেড়ে দিয়ে ঐ বাঁশের আগায় রশি বেঁধে ঐ বাঁশটি জোড়ে যতটুকু সম্ভব হেলিয়ে ঐ রশিটি একটি চাবির মত ফাঁসে আটকে দেয়া হয়। তারপর চোর বা দোষকারী প্রথম যে স্থানে এসে পারা দেবে এই জায়গায় "এড়ফং" এর জোড়ে টানা রশিটির আটকানো বিচ্যুৎ করণের চাবির সূত্র পাতলা মাটির লেপে পুঁতে রাখা হয়। এর উপরই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে উক্ত এড়ফং এর টানা রশিটির

অবশিষ্ট অংশটিকে ফাঁস তৈরী করে গোলাকার ভাবে উক্ত স্থলে সরিয়ে রাখা হয়। যখনি চোর বা দোষকারী এসে রশির ফাঁস সন্নিবিষ্ট উক্ত চাবি সূত্র স্থলে পারা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত এড়ফং এর টানা রশিটি বিচ্যুৎ ঘটে গিয়ে এবং উক্ত ব্যক্তির পায়ে ফাঁস জড়িয়ে ডিগবাজী খেয়ে রশির টানে উপরে তুলে দেবে। তারপর ঘরের মালিক এবং বসতির লোকজন এসে ঐ চোর বা দোষকৃতকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলত।

খই ঃ ইহা সাধারণতঃ খাদ্য উপযোগী ছোট খাতু পশুপাখির জন্য সরঞ্জাম তৈরী করে মাংস আহরণের জন্যই ফাঁদ পেতে রাখা হত। এটা অনেকটা পূর্ব্ব উক্ত দুককিতিং এর সরঞ্জাম বিশেষে ফাঁদ তৈরী করা হয়ে থাকে। তবে এটা ছোট আকারে সাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। এইসব মই যেখানে পশুপাখির যাতায়াত এবং বিচরণ স্থানে এইসব খই পেতে রাখা হয়। সাধারণতঃ বাচ্চারাই এই সব ফাঁদ তৈরী করার অভিজ্ঞতা রাখত। এই খই অর্থাৎ ফাঁদ বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। যেমন ঃ ডুবির ফাঁস (তাউথু খই) কাল বকের ফাঁস (দ্‌ক খই) আরও অনেক। কিন্তু মূল ছাঁচ একই।

মৎস শিকার ঃ মৎস শিকার রূপিনী সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য খাদ্য আহরণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। তাই উত্তরকালে যখন রূপিনীরা পর্বতোপরিতে বসবাস করত তখন শুকনো মাছ বা শুটকীর দ্বারা মাছের বিকল্প হিসাবে মিটিয়ে নিত। তাই পার্ব্বত্য অঞ্চলে থাকাকালীন ঝর্না এবং ছোট ছোট ছড়া থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে মাছ শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়ত। রূপিনীরা অনেক রকম পদ্ধতিতে মাছ শিকার করে থাকে। এইসব শিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রণালী নিম্নে বৃত্তান্ত দেওয়া হল।

আরো সুমা ঃ কোন একটি বণ্য গাছের মূল বা শিকড়টি চূর্ণ করে আবদ্ধ জলাশয়ে সরিয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে জলে ফেলে দেওয়ার ১০-১৫ মিনিট পরেই উক্ত জলাশয়ের মাছ নেশা হয়ে উপরে ভেসে উঠে। তখন বিনা পরিশ্রমেই মাছ ধরে নিতে পারে। কিন্তু স্রোত জলে এই বিষক্রিয়া করণ ফলপ্রসূ হয় না, তাই প্রবাহমান জলে বা ছড়ায় উজান এবং নিম্ন অববাহিকায় বাঁধ দিয়ে জল আবদ্ধ করে তারপর ঐ "আরো সামা" অর্থাৎ বিষ প্রতিক্রিয়া করণ প্রনালী কার্যকর হতে পারে।

তৈয় সাৎরই আ-রুমমন্ ঃ এই প্রনালীটি রূপিনীদের অন্যতম মাছ ধরার পদ্ধতি। তৈয় সাৎরই আ-রুমমন্ অর্থাৎ জল হিচে মাছ ধরা। এই পদ্ধতিটি শুধু রূপিনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তথা সমগ্র আদিবাসীদের মধ্যে এই পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং এখনো তা সামগ্রিকভাবে প্রচলন আছে। এই পদ্ধতিটিতে মাছ ধরার আগে প্রয়োজনে এক বা একাধিক বাঁধ দিতে হয়। যাতে নুতন জলের সংযোজন না ঘটে। বিশেষ করে এই উক্ত জায়গার জল শুকিয়ে ফেলার জন্য বাঁধের উপর দিয়ে জল হিচিয়ে হিচিয়ে বাইরে ফেলতে হয়, এবং জল শুকিয়ে গেলে সহজভাবে উক্ত স্থানের মাছ ধরে নিতে পারে

। সাধারণতঃ মাছ ভরা জলাশয়, এবং ডোবা, নালা, স্থানেই এই প্রনালীতে মাছ ধরা হয়ে থাকে। যদি স্রোত জলে এই প্রনালীতে মাছ ধরতে হয়, আগে ছড়ার অববাহিকার উজান এবং নীচে পরপর দুইটি বাঁধ বেধে স্রোত জলটি আবদ্ধ করে নিতে হয়। তারপর ঐ আবদ্ধ জলটি হিঁচে সরিয়ে বিশেষ করে এই স্থানটি শুকিয়ে ফেলতে হয়। জল শুকিয়ে গেলে সহজভাবে উক্ত স্থানের মাছ ধরে নিতে পারে।

ডো-চাকমুন ঃ ১৩´´ লম্বা এবং ২০´´ বের বেতের বোনা এবং এর একদিকে আবদ্ধ এবং অপরদিকে সংকীর্ণ পথে খোলা রাখা একটি গোলাকৃত ডোলা। এই ডোলার (ডু) যে দিকটা খোলা এটা অনেকটা টিপ আকারে নীচে ধারালো চ্যাপ্টাকৃতি সংকীর্ণ প্রবেশাদির পথ, এবং এই সরুপথে নিম্নমুখী বেতের ঢোকানো কাঁটা আড়াআড়িভাবে সাজানো থাকাতে মাছ সহসা ঐ ডোলাতে (ডু) প্রবেশ করতে পারলেও বাইরে বেরিয়ে আসার সময় উক্ত কাটার ঝাঁকে হোঁচট খেয়ে মাছ বাইরের পথ বেছে নিতে পারে না। বড় জলাশয়ের সংযোগস্থলে, - ছোট ছোট ছড়া এবং ঝর্নাতে মাছের জন্য এইসব ডোলা (ডু) পেতে রাখা হয়। সন্ধার আগে পেতে রেখে সকালে কতটুকু মাছ উঠেছে তুলে দেখা হয়।

উঁসুং চাকমুন ঃ এই পদ্ধতিতে মাছ ধরা শীতের মরসুমেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে আঁশ ছাড়া মাছই এইসব বাঁশের চুঙ্গীতে (উঁসুং) শীতকালে ঢুকে থাকে। এই চুঙ্গী তৈরী করার প্রনালী হচ্ছে যেমন ঃ একটি কাঁচা বাঁশ কেটে এক মুখে একটি ঢাকনা বা আবদ্ধ রেখে অপর মুখে খোলা রাখতে হয়; যাতে মাছ তোলার সময় নিচের দিকে জলের সঙ্গে মাছ পড়ে না যায়। আবার ঐ জল ভরা চুঙ্গীকে উর্দ্ধমুখী করে তুলে স্থলে আসার সময় উক্ত চুঙ্গীর জল যাতে সরে নীচে পড়ে যায় তারজন্য ঢাকনার কাছে সাধারণ একটি ছিদ্র তৈরী করা থাকে। যেখানে মাছ ভরা এবং আঁশ ছাড়া মাছ থাকার সম্ভবনা বেশী, সেইসব পুরানো খাল, বিল, ডোবা এবং পুকুরে সাধারনতঃ এইধরনের চুঙ্গী একাধিক পরিমানে ফেলে রাখা হলে এবং তাতে প্রচুর পরিমানে সিং, মাগুড়, কুইচ্যা, কাঁকড়া, ইচা আরো অনেক রকমের আঁশ ছাড়া উক্ত চুঙ্গীর দ্বারা সহজ উপায়ে মাছ ধরতে পারে।

বাড়াই সঙ্গমুন্ ঃ এই পদ্ধতিতে মাছ ধরার প্রকল্প সাধারনতঃ অনধিক গভীর জল স্রোতমান ছড়া এবং খালেই এই ফাঁদে ঢেলে সাজানো হয়। এই "বাড়াই" তৈরী করার প্রনালী হচ্ছে, যেমন ঃ জলের গভীরতা অনুসারে লম্বালম্বি এবং জলের উপর ৫´´ অবশিষ্ট রেখে যথা প্রয়োজনে ছোট ছোট বাঁশের খুঁটি জলের নীচে মাটিতে গেড়ে বসিয়ে দিতে হয় এবং ছড়া বা খালের এপার ওপার সমান্তরালভাবে পরপর ৩´´ দূরত্বে দুটি সারিবদ্ধ করা হত। জলের নীচের মাটি স্পর্শ করে পাতলা বেতের বোনা "ধামা" নামে লম্বা

চওড়া উর্দ্ধমুখী খুঁটি জড়িয়ে ঠেঁসে বেঁধে দেওয়া হয়, এবং যাতে নীচের মাটি ভেদ করে এবং জলে কোন মাছ নিম্ন অববাহিকায় অবতরণ করতে না পারে। তারপর "ডু বা চরকা" এর বেড় অনুযায়ী ঐ ঠেকানো চামচিটির গায়ে কয়েকটি ছিদ্র করে "ডু বা চরকা" পেতে মাছ প্রবেশের অপেক্ষায় থাকতে হয়। উপর থেকে বেয়ে এসে মাছ যখন চানচিতে হোঁচট খাবে এবং নীচে উপর ছিদ্র খুঁজে না পেয়ে সহসা ডু বা চরকা পাতা ছিদ্র পথে প্রবেশ করে নেবে এবং মাছ কোন মতেই আর বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

বাড়াই নুকূর ঃ এটি একটি আদিম প্রনালীতে মাছ ধরার পদ্ধতি এবং আজকাল এটা বিলুপ্ত প্রায়। এই বাড়াই নিয়ে রূপিনীদের ভাষায় প্রবাদ বাক্য আজও বিদ্যমান; যেমন ঃ "আ কতর বাড়াই সৌপাইজা, আ -চীকনসে তাড়াইসৌপাই নাই।" সাধারন ভাবে এই "বাড়াইনূকূর" অনেকাংশে 'বাড়াইসঙ্গ' এর সরঞ্জাম বিশেষে ঢেলে সাজানো হয়ে থাকে। তবে 'ডু বা চরকা' এই ফাঁদে ব্যবহৃত হয় না। এই বাড়াই নূকূরটি এমনি আদিম কলাকৌশলের মাধ্যমে তৈরী যে জল থেকে মাছ নিষ্কাষন করে বেতে বোনা পাতলা 'চানচিতে শুধু মাছ ছিটে সরিয়ে দেয়। এই ফাঁদ তৈরীর মূল প্রনালী হচ্ছে যেমন ঃ পূর্ব্ব উক্ত বাড়াইসঙ্গ এর মতই ছড়া বা খালের এপাড় ওপাড় জড়িয়ে পর পর সমান্তরাল ভাবে বাঁশের খুঁটি সারিবদ্ধ করে নিতে হয়। যাতে ছড়া বা খালের স্রোত জলে 'বাড়াই' এর উপর বেয়ে যায়। এই "বাড়াইসঙ্গ" অপেক্ষা "বাড়াইনুকুর" উচ্চতা দিক দিয়ে একটু কম হতে হয়। বাড়াই এর উপর দিয়ে জল যখন বেয়ে যেতে থাকে, জলের গতিরোধ করার প্রয়াসে কলা গাছ না হয় গাছের গুঁড়ি উক্ত বাড়ায়ের এপার ওপার বদ্ধকরণে লম্বালম্বিভাবে ফেলে রাখা হয় এবং যাতে এই গুড়িতে ধাক্কা খেয়ে ছড়া বা খালে স্রোত জল গতিরোধ হয়। তারপর নরম বেতে বোনা ধাড়ি ঐ গাছের গুঁড়ির লম্বালম্বি গেঁথে দিলে এবং এটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে জলের স্রেতের তালে তালে একবার বেঁকা একবার সোজা হয়ে এইভাবে ফেলতে থাকে। যেই মাছ ধাড়ির উপর দিয়ে বেয়ে চানচিতে অবতরণ করবে, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ধাড়িতে ধাক্কা খেয়ে জলের স্রোতের জোড়ে পাতলা 'চানচিতে ছিটে সরে যায়। তখন ফাঁসকারী সহজেই ঐ মাছটি ধরে নিতে পারে।

থুয়া ঃ "থুয়া" অনেকটা ডু আকার বিশেষ মাছের ফাঁদ। তবে 'বুপার' অর্থাৎ মাছ আটকানোর টালিকৃত ঢাকনাটি এবং এটা অনেকটা পর পর দুই পলাই সাজানো। উক্ত 'বুপার' অর্থাৎ টালিকৃত ঢাকনায় এক মুখ আবদ্ধ। শুধুমাত্র মাছ প্রবেশাদির পথ আছে। এই থুয়া সাধারণ ভাবে 'ডু' পেতে রাখার মত খাল বা ছড়াই, কানায় কানায় আবদ্ধ করে দেওয়া হলেও, স্রোত জল 'থুয়াতে' প্রবেশের আগেই খাল কেঁটে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর 'থুয়ার' অভ্যন্তরীণ মধ্য দিয়ে অল্প কিছু জল বেয়ে যেতে দিতে হয়; যাতে খালে বিচরণকারী মাছ জল আবদ্ধ করলে টের পেয়ে উক্ত কম জলেতে

বেয়ে উঠে এবং সোজা থুয়ার ছিদ্রপথ দিয়ে বেয়ে উঠা মাছ উপরে যাওয়ার চেষ্টা করলে ফাঁদে আটকে পড়ে। তখন ফাঁদকারী অপর অংশের মুখ খুলে উপুড় করে তুললেই থুয়ার সমস্ত মাছ পেয়ে যায়। বলাবাহুল্য এই প্রনালীতে মাছ ধরা সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে সহজে মাছ ধরে নিতে পারে। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই কার্যতঃ এই প্রনালীতে মাছ ধরে ফেলা সম্ভব হয়। আজকাল এটা লুপ্তপ্রায় এবং এর বয়ন প্রনালীও উত্তরোত্তর মানুষের কাছে অজ্ঞাত রয়ে যায়; তাই এটা নামই শুধু বিরাজমান। ব্যবহারিক দিক দিয়ে খুবই কম ও এর অস্তিত্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলেই পরিলক্ষিত হয়।

ফলমূল এবং শাকসব্জী আহরণ

মৎস শিকার এবং পশুপাখি শিকারের পাশাপাশিই হচ্ছে ফল-মূল এবং শাক সব্জী অন্বেষণ রূপিনীদের খাদ্য আহরণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। এই প্রক্রিয়াকে রূপিনীদের ভাষায় "মুইকীথাং-থাইথাং রখমমা" বলা হয়ে থাকে। তৎকালীন রূপিনীরা কোন কোন ফল-মূল এবং শাকসব্জী অন্বেষণে দৈনন্দিন ব্যতিভ্যস্ত থাকতে হয়, তার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নীচে দেওয়া হল ঃ

শাকসব্জী এবং ফল মূল ঃ প্রাককালে রূপিনীরা শাকসব্জী, ফল মূল অন্বেষন দৈনন্দিন তাদের কাজ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিদিনের খাদ্য ভাত এবং এর কাঁচামাল ধান ঘরে ঘরে মজুতকৃত থাকলেও ভাতের সঙ্গে আনুসঙ্গিক খাদ্য তরিতরকারি শাক-সব্জী, ফল এবং বন্য উৎপাদন নানান জাতীয় আলু, বা গাছের শিকড়, মূল, খাদ্য ভাত এর সঙ্গে অপরিহার্য্য হয়ে উঠে, যেমন ঃ খামখা (বন্যবেগুন), খাখুলু বরক (চালকুমড়া বিশেষ জুমের সব্জী), ককখেলেং (অড়ল), মকদান (মক্কাদানা), মাইছীয় (কাউন), থাইবাই (তৈলবীজ), থাইসুমু (চিংড়া), ডেরামপাই (শসা), কাওক্রা (বন্যকরলা), বাইকাঙ্গ (বন্যসিম), মীরসীবরক (জুম মরিচ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শাক এবং দুগা জাতি খাদ্য শস্যের মধ্যে হচ্ছে যেমন ঃ বাভা (বন্য তুলসী), মুইচেঙ্গ (কাঁটা যুক্ত বন্য পাতা), মুইলাউপান্দা (বন্য মসলা), খুনজরুফাই (জুম ধন্যা), চিচিড়ী (কুচুরি), ছামসটা (থানকুনী পাতা), চিচিড়ি দগা (কমলী শাক), গাখাপাচল (কারটাইস), কানত্রি (গণদুগী), আনতাপী (ছেঁচকি পাতা), মুইয়া (বাঁশের করুল), মিখুন (কলার থোড়), লাইফাও বগিলী(কলা গাছের সুবয়), থরাই (তাড়া) ইত্যাদি শাক এবং দুগা উল্লেখযোগ্য। ফুল জাতীয় খাদ্য শস্যের মধ্যে হচ্ছে যেমন ঃ হাইছিং বীবায় (আদা ফুল), সীতাই বীবায় (হলুদ ফুল), সেজীনা বীবার (সেজনা গাছের ফুল), মিখুমু (গাছা উল), মিখুম হাপলউ (মাইটা উল), আরও অনেক। গাছের মূল বা আলু খাদ্য শষ্যের মধ্যে হচ্ছে, যেমন ঃ থাবলং (রাম আলু), থাকীচাংমা (কাঁচা ভক্ষনযেগ্য আলু), হাইছিং (আদা), সীতাই (হলুদ), দেংকা

থাকীতাঁর (মিষ্টি আলু), গাখা (কারটাইস মূল), বাদল বাঁথা (কচুর মূল), বাদল বাঁলয়ছা (কচুর শিকড়) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মূল বা আলু তৎকালীন খাদ্য শস্য ছিল। আবার কাঁচা ভক্ষনযোগ্য আনুসঙ্গিক খাদ্য হচ্ছে যেমন ঃ থাইকাঁচাক (রক্ত বর্ন বন্য ফল), মালন্দাঁয় (মাঝি লতার ফল), ডেমফল (টক জাতীয় বন্য ফল), থাইসেরেম (নেয়োর গোটা), ইসামবাই (বেতফল), খাঁইচাং (চিকন জাতীয় ডম্বুর ফল), ছিকাম সুনথাৎ (টেকরই), গাও (কাউ), আমলাই (আমলকী), থাইসুমু কুমুন (পাকা চিংড়া) আরও কতকী।

হস্তশিল্প

বর্বরোচিত জীবন যাপন থেকে যখন কিরাত জাতিরা ক্রম বির্বতনের ফলে ধীরে ধীরে সভ্য জীবনে এসে এক পা বাড়ায় তখন তাদের নানা প্রয়োজন বোধ উন্মেষ হয়। এখনকার মত প্রয়োজন হলেই বাজার থেকে ক্রয় করে প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলা এই সুবিধা তৎকালীন ছিল না। কিন্তু কম বেশী প্রয়োজনীতা তখনকার মানুষের মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। ফলতঃ আদি মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজনাদি বাসন-বসন, পোষাক-পরিচ্ছদ বয়ন প্রনালী পরস্পর থেকে শিখে নেওয়ার বাধ্য বাধকতা হয়ে উঠে। এই শেখার ক্রম বিকাশের একটি ধারাই হচ্ছে, আদিবাসীদের হস্ত শিল্পের উদ্ভব। এই হস্ত শিল্পের মাধ্যমে তৎকালীন ছোট ছোট গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীরা, যথা সম্ভব স্বনির্ভরশীলতাকে অবলম্বন করে বসবাস করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাই প্রকটিত হয়ে থাকে। উত্তরোত্তর এই শিল্প বিকাশের ফলনই হচ্ছে হস্ত চর্চার কলা কৌশলে ত্রিপুরা একটি অন্যতম রাজ্য ছিল বলে তদানীন্তন পরিচয় বটে। উত্তরকালে শিল্প উদ্যেগের, এই জোয়ার সাধারণ আদিবাসী প্রজা থেকে আরম্ভ করে উক্ত শিল্প চর্চা রাজ পরিবারে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ত্রিপুরার রাজরাজাড়া থেকে শুরু করে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের শেষ রাজা বীর বিক্রম কিশের মাণিক্য পর্যন্ত সাধারণত শিল্প এবং শিল্পীদের প্রতি অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষক হতে দেখা যায়।

যেহেতু রূপিনীরা তথাকথিত ত্রিবেগ রাজার আদি প্রজা সেইহেতু ত্রিপুরার প্রাকশিল্প চর্চা এবং সমৃদ্ধ সাধনে রূপিনীদের অবদান একেবারে উপেক্ষিত ছিল না। কয়েকটি পৌরাণিক কায়দায় বেতের জিনিষ বয়ন প্রনালী থেকে পরিস্ফুভাবে অনুধাবন করা যায় যে, তাদের এই চর্চা কয়েক শতাব্দী থেকে শুরু হয়নি, এই ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প এসেছে অনেক পূর্ব্ব থেকেই। সংক্ষিপ্তভাবে রূপিনীদের উল্লেখযোগ্য হস্তশিল্প নীচে বিবরণ দেওয়া হল ঃ

নংখাই ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে এই নংখাই সাধারণতঃ বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা অনেক আকারে বেতের বয়ন করা গেলেও

বেশীর ভাগ নংখাই হচ্ছে, যেমন ঃ উচ্চতাই ১৫ ʹʹ বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে ৪১ ʹʹ এবং এর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ১৫ ʹʹ এবং তলদেশের আয়তন হচ্ছে ৮ ʹʹ। এইসব নংখাই এর মধ্যে "নংখাই সিমলা" (যুবতীর খাড়া) মূল ছাঁচ একটু আলাদা; এটা নিপুন কারুকার্যে তৈরী করা হত। উপরিউক্ত নংখাই আকারে কিছুটা ছোট, এবং সরু বেতের বোনা সূক্ষ্ম কলা কৌশলের দ্বারা সম্পন্ন খাড়া বিশেষ। রূপিনী মেয়েরা সাজগুঁজে উক্ত "নংখাই সিখলা" পিঠে ঝুলিয়ে বাজার হাটে যেত। সাধারণতঃ নংখাই তৈরী করতে হলে বিশেষ করে দুলু বাঁশের বেত তুলে নংখাই অর্থাৎ খাড়া বয়ন করতে হলেও, আবার অনেকগুলি স্থানে জালি বেতের প্রয়োজন হয়। উপরি অংশের ব্যাসার্ধকৃত মরি বন্ধনের সময় এবং তলদেশের মরি বন্ধনের সময় জালি বেতের দ্বারা "নংখাই" বয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। বিশেষ করে "নংখাই সিখলা" বয়নের ক্ষেত্রে পৌরাণিক কলা কৌশলের দ্বারা উক্ত নংখাই এর গায়ে নকশা তোলা হয়ে থাকে, এবং নকশাকে রূপিনীদের ভাষায় "রাইসকছেংমা" বলা হয়। এই নিপুন কারু কার্য্যের জন্য "নংখাই" এর গায়ে অনেক ক্ষেত্রে রঙ্গিন সূতাও ব্যবহার করে থাকে। কার্যতঃ এই বয়ন প্রনালীতে প্রথমে কচি দুলু বাঁশের খাপ চিরে আগুনের উত্তাপে কাল রঙ মেখে নিয়ে, একে চিরে বেত তৈরী করতে হয়। তারপর বয়নকারী উর্দ্ধ টানা এবং ব্যাসার্ধকৃত টানা যথাযথ ভাবে ঐ কাল রঙ্গের বেতটিকে সাজিয়ে এবং আড়াআড়িতে বয়ন করে নকশা তুলার কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

সাজানো নংখাই অর্থাৎ নংখাই সিখলা আকারে অনেকটা অনুরূপ হলেও, আয়তনে "নংখাইসিখলা" অপেক্ষা সাধারণ নংখাই কিছুটা বড়। উভয় নংখাই দেখতে অনেকটা তামাক পানের কলকীর ন্যায় - বটে কিন্তু উপরি অংশের বৃত্তকার মরি আয়তনের অপেক্ষা বর্গকৃত তলদেশের আয়তন অনেক কম। এই উভয় অংশের অপেক্ষায় নংখাই এর মধ্য গাত্র আয়তনে অনেক ছোট।

তীয়ছেং বা তৈয়ছেং ঃ তৈয়ছেংটি অনেকাংশে 'নংখাই' এর আকার বিশেষ বড় আয়তন বিশিষ্ট খাড়া। তবে বয়ন প্রনালীতে একটু ভিন্নতর। এই তৈয়ছেং এর কোন কারুকার্য্য ও নকশা উক্ত খাড়ার গাত্রে তোলা হয় না বা তোলা সম্ভব নয়। কেননা জল নিষ্কশনের জন্য তৈয়ছেং এর গায়ে পাতলা ভাবে বয়ন করা হয়ে থাকে। আয়তনের মাপে তৈয়ছেং উচ্চতায় ২০ ʹʹ যথাক্রমে বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে ৪৬ʹʹ এবং ব্যাসার্ধ যেখানে ১৭ ʹʹ এবং তলদেশের আয়তন হচ্ছে যেমন ৮ ʹʹ। রূপিনী মেয়েরা সাধারণতঃ এই তৈয়ছেং দ্বারা জলের কলসী বা জলের চুঙ্গী বহন করার জন্য পিঠে ঝুলনাদির এক ধরনের চুপরি বিশেষ খাড়া। শুধু জল বহন কার্য্যেই সীমিত নয়। এর দ্বারা প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত করা যায়। যেমন ঃ শাকসব্জী, ফল-মূল বহনে, রন্ধনের লাকড়ী

বহনের কাজে, এবং ধান বা খড় বহন কাজে তৈয়ছেং ব্যবহার অতুলনীয় ।

ডিঙগ্রা ঃ এই ডিংগ্রা আকারে তৈয়ছেং সাদৃশ্য হলেও আয়তনের দিক দিয়ে কিছুটা বড় । আবার বয়ন প্রনালীতে নংখাই এর মত ঘন ভাবে বয়ন করতে হয় । কিন্তু কোন নকশা কাটা থাকে না । এর আয়তনের মাপের অনুসারে উচ্চতায় ২১'' এবং বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে ৫২'' এবং ব্যাসার্ধে ১৮'' যথাক্রমে তলদেশে ১২'' । বিশেষ করে এই 'ডিংগ্রা' জুমের কাজে ব্যবহৃত করা হয় । সাধারণতঃ রূপিনী মেয়েরা বাজার-হাটে যাওয়ার সময় এই ডিংগ্রা সচরাচর ব্যবহার করে না । এই ডিংগ্রা নারী পুরুষ সবাই ব্যবহার করতে পারে । ভারী দ্রব্যাদি বহনের কাজে তৈয়ছেং এবং ডিংগ্রাই সাধারণতঃ বেশী ব্যবহার করা হয়ে থাকে ।

খুতুরুক বা খীতরুক ঃ প্রাককালে যখন রূপিনীরা কোন কাঠের সিন্দুক এবং ট্রাঙ ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল । তখন এই "খুতুরুক" বা "খুতীরুক" সাধারনত সিন্দুক এবং ট্রাঙ্ক এর বিকল্প হিসাবে মিটিয়ে নিত । আঁকারে ইহা অনেকাংশে নংখাই সিখলা ন্যায় নিপুন কলা কৌশলে বয়নাদির চুপড়ি বা খাড়া বিশেষ, রঙিন সূতার দ্বারা নকশা তোলা এক সৌখিন দ্রব্য । এর প্রচলিত আয়তনের মাপ হচ্ছে যেমন উচ্চতায় ১৫'' , বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে ৪১'' যথাক্রমে ব্যাসার্ধ ১৫'' এবং তলদেশে আয়তন হচ্ছে যেমন ৮'' । এই খুতুরুক বয়ন প্রনালীতে "নংখাই সিখলা" বয়ন প্রনালীতে কোন পার্থক্য নেই এবং এইটুকু পার্থক্য যে, নংখাই সিখলার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের বয়নাদির ঢাকনা নেই কিন্তু খুতুরুকের একটি ঢাকনা আছে ।

চেম্পাই ঃ এটা নংখাই এর আকার বিশিষ্ট একটি ছোট খাড়া । কিন্তু আয়তনে অনেকাংশে ছোট হলেও নিপুন কার্য্য বেতের দ্বারা সম্পন্ন কাঁধে ঝুলানাদি খুপরী । এই চেম্পাইতে পুরে জুম ক্ষেত্রে যাওয়ার সময় ভাত মোচা এবং ছোট খাতু কৃষি সরঞ্জাম বহন করে নিয়ে যাওয়া হত ।

খকতে ঃ এটা শুধু কাঁধে ঝুলনাদি বর্গাকৃতি থলি । উপরি উক্ত নংখাই জাতীয় খুপরী মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারে থলি । এই থলি বিশেষ করে ভারি জিনিষ বহন করা হত না, এবং শুধু বীজ জাতীয় জিনিষ বহন করে জুম ক্ষেত্রে রোপন করা হয়ে থাকে । এই থলিতে বীজ রেখে রোপন অভিযান চালালে, তৎপরতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করে নিতে পারে । জুমে বীজ বোপনের সময় "খকতে" জাতীয় থলি অত্যাবশ্যক ।

বাইলিং ঃ রূপিনীদের চলতি বাইলিং বা বাইলেং বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে যেমন ৩৮´´ এবং ব্যাসার্ধ ২১´´। এটা অনেকটা ভোজনের থালাকৃত; ভারি বেতের বয়নাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। বৃত্তের আকারে শক্ত কাঠাম গড়ে তোলার জন্য আস্তা জালি বেঁতে ঘিরে মরি বন্ধনের বয়ন করা, এক নিপুন কলা কৌশলের দ্বারা সম্পন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন।

সুছেং বা সুরছেং ঃ এটাও পাতলা বয়নের বাসন বিশিষ্ট প্রাক্‌কালের শাক সব্জী ধোয়া এবং জিনিষ পত্র রাখার বেতের ঝুড়ি। এই প্রকার সুছেং বর্গকৃত এবং বৃত্তকৃত উভয় আকারের তৈরী হয়। এই বৃত্তকৃত 'সুছেং' এর মাপ হচ্ছে যেমন বৃত্তের ব্যাস ৬০´´ এবং ব্যাসার্ধের মাপ হচ্ছে যেমন ১৮´´।

খুমচারী ঃ আবার এই সুছেংকেই যদি আরও ছোট আকরে পরিনত করে এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সহকারে মরি ভেঙ্গে বৃত্তাকারে বয়ন করা হয়। তখন একে "খুমচারী" হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খুমচারী অর্থাৎ ফুলতোলার সাজি হাতে বোনার জন্য সরু জালি বেতের ঝুলানাদি এঁটে দেওয়া হয়। কিন্তু "সুছেং" এ সাধারনত তা থাকে না।

চামরাঁই খুমবাউ ঃ সংক্ষিপ্ত বেতের শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম এবং জটিল বয়ন প্রণালী। প্রাককালের রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ "চামরাঁই খুমবাউ" বয়নের ক্ষমতা এবং আরও কয়েকটি পরিক্ষা-নিরীক্ষা করে নুতন ঘর জামাতার গুণাগুণ এবং কর্মক্ষমতা নির্ধারণ করে থাকে।

স্বহস্তে বয়নাদি ঐ "চামরাঁই খুমবাউ" এর থলিতে কয়েকটি ফুল গুজে প্রতিদিন প্রাতে শ্বশুড়-শাশুড়ীর প্রতি দুহাত জোড়ে ভক্তি নিবেদন করতে পারলে, নুতন জামাতার সুক্ষ্ম শিল্পাদির ক্ষমতা এবং কৃতিত্ব একটু স্বতন্ত্র ভাবেই দেখা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ চামরাঁই খুমবাউ বয়নের ক্ষমতা যার আছে কৃষিকার্য্য বা খেটে খাওয়ার জীবনে সে কোন দিনই আটকাবে না। তথাকথিত এই নিগূঢ় সত্যতাকে দৃষ্টান্ত সহকারে দেখার জন্য নুতন জামাতা বা জামাতার প্রার্থীকে শ্বশুড়-শাশুড়ী দ্বারা বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এই কর্ম ক্ষমতার পরিক্ষা নীরিক্ষার সময়কে রূপিনীদের ভাষায় "তাঙসন তীয়সন জরা" বলে অভিহিত করা হয়। এইসব পরীক্ষারই একটি অংশের দুইটি গুণাগুণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া হচ্ছে যেমন - চামরাঁইখুমবাউ বয়নের ক্ষমতা অর্থাৎ কর্মক্ষমতা, তার পাশাপাশি ভক্তিবৎ। এইসব বহুমুখী পরিক্ষা নীরিক্ষা উত্তীর্ণ হলে নুতন জামাতা বা জামাই প্রার্থীর উপর পূর্ণ আস্থা জমে উঠে যে, তার মেয়ের ভরণ পোষনের ভার উক্ত ব্যক্তির কাছে তুলে দিতে কোন দ্বিধা বোধ

থাকে না। ছয় আঙ্গুলে পুরে ধরার ছয়টি আংটা বিশিষ্ট ধুপতি আকারের সূক্ষ্ম এবং নিপুন কলাকৌশলে চিকন বেতে বয়নাদি হাতের শিল্পই হচ্ছে রূপিনীদের এই "চামরী খুমবাউ" । সাধারণত "চামরী খুমবাউ' এর বৃত্ত আকারের ফুল রাখার থলিটি আয়তন যথাক্রমে বৃত্তের ব্যাস ১৪'' এবং এর ব্যসার্ধের থলিটি আয়তন যথাক্রমে বৃত্তের ব্যাস ১৪'' এবং এর ব্যাসার্ধের মাপ ৫''। এই ছয়টি আংটা সাধারনত সব বয়সের আঙ্গুলের মাপ অনুসারে বয়ন করা হয়ে থাকে। এই চামরী খুমবাউটি লম্বালম্বি মাপে ৬'' হবে।

রূপিনীদের মধ্যে যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করছে এবং যারা এখনো আদিম বেতের শিল্পের প্রনালীকে সংরক্ষণ করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাদের কাছেই ঐ চামরীউ খুমবাউ বয়নের সূত্র পেতে পারে; অর্থাৎ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিবিধ হস্তশিল্প ঃ বেতের বয়নাদি হস্তশিল্পের মধ্যে আরও কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাতের শিল্প খেলার ছলে কিংবা ঘর সাজার জন্য তৈরী করা হয়ে থাকে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদি হচ্ছে যেমন ঃ "চামরাইমাউপাউ" সিনচৎতরায়, চামরাইহমচাম, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কোন একটির অনুকরণে বেতে শিল্প বয়নাদি গৃহসাজ দ্রব্যাদি হচ্ছে যেমন ঃ জংকীরা (ব্যাঙ), তউছা (পাখি), মাকখীরা (বানর), মায়ুং (হাতী) করায় (ঘোড়া) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কাষ্ঠশিল্প ঃ রূপিনীদের মধ্যে কাষ্ঠ শিল্পটি বেতের শিল্পের পরেই উদ্ভব হয় বলে বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা যায়। কিন্তু অনেক রূপ কথায় কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যের কথা উল্লেখিত পাওয়া যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার অনেকের অভিমত বস্ত্রশিল্প সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের নির্মিত দ্রব্যাদি কিছু কিছু উদ্ভব হয় বলে মত পোষন করেন। তাদের বলিষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে সূতা, কাটার সরঞ্জাম 'চরখী' অর্থাৎ চরকা অতি পৌরাণিক রূপিনী তথা সমগ্র আদিবাসীদের সূতা কাটার সরঞ্জাম। উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে কাঠ ছাড়া চরকা নির্মানের মত উপযোগী শক্ত পদার্থ অন্য কোন বিকল্প তৎকালে নেই বলে আরও অভিমত পোষন করে থাকেন।

যাই বলুক না কেন, কাঠের কাজ এবং বেতের কাজ কার্যতঃ লৌহার নির্মিত ধারালো অস্ত্র ছাড়া কাটা ছেঁড়া শুধু অলৌকিক নয় তা অবান্তরও বটে। তাই বলতে বাধ্য হয় যে সমগ্র কিরাত জাতির মধ্যে যখন লোহা ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং তখনেই কাষ্ঠ কিংবা বেতের শিল্পের চর্চা উদ্ভব হয় বলে ঐতিহাসিক সূত্র থেকে অনুধাবন করা যায়। তাই কাঠের কাজ কিংবা বেতের কাজ উভয় শিল্পের বির্বতন সমসাময়িক ভাবেই গড়ে উঠেছিল, বলে একান্ত ধারনা। কেননা, বেতের বয়নের থলিতে চিরসত্য এবং মানব

জাতির অপরিহার্য্য পানীয় পদার্থ আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। ঐ জন্য জলের মত তরল পদার্থকে জমিয়ে আবদ্ধ করে রাখতে হলে চাই কাষ্ঠ নির্মিত ঘনাক্ত পদার্থের পাত্র বা বাসন। প্রাককালে রূপিনীদের মধ্যে শুধু জল রাখার জন্যই প্রথম বড় আকাড়ে কাষ্ঠ নির্মিত বাসন তৈরী উদ্ভব হয় বলে জানা যায়; এরপর উত্তরোত্তর সত্যতা বিকাশের ফলে মানুষের চাহিদারও বিবর্তন ঘটে এবং কাষ্ঠ নির্মিত কয়েকটি সরঞ্জাম অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। (রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে রেত শিল্প এবং কাষ্ঠ শিল্পের পারদর্শী সম্প্রদায়কে "সূতার পাঞ্চি" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে এই বিষয়ে পরে পর্যালোচনা হবে।) এইসব কাষ্ঠ নির্মিত কয়েকটি দ্রব্যাদির নীচে বিবরণ দেওয়া হল ঃ

দাংকায় ঃ ইহা সাধাসিধা কাঠের গড়া বৃহৎ আকরের জল রাখার পাত্র বিশিষ্ট নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সাধারন ভাবে প্রচলিত মাপ অনুসারে এর উচ্চতায় ৬´´ আবার ব্যাসার্ধে ২২´´ হয়ে থাকে। জল রাখা ছাড়াও প্রাককালে এই দাংকায় একাধিক কাজে ব্যবহৃত হত। যেমন শিশুর স্নান, কাপড় ধোয়া-কাছা প্রয়োজন অনুসারে অনেক কিছুই রাখা যায়।

চরখী ঃ ইহা রূপিনীদের প্রাচীনতম কাঠে নির্মিত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম এবং বস্ত্রশিল্পের অপরিহার্য্য যন্ত্রাদি। এই যন্ত্র অনেকটা হস্তচালিত, ঝাঁতাকল বিশেষ ছোট একটি ঘুর্নী যন্ত্র। পেশ করানা দুইটি শক্ত কাঠের ঢালকে পেশের খাঁপে খাপ মিলিয়ে সমান্তরাল ভাবে দন্ডায়মান দুইটি পালির মধ্যে ছিদ্র করে আটকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দুইটি কাটানো দণ্ডের একটিকে ঘোরানোর জন্য বাঁকা হাতল সংযোগ করা থাকে যাতে ঐ হাতলটি ঘুরালেই পেশের খাঁপে খাঁপে ঘষিয়ে অপর দণ্ডটিও ঘুরবে। এই যন্ত্রের ঘর্ষনে কার্পাস থেকে বীজ নিষ্কাষন করে তুলা উৎপন্ন করা হয়। "করলী" গাছ দিয়ে সাধারণতঃ "চরখী" তৈরী করা হয়।

চরখা ঃ দুইটি চাক্কী বিশিষ্ট কাঠের তৈরী সূতা কাটার ঘুর্ণী যন্ত্রকে রূপিনীদের ভাষায় "চরখা" বলা হয়ে থাকে। চর্কার বিকৃত উচ্চারণেই সম্ভবত "চরখা" শব্দটি নিষ্পন্ন হয় বলে অনুমান করা যেতে পারে এবং অবশ্যই এই শব্দ ভারতের পৌরাণিক ভাষা থেকেই রপ্ত হয়েছিল তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। আকার এবং আয়তনের রূপিনীদের চরখা সঙ্গে সমতল বাসীর চর্কা কিছু কিছু হেরফের হলেও মূল ছাঁচটি অভিন্ন। তাই এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। "খীমফাক" নামক গাছ দ্বারা ঐ চরখা অর্থাৎ চাক্কাটি তৈরী করা হয়। উক্ত গাছটি এমনি পদার্থ যে ফেটে যাবে কিন্তু ঘর্ষনে

ক্ষয় প্রাপ্ত হবে না। তাই কেবল "চরখা" নির্মান করার জন্যই উক্ত গাছকে বনভূমি থেকে খুঁজে বের করে এর সরঞ্জামের কাজে ব্যবহার করতে হয়।

বিভিন্ন কাজে কাঠের ব্যবহার ঃ উপরি উক্ত যন্ত্রপাতি ছাড়াও বাদ্যযন্ত্র এবং গৃহের অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম হিসাবে প্রাককালে কাঠের ব্যবহার ছিল। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঠের শিল্পতে গড়া নীচে কয়েকটি নাম দেওয়া হল; যেমন ঃ রূপিনীদের প্রাককালে অন্যতম কলা কৌশলের সঙ্গে গড়া কাঠের শিল্প হচ্ছে চঙপ্রেং (চরিতার বিশিষ্ট বাদ্য), সারেঙ্গা (বেহালা আকারের বাদ্য), খাম (দোলক জাতীয় বাদ্য)। গৃহের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মধ্যে হচ্ছে রিসাম-রম (গাইল-চেড়), খামফীলাই (পীড়া) এবং ঘর নির্মাণের যাবতীয় সরঞ্জাম। তাছাড়া হাতে বোনা তাঁতের সরঞ্জাম এবং কৃষি কার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঠের তৈরী অনেক কিছু প্রয়োজন হয়ে থাকে।

হস্তবয়ন শিল্প

হস্ত শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম শিল্প হচ্ছে, ত্রিপুরার নিপুন কারুকার্য্যে সম্পন্ন হাতের বোনা বস্ত্রশিল্প। রাজরাজাদের আমল থেকেই ত্রিবেগ তথা ত্রিপরা রাজ্যে বস্ত্র শিল্পে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এইসব প্রাচীনতম রাজাদের মধ্যে সুবরাই রাজা, হরফে ত্রিলোচন নাকি শিল্পের উপর অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং শিল্প প্রসারের জন্য তাঁর অবদান অপরিসীম কৃতিত্ব ছিলেন। প্রাককালে এইসব রাজরাজাদের শিল্পের প্রতি অনুরাগ এবং তার প্রসারের জন্য সদা সচেষ্ট থাকাতেন, ফলে উত্তরকালে এইসব হস্তশিল্প আরও সমৃদ্ধতর হয়ে উঠে। এইইব শিল্প চর্চায় আত্মহুতি দিয়েছিলেন, সেই দিন আর কেউ নয় তিপরার অপরিসর আঙিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীরা। বস্তুত ত্রিপুরার আদিবাসীদের জীবন ধারা সম্পর্কে অন্যান্য জাতির কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেলেও, কমপক্ষে তাদের শিল্পের দক্ষতা সুনাম অর্ন্তদেশীয় সীমা লঙ্ঘন করে দেশ বিদেশে সাড়া পড়ে যায়। তখনকার এইসব শিল্প চর্চায় বিশেষ করে যারা আত্মহুতি দিয়েছিলেন এইসব গোষ্ঠীদের মধ্যে হচ্ছে যেমন ঃ লালাং, তেয়া, উায়া, রূপিনী, লাংগাই, সাকাচেবখামাচেব, জমাতিয়া এবং তিপরা বিভিন্ন অংশের গোষ্ঠীরা। হালাম এবং কুকিদের মধ্যে এই শিল্পের ঢেউ কিছু পরেই এসেছিল। তাই তাদের আদি পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে উপরি উক্ত গোষ্ঠীদের আদি পোষাক পরিচ্ছদ মিল ছিল না। যাইহোক প্রাচীণ বয়ণ শিল্প চর্চাকারী গোষ্ঠীর মধ্যে রূপিনীরা সন্নিহিত আছে বটে তবে তাদের হাতের বোনা তাঁতে কতটুকু দখলাদি আছে তা নীচে দেওয়া হল ঃ

রিগীনাই ঃ ইহা রূপিনী মেয়েদের মুখ্য পরিচ্ছদ এবং জাতীয় পোষাক। প্রচলিত রিগীনাই সাধারনত লম্বালম্বি ৫´ এবং প্রস্থ বা বহরে ৪´.৬´´ হয়ে থাকে। এই রিগীনাই অনেকে রূপিনরদের মধ্যে "ইকীনাই"ও বলে থাকে। রিগীনাই কিংবা ইকীনাই ত্রিপুরার সমগ্র আদিবাসীদের নিম্নাঙ্গের পরিধান হলেও কারুকার্য এবং নকশা তোলার ক্ষেত্রে একটি গোষ্ঠীর 'ইকীনাই'এর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর কিছু কিছু বিসাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে ইকীনাই এর প্যাড় জুড়ে নকশা তোলার কাজে বিভিন্ন আদিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন কলাকৌশলে কাজ করা থাকে। তাকে "রিনীনাই" বা "ইকীনাই বাঁথাই" বলা হয়। রূপিনী গোষ্ঠীদের এই ইকীনাই বাঁথাই কয়েক প্রকারে ভাগ করা যায়। যেমন 'মায়র্তাইখাতাম, খামতামুক, কুচুকীনা, তাখুমবাঁতুয়, বুমুর ককই, থামফায়মা বাঁক্রাঙ, খেনচি ইত্যাদি। প্রাককালে রূপিনীদের ইকীনাই কেবল ত্রিরঙ্গে ব্যবহার হত। এইসব রং হচ্ছে সাদা, কাল এবং লাল; সাদার কোন রঙ ব্যবহার করতে হত না কেননা তুলার রং ধরেই বস্ত্রের রঙ হয়ে থাকে সাদা। কিন্তু লাল এবং কাল রঙের বস্ত্র তৈরীতে কিছুটা শ্রম সাপেক্ষ। যেমন ঃ লাল রঙের ঔষুধের জন্য বনভূমি থেকে 'আশুল' গাছের মূল কুড়িয়ে নিয়ে তাকে ছেঁটে সূতা এবং খার দিয়ে পাত্রতে সিদ্ধ করে নিতে হয়। তারপর কিছুক্ষন সিদ্ধ হয়ে উঠলে ঐ সূতাকে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর উক্ত সূতাকে হস্তচালিত তাঁতে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করলে লাল বস্ত্র তৈরী হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত যে প্রনালীতে সূতার রঙ তুলা হয় ঠিক তদরূপ কাল বস্ত্র তৈরী করতে হয়; শুধু এতটুকুই ভিন্ন যে কাল গাছ জুমে উৎপাদন করতে হয় এবং এই গাছের শিকড় নয় পাতা হচ্ছে কাল রঙের অপরিহার্য্য কাঁচা মাল। আজকাল বাজারে প্রস্তুত করা রঙ বেরঙের সূতা সহজ লভ্যতার জন্য নব্য রূপিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এইসব প্রাচীন প্রনালীতে বন্য ঔষধারঙের সাহায্যে বস্ত্রের রঙ তুলা বিলুপ্ত প্রায়।

ইছা বা রিছা ঃ নিপুন কারুকার্যতে বয়ন সরু, এবং লম্বা আকারে বস্ত্র বিশেষ হচ্ছে রিছার বা ইছা। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৫১´´ এবং প্রস্থ বা বহর হচ্ছে ৮´´। সাধারনত প্রচলিত 'ইছা' এই আয়তনের মধ্যে বেশী হয়ে থাকে। ইকীনাই ইছা এই দুইটি বস্ত্রই রূপিনী মেয়েদের প্রাকালের মূল পরিধান, এবং তার মধ্যে 'ইছা' হচ্ছে রূপিনী মেয়েদের একমাত্র বুকের আচ্ছাদন। বিভিন্ন কলা কৌশলের প্রয়োগ করে, তৎকালীন হাতের বয়নের দ্বারা এই সংকীর্ণ বস্ত্রটিকে সূক্ষ্ম নকশার কাজে সেজে নিত। যেমন কোন কোন "ইছার" ক্ষেত্রে সমান্তরাল ভাবে লম্বালম্বি পাড় জুড়ে নকশা কাটা। আবার কোন কোন 'রিছা' বা 'ইছা' প্রস্থ জুড়ে নকশা তুলা থাকে। এইসব কলা এবং নকশার নাম হচ্ছে যেমন ঃ মাঁফুখিতুং, রাঙলুং, জঙকতক সিখলা, সর্ববংকী, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাককালে

ইকীনাই মত 'ইছা'ও কেবল ত্রিরঙ্গেই সুলভ্য। কেননা রকমারী রঙ তৈরী করার মত কলা কৌশল তখনকার দিনের ব্যক্তিরা অজ্ঞ ছিল। রঙ্গীন যুগসন্ধির সঙ্গে সঙ্গেই রূপিনীদের পোষাক-পরিচ্ছদও বিভিন্ন রঙ-বেরঙের বস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায় এবং প্রাককালের প্রনালীর ন্যায় ত্রিরঙেই শুধু সীমিত থাকেনি।

পক্রী ঃ এই 'পক্রী' আকারে অনেকটা ইছার ন্যায় এবং শিরত্রান বিশিষ্ট পাগড়ী। বিশেষ করে কোন কিছু মাথায় বহনের জন্য; আবার জুমে কাজের সময় রূপিনীরা পক্রী ব্যবহার করে থাকে। সাধারনত পক্রীতে নকশা তোলা থাকে না। আবার ইহা কাল রঙেই বেশী বয়ন করা হয়ে থাকে। তবে প্রস্থের পাড়ে দুই অংশে দুইটি বেনীর আকরে মোটা সূতা দিয়ে বুনে দেওয়া হয়। এটাই একটি নকশা এবং পাড় এর সূতাকে মজবুত করে আঁকড়ে রাখে।

বীরকি ঃ ইহা সাধারনত কম্বল বিশিষ্ট কাঁচা সূতা এবং মোটা আকারের সূতাতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বীরকির গায়ে কোন নকশা কাটা থাকে না। সাধা সিধা কাল রঙের সূতা উৎপন্ন করে, ঐ বস্ত্রটি বিস্তৃত আকারে বয়ন করা হয়ে থাকে।প্রচলিত বীকির আয়তন হচ্ছে যেমন দৈর্ঘ্য ৯´ এবং প্রস্থ হচ্ছে ৭´। এর মধ্যেও আবার ছোট, বড় আকার গঠন করা বয়নকারীর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে থাকে। বিশেষ করে এইসব বস্ত্র শয়নে ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় এবং যখন লেপ, কম্বল বাজারে সহজলভ্য ছিল না তখন উক্ত 'বীরকির' সাহায্যেই শীতকালের শয়ন মিটিয়ে নিতে হয়।

নব্য রূপিনী গোষ্ঠীর কাছে এইসব প্রাচীন বস্ত্র দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার পাশাপাশি বয়নের প্রনালীও চর্চার অভাবে উত্তরোত্তর বিস্মৃতির কবলে তলিয়ে যায়।

ইত্রাক ঃ এটা বীকির চেয়ে একটু ছোট আকারে সাধা সিধা হস্ত তাঁতের বয়নাদি বস্ত্র। সাধারনত এই বস্ত্রের গায়ে কোন নকশা তুলা থাকে না। বেশীরভাগ ইত্রাকের রঙ সাদা সূতার দ্বারা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে এইসব বস্ত্রাদি গৃহের বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই বয়ন করা হয়ে থাকে। প্রচলিত ইত্রাকের আয়তন হচ্ছে যেমন ৭´ এবং প্রস্থ হচ্ছে ৫´। আজকাল অবশ্য রঙবেরঙের বাজারের সূতা সহজলভ্যতার জন্য এইসব ইত্রাক চিত্রা আকারও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

বাছেক ঃ সাধারনত এই বাছেক ইত্রাক থেকে আকারে একটু ছোট এবং ইছা থেকে অনেকগুণে বড় আয়তন বিশিষ্ট ভারী বস্ত্র। বিশেষ করে এইসব বস্ত্র বাচ্চা পিঠে ঝুলানোর জন্যই প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

কাটারীয়রাইসু ঃ দক্ষ বয়নকারী বা এইসব বস্ত্র নকশা সমেত নিপুন কলা কৌশলের দ্বারা বয়ন করে নিয়ে তারপর ঐ বস্ত্র দিয়ে পুরুষদের কামিজ তৈরী করা হত। এই কামিজের সম্মুখের অংশটি সাধারনত নাভি পর্যন্ত কাটা থাকে, এবং দুইটি দুই দিকে থলি বা পকেট ঝুলিয়ে নেওয়া হয়। আবার পৃষ্ঠদেশে নিতম্ব পর্যন্ত কামিজের তলদেশের আবৃত থাকে। এই পিঠের অংশের প্যাড় মধ্যে নকশা তুলে বয়ন করা হয়। আবার তলের প্যাড়ে ঝুলানো অবশিষ্টাংশ সূতাটিকে, মুচড়িয়ে অসংখ্য লেজ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং তাতে পাড়ের সূতাও সরে যাওয়া থেকে আবদ্ধ হয়। অবার প্যাড়ের একটু উপরিভাগে দড়ির মত সূতা দিয়ে বেনী বন্ধনের মত সমান্তরালভাবে বয়ন করে, নকশার মত সাজিয়ে দেওয়া থাকে। সাধারনত এইসব সাদা রঙের তৈরী করা হলেও নকশা কাটার প্যাড় লাল এবং কালতে সাজানো হয়।

এইসব কামিজ রূপিনীদের মধ্যে বর্তমান শতাব্দির আগেই ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেললেও শুধু কাজের সময় এইসব পোষাক সচরাচর ব্যহার হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এইসব কামিজ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এবং ঘরে ঘরে কিছু না কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছে। অন্যদিকে নব জাগ্রত রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে এইসব আদিম বস্ত্রাদির, বেশ-ভূষা ধীরে, ধীরে তাচ্ছিল্য হয়ে গিয়ে আধুনীক পোষাক পরিচ্ছদকে, একাত্ম করে নিতে লক্ষ্য করা যায়। এতে তাদের নিজস্ব দ্রব্যাদি এবং বস্ত্রাদির সমূহ উত্তরেত্তর হারিয়ে ফেললেও মেয়েদের বেশভূষার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদি ঘেষা এখনো রয়ে যায়; তাও আধুনীক ধাঁচে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক প্রথা এবং অবলম্বন

প্রাককালে রূপিনীরা প্রথার উপর ভিত্তি করেই জীবন নির্ব্বাহের কালযাপনে আত্মহুতি দিয়ে এসেছিল; যে সময় ছিল না লিখিত সংবিধানের নির্ধারিত নীতি, যেখানে ছিল না শর্তে আরোপিত বৈজ্ঞানীক যুক্তি এবং ন্যায় ধর্মের বানী। বাক প্রয়োগ, বসবাস, যাত্রা,

পান, আহার থেকে শুরু করে সামাজিক নিয়ম বিধি পর্যন্ত এই লোক প্রচলিত প্রথার দ্বারাই সেকালের ব্যক্তিরা জীবনব্যাপী উৎসর্গ করে যায়। শুধু এতটুকই তারতম্য ছিল যে কোন কোন প্রথার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রশাসনের দ্বারা বিধি নিষেধ ছিল। এইসব অবাধ প্রথাকে সীমিতের গণ্ডীতে আবদ্ধ করে সমাজের মঙ্গলার্থে বারণ এবং প্রসারিত করণ তৎকালীন প্রবীন এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সুচিন্তারই একটি ফসল স্বরূপ বলা যেতে পারে।

প্রাককালে রূপিনীদের সমাজ ব্যবস্থা ঃ

প্রাককালে রূপিনীদের সমাজ ব্যবস্থায় লোক প্রথার ধারাকে ভিত্তি করে গঠিত একটি পরিষদ অস্তিত্ব ছিল। সমাজের শাসন ব্যবস্থা আইন বা প্রথা প্রনয়ন এবং বিচার ব্যবস্থা ঐ পরিষদ বর্গের হাতেই ন্যাস্ত থাকত। বস্তুতঃ তৎকালীন রাজরা থেকে দুরদুরান্তে উপনিবিষ্ট হওয়াতে গোটা রূপিনী সমাজকে উক্ত পরিষদের সভ্যরাই পরিচালিত করত। ভূপতি ত্রিপুরেশ্বরের অনুমোদনক্রমেই সম্ভবতঃ, এইসব সমাজ কাঠামোর জন্য পরিষদ ধার্য্য করা হয় বলে অনুধাবন করা যেতে পারে। কেননা তৎকালীন রূপিনীরা তিপরা বা ত্রিপুরার ভূ-অংশে বসবাস করত বলে বিশেষ সূত্র থেকে জানা যায়।

পরিষদ গঠনের পদ্ধতি ঃ

রূপিনীদের হালাম অন্তভুর্ক্তির পূর্ব্বের সমাজ ব্যবস্থা এবং হালাম অন্তর্ভুক্তির পর কিছুটা সামঞ্জস্য থাকলেও শুধু এই পার্থক্য ছিল যে জুলাই হচ্ছে রাণীর প্রজা এবং পরে গঠিত হালাম হচ্ছে রাজার প্রজা। সম্ভবতঃ ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম ভাগে রূপিনীরা যখন মায়ানী হালুং এর উপনিবেশের সময় প্রথম এই সমাজ গঠনতন্ত্র বা কাঠামো সূচনা হয় বলে লোক প্রচলিত ইতিহাস ইঙ্গিত হতে অবতারনা করা যায়। এর পূর্ব্বে রূপিনীদের সমাজ ব্যবস্থা কি ছিল, তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য। উক্ত গোষ্ঠীর আদিম প্রনালীতে পরিষদ গঠনতন্ত্র নীচে দেওয়া হল।

প্রাককালের প্রথা অবলম্বনে সমাজ শাসনের কাঠামোকে দৃঢ় করে গড়ে তোলার পরিকল্পনায় ১০ সভ্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠন করা হয়। শাসনের দ্বারা তখনকার সমাজকে সুপথে পরিচালিত করে সমাজজীবি ব্যক্তির পরস্পরের প্রীতি ও মৈত্রীয় বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য ঐ পরিষদবর্গ সমাজের মানুষের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। এইসব পরিষদের সভ্য যেমন ঃ মুখ্য সভ্য এবং প্রকান্তরে রূপিনী গোষ্টীর রাজা কামছিকাউ তাঁর মনপূত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি য়াকসুং খুকসুঙ পদে নির্বাচন করা হয়ে থাকে; তারাও মুখ্য সভ্য হিসাবে কামছিকাউ এর পাশে আসন পায়। এর পরের পদটি হচ্ছে "কালেম", "কাবুল", "চাঁপিয়াকতর চাঁপিয়াকুসু, খানদল, সেংজাকীরাগ এবং সেংজাকীসু। সমাজ সংস্কারে সদা

সতর্ক এবং বিচক্ষন ব্যকিতরাই সাধারনত প্রথমে সেংজা কীসুপদে নিযুক্ত হলে, ধাপে ধাপে ক্রম পদ উন্নতি হয়ে চুরান্ত অভিসিক্তধার 'কামছিকাউ' এর পদে আসীন হয়ে থাকেন। ৮-১০ বৎসর অন্তর অন্তর ঐ পরিষদবর্গ পুনর্গঠন হতে হয় এবং কামছিকাউ অবসর গ্রহণ করলে তাঁর পশ্চাদগামী কালেম, কামছিকাউ এর পদে নিয়োগ হয়ে থাকেন। এইভাবে ধাপে ধাপে শুন্যে পদে উত্তীর্ণ হয়ে এসে একদিন সব সভ্যই কামছিকাউ এর পদে আসতে পারেন। প্রাক্তন কামছিকাউকে তখন রূপিনীদের ভাষায় 'কামছিকাউ বুরা' বলা হত। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ না হতেই কামছিকাউ বা কোন সভ্যের মৃত্যু বা পদত্যাগ করলে ত্বরায় ঐ পরিষদ পুনর্গঠন করে নিতে হত। আবার কোন সভ্যের অসাধু অবলম্বেনের জন্য তখনকার সমাজ সচেতন ব্যক্তির উক্ত সভ্যকে অপসারন না, হয়, পদ উন্নতি বন্দ করে দেওয়া হত।

ক্ষমতার পরিধি ঃ কামছিকাউ হচ্ছে তৎকালীন রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বেসর্বা প্রকান্তরে রাজার প্রতিবিম্বও বলা চলে। কার্যতঃ অন্যান্য সভ্য এবং বসতিবাসীরা কোন বিষয়ে সম্পাদন এবং নিস্পত্তি করতে হলে ঐ কামছিকাউ এর অনুমোদন সাপেক্ষিত, অন্যথায় এইসব বিষয় আপত্তি রয়ে যাবে। পরিষদ পরিচালনা ছাড়াও আচার অনুষ্ঠান তাঁর নিকটস্থ বসতি বাসীদের পরামর্শদান এবা নিরাক্রম সব কিছুউ ঐ কামছিকাউ এর অন্যতম ভূমিকা নিতে হতো। রূপিনীদের মধ্যে প্রাককালের প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য ছিল তা হচ্ছে কামছিকাউ নকদক নকবুকড়িদক অর্থাৎ তথাকথিত অনুসারে কামছিকাউ এর অধিনস্থ ১২৬টি পরিবার নিয়ে একটি বসতি গড়ে উঠার প্রচলিত ছিল। একে 'বুঙ বা কামি' বলা হত। এইভাবে নির্ধারিত বসতির সীমা জুড়ে উক্ত কামছিকাউ ক্ষমতা বলবৎ করে থাকেন। কিন্তু উত্তরকালে অর্থাৎ গোটা রূপিনী গোষ্ঠীকে "জুলাই জাতি" বলে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে একশত পরিবারের নীচে বসতি গড়ার জন্য তিপরা মহারাজাদের দ্বারা এইরূপ একটি নির্দেশ জারী ছিলো। বলাবাহুল্য রূপিনী গোষ্ঠীরা যদি ১২৬ পরিবার বসতি গড়ে একযোগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, প্রাকালের মত পুনরায় রাজার প্রতি কিছু একটা অঘটন করে ফেলে, তারজন্য সদা সংশয় ছিল বটে; তাই তিপরার রাজারা উদ্দেশ্যে প্রনোদিতভাবে রূপিনী গোষ্ঠীর বসতি গড়ার সীমিত করণের আদেশজারী করে থাকেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলতঃ বৎসরান্তে কানসুমারী অর্থাৎ কর রানীকে বুঝাতে হলে তখনকার নিয়মানুসারেই কামছিকাউয়ের অধিনস্থ কেবল ১০০নিচের পরিবার হিসাবেই প্রদান করে থাকেন। সময়ান্তে জুলাই রূপিনী বসতির কানসুমারী সংগ্রহের আদেশ প্রদান এবং উক্ত কর রানীকে তুলে দেওয়ার সময় রানী বা তাঁর অনুরুক্ত (খানসামা) সঙ্গে গোটা রূপিনীদের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং কোন বিষয়ে নিস্পত্তি ইত্যাদি কামছিকাউ এর প্রতিনিধিরা সম্পন্ন করে নিতে হতেন। কালেম হচ্ছে পরিষদবর্গের অন্যতম সভ্য এবং

কামছিকাউ এর সম্পাদক ও মন্ত্রনাদাতা। কোন কিছুর সমস্যা উত্থাপন হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচারাদির নিষ্পত্তি আপত্তি তিনিঁই কেবল কামছিকাউ এর কাছে উপস্থাপন করতে পারতেন। বিশেষ করে কালেম এর বিচার বিশ্লেষন শুনানীর উপর ভিত্তি করেঁই কোন ব্যক্তির শাস্তি শীথিলতা, কঠোরতা নির্ভর করে থাকে। তাছাড়া বসতির ঘর ঘর থেকে চাঁদা আদায় করে বৎসরান্তে রানীর কাছে কানসুমারী অর্থাৎ কর প্রদানের জন্য প্রস্তুতি এবং আচার অনুষ্ঠানে যথা রীতিতে চলছে কিনা এর তদারকি করণ ইত্যাদি কালেম এর কাছে দায়ীবদ্ধ থাকত। মোটকথা 'কামছিকাউ' এর অনুকূলে কার্যতঃ সব কিছুই সম্পাদন করে থাকেন এবং কামছিকাউ এর অনুপস্থিতিতে উক্তকার্য্যভার তিনিঁই সম্পন্ন করতে পারতেন।

কাবুল হচ্ছে "কালেম" এর সহায়কারী এবং পরিষদ সভার শৃঙ্খলা রক্ষক। তিনি কালেম এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে কোন সামাজিক সভার দিন ধার্য্য করে পরিষদবর্গ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশ গ্রহনের আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করে থাকেন। এই সভাতে কে উপস্থিত হয়েছেন এবং কে অনুপস্থিত এর তদারকির দায় দায়িত্ব কাবুল এর হাতে ন্যস্ত থাকত। সভা এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের সরঞ্জাম এবং দ্রব্যাদি কাবুলের হাতে মজুতকৃত রাখে এর যথাযথ বিতরণ এবং জমা উক্ত সভ্যের থেকেঁই ভার অর্পিত ছিল। ক্রমপদ উন্নতিতে উক্ত সভ্য একদিন কালেম এর পদে অধিষ্ঠ লাভ হয়ে থাকেন।

সমাজের সবচেয়েতে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের "চাঁপিয়াকতর-চাঁপিয়াকুসু" অর্থাৎ পাত্রমিত্র যুগল সভ্যের পদে নিযুক্ত করা হতো। এই সভ্যদ্বয় কেবল ৮ বৎসরের জন্যই বহাল রাখা হয়ে থাকেন এবং ক্রমপদোন্নতি হয়ে কামছিকাউ এর পদে আসীন হাওয়ার, তাদের কোন সুযোগ নেই। তাই অনেক সময় কামছিকাউ ও কালেম এর বিচারের বিশ্লেষনের উপর যুক্তি সহকারে খণ্ডনে বিচারের মূল ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল এবং কোন বিচারের রায় ঘোষনার পূর্ব্বে সবচেয়ে আগে চাঁপিয়াকতর-চাঁপিয়াকুসু সম্মতিক্রমে ঘোষনা করা হয়ে থাকে। মোটকথা অন্যান্য পরিষদবর্গের সভ্যরা যথাযথভাবে প্রথাভিত্তিক কাজ করছে কিনা এর পর্যবেক্ষনের জন্য সাধারণ মানুষের নিযুক্ত প্রতিনিধিদ্বয়।

খাওল হচ্ছে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের খাদ্য তৈরী করে বিতরণকারী উক্ত সভ্য ক্রমপদ উন্নতিতে একদিন কাবুলের পদ মর্যাদা লাভ করে থাকেন।বিচারের নিষ্পত্তি এবং আপত্তি বিষয়ে উনার কোন ক্ষমতা থাকে না। তাই পরিষদ সভাতে তার সদস্যপদ থাকলেও 'খামপ্লাই" অর্থাৎ আসনের অধিকার থাকে না। প্রাককালে রূপিনীদের গ্রাম পরিষদ সভার প্রথম সারির সভ্য গ্রহণ হচ্ছে "সেঙজাকীরাক সেঙজাকীসু" অর্থাৎ পরিষদ সভার দূত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিদাতা। সাধারনত স্বাস্থ্যবান এবং বলিষ্ঠ যুবকদের সেংজা পদে নিযুক্ত করে থাকেন। কেননা এই সেংজাই একদিন পরিষদবর্গের উচ্চপদস্থ পদে আসীন হয়ে সমাজকে পরিচালিত করবেন। সভ্যবৃন্দের অভিমতে এবং অন্যন্য বসতির লোকের সমর্থনে প্রথম সেংজা কীসুর পদে কোন ব্যক্তিকে বহাল রাখার পর, তাকে অনেক পরীক্ষা

নিরিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সভায় অনুপস্থিতিতে তাকে ডেকে সভাতে আনার দায়িত্ব, এবং কোন বিষয় নিয়ে বিচারের মামলা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাদী বিবাদীদের অনুপস্থিতিতে উক্ত সেঙজার প্রতিনিধিত্বে "পালাই" বলে একটি দূতবর্গ গঠিত থাকত। এই পালাই সংগঠিত দল দূর দূরান্তে গিয়ে বাদী না হয় বিবাদীকে সভাতে নিয়ে আসতে হত। যদি সভাতে আসার অনীহা প্রকাশ করে থাকে তাহালে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে উক্ত সভাতে উপস্থিত করতে হত। তাছাড়া কোন বিচার সভাতে কোন ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত এবং তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের যোগ্য বলে কলেমের মুখ থেকে নির্গত হওয়া মাত্রই সেংজাকর্রাই উঠে ঐ ব্যক্তিকে বেদমভাবে পিটিয়ে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হত। এটাই প্রাকালের দোষীদের শাসনের একটি অংশ। এইভাবে নিজের বসতির স্বায়ত্ত শাসন নিজেদের মধ্যে পরিচালিত করে নিত এবং প্রয়োজনবোধে কারও উপর শাসন প্রয়োগ, আবার প্রয়োজনবোধে মৈত্রয়ীবন্ধন, মিমাংসা, নিষ্পত্তি সবকিছুই মিটিয়ে ফেলতে হয়। এইসব গ্রামের অভ্যন্তরের ব্যপারে তখনকার রাজারা কোন দিনই হস্তক্ষেপ করত না। এই সেংজাকীরাক সেংজাকুসু বসতির পরিষদ সভাতে আসন (খাসপ্লাই) এর অধিকার থাকে না।

মুখ্য সভ্যের পাত্র মিত্র প্রতিনিধিদ্বয় য়াকসুঙ-খুকসুঙ হচ্ছে কামছিকাউ রাজার দ্বারা মনোনীত যুগল প্রতিনিধি। বসতির পরিষদ সভাতে কামছিকাউকে সাহায্য দানের জন্য সদা সতর্ক এবং তৎপরতার মধ্যে থাকতে হত। পরিষদ সভা ছাড়াও সমাজের অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে ছায়ার মত কামছিকাউকে অনুসরণ করতে হত।

রূপিনীদের প্রাক হালামভুক্তির পূর্ব্বের বসতির প্রশাসনিক কাঠামোর পদাধিকার এর লতিকা নিম্নে দেওয়া হল। যেমন ঃ

কামছিকাউ বা কাস্কাউ এবং য়াকসুঙ-খুকসুঙ

↓

কালেম্

↓

কাবুল

↓

চাঁপিয়াকতর-চাঁপিয়াকুসু

↓

খাঔল

↓

সেঙজাকীরাক-সেঙজাকুসু

প্রথানুবর্তী সামাজিক আইনকানুন এবং শাসন ব্যবস্থা

বসতির নানান সমস্যা জর্জরিত বিষয় এবং গ্রামের সংস্কার মূলক একটি সভা আকারে অনুষ্ঠিত হলে, তথাকথিত রূপিনী ভাষায় "দিয়ানকামুন" বলে অভিহিত করা হয়। তখনকার লোক প্রথার সন্নিবিষ্ট এবং সীমিত আইন কানুন রীতিনীতি ঐ পরিষদবর্গের সম্মিলিত সভাতে পুঙ্গানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষন করার অবকাশ পায়। এই অলিখিত প্রথানুবর্ত্তীর মধ্যে সীমিত রেখেই প্রাককালে উক্ত পরিষদবর্গ (লোক') বিচার-আচার আপত্তির থাকলে নিষ্পত্তি করণ এবং বিধি নিষেধ সব কিছুই সম্পাদন করতে হয়, এবং গ্রামবাসীরাও তা মেনে নিতে বাধ্য ছিল। সেকালে আইন প্রনয়ন এবং শাসনের কাজ এক সঙ্গেই চালিয়ে যেত এবং শাসনের কাজ বা শাস্তি প্রদানে পরিষদবর্গদের মধ্যে তা সম্পন্ন করে ফেলে, উচ্চ কক্ষে আপিল করার অপেক্ষার কোন রকম অবকাশ নেয়। রূপিনী সমাজে ঐ পরিষদ সভা দুই প্রকার আহ্বানে, সভ্যরা সম্মিলিত হয়। একটি হচ্ছে (১) পান্দা, অপরটি হচ্ছে (২) দিয়ান, এই দুই সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই পরিষদ এবং একই সভ্য নিয়ে সমবেত হলেও আলোচনা বিষয়বস্তু ভিন্ন। পান্দা হচ্ছে সমগ্র বা বসতির তাগিদে সার্বজনীন উদ্দেশ্যে সভা আহ্বান এবং অপরটি হচ্ছে সম্পত্তি, ব্যক্তিগত মামলা, এবং পারিবারিক ব্যবপারে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সভা আহ্বানকে তথা কথিত রূপিনীদের ভাষায় "দিয়ান" বলা হত। পান্দার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিযুক্তের প্রয়োজন না থাকলেও দিয়ানরে ক্ষেত্রে মৌখিক অভিযোগের (নালিশি) অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা ছিল।

পান্দা বা (লোক' কুথুমলাই) ঃ সাধারনত পান্দাতে আইন কানুন বিশ্লেষন তত্ব প্রয়োগ, বির্তক কিছুরই স্থান নেই বটে। কিন্তু নির্ধারিত সামাজিক কর্তব্য এবং দায় দায়িত্ব লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হত। তখনকার সামাজিক কর্তব্য এবং দায় দায়িত্বও প্রথার পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট ছিল। তাই রূপিনীদের মধ্যে ঐক্য এবং সমাজচেতনা সেকালে প্রবল হয়ে উঠেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এইসব সাধারণ পরিষদ সভা হল যেমন (১) দশনাকামুল (২) কেরখলা (৩) তীয়খুলুম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল।

দশনাকামুন ঃ এটা রূপিনীদের (জুলাই) অন্যতম সাধারণ সার্বজনীন সভা এবং ভোজন। সামাজিক প্রশাসনের পূর্ণ সদস্য উপস্থিত ছাড়াও প্রতি পরিবারে একজন করে উক্ত সভাতে উপস্থিত হতে হয়। এই সভা রাজার "অসম" ভোজনে প্রতিনিধি যাওয়ার প্রাকমুহুর্তে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশেষতঃ এটা রানীকে কর (কানসুমারী) প্রদানের প্রস্তুতি সভা ছিল। এই সভাতে প্রতি পরিবারের নির্ধারিত হারে "কানসুমারী" অর্থাৎ কর জমা দিতে হয় অন্যথায় তার শাস্তি পেতে হবে। উক্ত সভাতে পাঠা, না হয় শূকুর বলি

দিয়ে সমারোহে ভোজনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া এই সভাতে প্রয়োজন অনুসারে পরিষদ সভ্যদের রদ-বদল করণ অনেক সময় করা হয়। এই সভাতে বসতির জনসাধারনের নির্বাচিত অসম ভোজন যাত্রীদলের দুইজন মালবাহী সদস্য নিয়োগ করা হয়ে থাকে এবং এই মালবাহী যুগল সদস্য প্রতি বৎসর পরিবর্তন হতে হয় তাদের 'কানটা-বীরসিং' বলা হয়।

কেরখলা ঃ যখন রাজার অসম ভোজন বা অসা ভোজনে অংশ গ্রহনকারী পরিষদবর্গ পঞ্চম দিবসে শেষ করে বসতিতে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন বসতির লোকজন ঐ অসাধারণ সম্মান নিয়ে উক্ত রাজ সভা থেকে প্রত্তাবর্তন সদস্যদের উষ্ণ স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে এবং তাদের সাময়িক বিশ্রামের জন্য বাঁশের সুসজ্জিত বেদী (কের খলা) তৈরী করা হত। এই কের খলাই উপরিষদবর্গের সুস্বাগতমে জমে ওঠে, সমগ্র বসতির লোক এবং তাদের আমোদ স্ফূর্তির জন্য পান-আহার এবং নাচের দল উক্ত স্থানে মজুত রাখা হত। উক্ত পরিষদ বর্গ এসে বেদীতে বিশ্রাম নেওয়া মাত্রই সমস্ত বসতির লোকজনের সম্মুখে রাজধানীস্থিত "অসম" ভোজনের সম্পর্কে বিবৃতি দিয়ে থাকেন। রানী কিংবা তাঁর অনুরুক্ত মহাজনের সঙ্গে সুগৌরবের সঙ্গে কথোপোকথন এবং রূপিনীদের সামাজিক সম্পর্কে রানীর কাছে উত্থাপন, আগাম বছরে কানসুমারীর হার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পর্যলোচনা হতে হয়। তারপর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নাচ-গান সহ উক্ত প্রত্যাবর্তনকারী মুখ্য ব্যক্তিদের সসম্মানে একটি বৃত্তাকার সজ্জিত রথে স্ব স্ব বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হয়।

তীয়খুলুম ঃ এই পূজাকে কেন্দ্র করে কামছিকাউ এর অধিনস্থ গোটা রূপিনী গোষ্ঠী একযোগে সম্মিলিত হওয়ার এক সুবর্ণ সময়। একদিকে আচাইজুঙএর সম্পাদনায় পূজার কাজ চলতে থাকে, অন্যদিকে রূপিনী সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সাধনের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। তাই এই পূজাকে সমাজের আচার অনুষ্ঠান বলা চলে না; এটাকে সমাজ উন্নয়নের সভা বা ভোজন বলা যেতে পারে। পূজার শেষে সমারোহে ভোজনের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

দিয়ানকামুন ঃ "দিয়ানকামুন" অর্থাৎ বিচারের জন্য সমবেত হওয়া, বিশেষ করে রূপিনীদের ভাষায় শুধু বিচারের ক্ষেত্রেই উক্ত দিয়ান, শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রকারান্তে তা পূর্ণ পরিষদ সভা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাককালে রূপিনী সমাজে বসবাস করতে হলে চাই প্রথমে প্রথানুবর্তী উক্ত সমাজের আইন কানুন রীতি-নীতি মেনে চলা। তার প্রতিদানে প্রথানুবর্তী আইনের ; রাই সীমিত উক্ত ব্যক্তির সমাজিক অধিকার উপর

দায়বদ্ধ থাকবে। ("ক্রাবপ্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীগণ, সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রথা বা আইনকে বিচার করে বলেন যে, "আইন বা সামাজিক প্রথা সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কারণে ও প্রভাবের ফলে এবং সামাজিক কল্যান সাধন করাই যখন লক্ষ সেইজন্যই লোকে আইন মানে ।")

সমাজে বাস করতে হলে চাই সামাজিক কল্যান চেতনাবোধ এবং এই চেতনার শেষে সমাজের প্রথা রীতিনীতিকে মেনে চলতে বাধ্য করে। তখনি সমাজজীবি মানুষের কাছে হয়ে উঠে এইসব আইন কানুন রীতি নীতি পবিত্র এবং মূল্যবান। এই পবিত্র এবং মূল্যবান আইনকানুন রীতি নীতিকে লঙ্ঘন করলেই তাঁকে বিচারে (দিয়ানে) দোষী সাব্যস্ত করে প্রাককালে উক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এই যুগে সামাজিক প্রথানুবর্তী নির্দিষ্ট আইনের কোন ধারা বা ভাগ বন্টন করা নেয়। দিয়ান অর্থাৎ বিচার চলাকালীন সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমে পরিষদবর্গের মুখ্য সভ্যরা লোক প্রচলিত ও প্রথাকে ব্যখ্যা করে আইন তৈরী করে থাকেন। প্রাককালে এইসব তৈরী আইন কানুন রীতি নীতি পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়ে এসে এবং সমাজের অলিখিত আইন রূপে 'দিয়ান', চলাকালীন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই প্রচলিত আইন রীতি নীতি লঙ্ঘনকারীদের যারা অসাধারণ অপরাধীর ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি এবং ন্যূনতম ক্ষেত্রে জুরিমানা করণ তখনকার লোকজন অনায়াসে মেনে নিতে বাধ্য ছিল। তখনকার বিচারের আদালত এবং শাস্তির কারাগার ঐ জন সমাবেশ "দিয়ান" এর মধ্যে অনায়াসে সম্পন্ন করে ফেলত; এরপর কোন উচ্চ আদালত সেকালে দূর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে সুবিধা ছিল না। যারা ঐ দিয়ানকে অবজ্ঞা করে উক্ত বিচারের আইন কানুনকে মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করে তা, হলে সমাজ বা বসতি ছেড়ে পলায়ন ছাড়া তার কোন বিকল্প পথ নেই। মোট কথা, তখনকার সমাজে ব্যবস্থা নিজেদের শাসন ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে শাসন প্রকল্প চালিয়ে যেত, ইহা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনেরই নামান্তর মাত্র। সামাজিক নিয়মে দিয়ান এর সংশ্লিষ্টযুক্ত অনুমোদন সাপেক্ষ লোকাচার ও সমাজের বিধি বিধান নীচে দেওয়া হল ঃ

বিবাহ প্রথা

(১) স্ত্রী বা স্বামী জীবিতবস্থায় কারো অজ্ঞাতসারে অবৈধ মিলনে লিপ্ত হলে বা বিবাহ করলে এই সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সমাজের পরিষদবর্গের কাছে নালিশ বা অভিযোগ দাখিল করতে হত। তখন আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয় নিয়ে দিয়ান বসার আহবান করলে এবং তা কতটুকু সত্য মিথ্যা নির্নয় করে দেখা হত। সাক্ষী সাবুদ সহ যদি সততা প্রমানিত হয়, তাহলে পুরুষ-নারী উভয়কেই কঠোরভাবে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। তার পাশাপাশি উক্ত দোষী ব্যক্তিদের যথাক্রমে ২০/২৫ আর্থিক দণ্ড (পাব')দিতে হয়।

(২) যদি অবিবাহিত যুবক ও যুবতী পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বন্ধন স্থাপিত হয়ে পদস্খলনে লিপ্ত হয়, তখন উপযুক্ত প্রমান সহকারে পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে ২০ থেকে ২৫ টাকা জরিমানা (পাব') ধার্য্য করা হয়ে থাকে। যদি উক্ত ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করতে চায় তাহলে সমাজ তাদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য বাধকতা আছে, তবে উভয়ের অভিবাবকের অভিমত সাপেক্ষ। অভিবাবকের অনুমোদন ছাড়া রূপিনী সমাজে 'দিয়ানের রায় বিবাহ বন্ধনে বাধ্য বাধকতা করতে পারে না।

(৩) যদি নারী-পুরুষ শারীরিকসুস্থ অবস্থায় বিবাহ বন্ধন হয়ে উঠে এবং পরে স্বামী বা স্ত্রীর অসুস্থতায় কিংবা দূর্ঘটনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে, তখন বিবাহ বিচ্ছেদ দাবী করা সামাজিক নিয়মে গ্রাহ্য করা হয় না। এই অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে কোন পুরুষ কিংবা নারীর সঙ্গে অশুভলগ্নে ২০/২৫ অর্থ দণ্ডাদেশ করা হত। তার পাশাপাশি অনেক সময় শারীরিক দণ্ডও দেওয়া হত।

(৪) যদি অবিবাহিত যুবক কোন যুবতীকে ছলে কৌশলে প্রলোভন করে থাকে এবং শেষে ঐ যুবতীর ঘরে কোন সন্তান ধারণ করে, তাহলে, এই অপরাধে সমাজের নীতি অনুসারে যুবককে ২৫টাকা অর্থ দণ্ড (পাব') এবং যুবতীর ক্ষেত্রে ২০টাকা অর্থ দণ্ড ধার্য্য করা হত। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে উভয়ের মা-বাবার সম্মতি এবং অসম্মতির কথা সমাজের বিচারে গ্রাহ্য করা হয় না।

(৫) যদি বিবাহিত পুরুষ কোন যুবতী মেয়েকে ছলে ভুলিয়ে বিয়ে করে থাকে তখন যদি ঐ মেয়ের পিতা মাতা উক্ত বিয়েতে সম্মতি না থাকলেও যখন বিয়ে হয়েই গেছে, নিরুপায় হয়ে সাধারণত বিচারের জবাবে মেয়ের স্বপক্ষে দাঁড়াতে হয়। তাতে এইসব একে অপরকে দোষারোপ শর্ত অনুসারে বিচারে নাকচ হয়ে যেতে বাধ্য। আর যদি এই বিবাহ পুরুষের প্রথমা স্ত্রী না হয়, পুত্র কন্যা অসম্মত হয়ে সুবিচারের জন্য (লক' বা) সমাজের কাছে অভিযোগ দাখিল করে থাকে; তখন সমাজ, স্ত্রী বা সন্তানদের প্রতিপালনের ভরণ পোষন সরবরাহ করতে বাধ্য হয়। (দুই সন্তানের ক্ষেত্রে) যদি সন্তানের মা লক' অর্থাৎ সমাজের কাছে দাবী রাখে যে সন্তান বন্টন হয়ে যাক তাতে সমাজ অনায়াসে বন্টনের ব্যবস্থা করে থাকেন। যদি প্রথমা স্ত্রী স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করে থাকে এই আবেদন 'লক' বা সমাজ অনায়াসে স্বীকৃত দিতে বাধ্য। এই বিচ্ছেদে যদি নাবালক সন্তান-সন্ততী ভূ-সমপত্তি প্রাপ্য বলে 'দিয়ানে' স্বীকৃত লাভ হলেও মাতা অর্থাৎ বিচ্ছেদকারিনী কোন সময় এই সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে না।

(৬) প্রাককালে রূপিনী সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে স্বামীহীনা কিংবা স্ত্রীহীন উভয়ের মধ্যে পুন ঘর বাছতে পারে। এতে সামাজিক নিয়মের নিষেধ আজ্ঞা নেই। মোটকথা সেইসময় বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। আবার কোন ব্যক্তির স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী কোন অবিবাহিত যুবতীকে বিবাহ করতে পারে, সেখানে সামাজিক বিধি নিষেধ নেই।

অপহরণের মাধ্যমে বিবাহ

১। রূপিনী সমাজে অবৈধভাবে কোন অনিচ্ছুক যুবতীকে অপহরণের মাধ্যমে জোর করে বিয়ে করলে, এবং যদি মেয়ের অভিবাবক আপত্তি জানাই তাহলে সামাজিকভাবে এই বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। তখন ঐ যুবককে বিচারের (দিয়ান') রায়ে দোষী সাব্যস্ত করে অর্থদণ্ড ৪৫ টাকা এবং চুরি করার অপরাধে ১৫টাকা জুরিমানা করা হত। এইভাবে সমাজের (লক') এর রায় ঘোষিত হওয়ার পর উক্ত যুবক ঐ মেয়ের উপর কোন দাবীদার বা সম্বন্ধ রাখা সামাজিক অপরাধ।

২। যদি পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে কোন যুবক যুবতী পলায়ন করে, তখন উক্ত পলায়নকারীর পক্ষের অভিবাবককে ৩০টাকা করে প্রতিপক্ষের দণ্ডবিধি আরোপিত করা হয়ে থাকে। আবার উক্ত পলায়নকারীদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে একত্রে জীবন যাপন করতে চায়, তাহলে (লক') সমাজকে বিব্রত করার আরোপে আরও ২০টাকা দণ্ড 'দিয়ান' বা বিচারে দিতে হয়।

ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ঃ

১। রূপিনী সমাজে কোন যুবতী নারীকে অন্য সমাজের যুবক বিবাহ স্থাপন করতে চাইলে উক্ত বিবাহের প্রস্তাবকারীকে 'লক' বা সমাজের কাছে ১০০টাকা জমা দিতে হয়। সাধারনত মেয়েরা অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিয়ে হলে স্বগোষ্ঠীর উন্মোচন ঘটে তাই বিবাহের প্রস্তাবকারীকেই অর্থ দণ্ড আরোপিত করা হত। এছাড়া এইসব বিয়ের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে আর বিশেষ কোন বাধা নিষেধ নেই বললেই চলে।

২। কোন যুবক যদি ভিন্ন গোষ্ঠীর মেয়েকে বিবাহ করতে চাইলে ত্বরায় তা "লককে" জানিয়ে বিয়ে প্রস্তাব করতে হয়। সেইক্ষেত্রে অর্থ দণ্ডের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিয়ের ভোজনে সমাজ ও পরিষদবর্গকে আমন্ত্রণ জানাতে একটি ভদ্রতা সুলভ।

৩। ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন মেয়ে রূপিনী সমাজে বিয়ে করে আনার পর, উক্ত নারী কূলতা বা মন্ত্রগুনে বলীয়ান হয়ে থাকে এবং তা যদি সঠিক প্রমানিত হয়, তাহলে এইসব অবৈধ অনাচার পারিপার্শ্বিকতা সমাজের সংক্রামক ঘটার ভয়ে সামাজিক বিচারে তাকে বসতি ছেড়ে বাপের ঘরে যাওয়ার জন্য বাধ্যবাধকতা করা হয়ে থাকে। এইক্ষেত্রে স্বামী পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ আনতে পারে না। তিনি যদি স্ত্রীকে অনুসরনে সমাজ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে এতে 'লক' তাকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

৪। রূপিনীদের সমাজে কোন ভিন্নগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি যদি রূপিনী মেয়েকে বিয়ে করে, তাদের সমাজেই চিরজীবনের জন্য বসবাস করতে চায়, তাহলে নবগোষ্ঠীভুক্তকরণের সামাজিক নিয়ম কানুন সম্পন্ন করে, রূপিনী গোষ্ঠীভুক্ত হতে হয়। অন্যথায় সে সমাজের

বর্হিভুত ব্যক্তি বা পরিবার বলে গণ্য হবে। বলাবাহুল্য প্রাককালে এই সূত্রেই রূপিনী মেয়ে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে বহু হালাম বা পুরান, কুকি জাতি রূপিনীভুক্ত হছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এইসব জাতিরা হচ্ছে যেমন ঃ করবং, লাললঙ্গ, লাঙ্গাই, পুরণ গোষ্ঠীসমূহ। রূপিনী সমাজের সন্নিহিত নবাগত গোষ্ঠীকে "পাঞ্চী তাউ" বলা হয়। তারা সমাজ পরিষদ বর্গের মুখ্যসভ্য (খুমতাং কীনাঙ) পদে নিযুক্ত হতে পারে না। তবে ছোটখাটো সভ্যপদে সচরাচর প্রাকালে তারা নিযুক্ত হয়েই থাকে। রূপিনী মেয়েকে বিয়ে ছাড়াও সমাজের সঙ্গে চুক্তি বদ্ধতার সঙ্গে যে কোন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক রূপিনী সমাজে সন্নিহিত হয়ে রূপিনীভুক্ত হতে পারে তা সামাজিক নিয়ম বিধির সাপেক্ষ।

আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ে প্রচলন

রূপিনী সমাজে কতটা দূর সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় সাধারনতঃ সমাজের লোকজন সবাই অবগত থাকলেও, তা সমাজ প্রথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বলাবাহুল্য এই বাধা নিষেধ ভারতের প্রাচীনতম হিন্দু ধর্মেরই অনুপ্রানিত বলা যেতে পারে। শেষে প্রথা আকারে আদিবাসীদের লোকাচার এবং সমাজ শাসন ব্যবস্থায় তা সন্নিবিষ্ট হয়ে যায় এবং তা লঙ্ঘনকারীকে অর্থদণ্ড না হয় সামামজিক ভোজন প্রদান করে নিস্পত্তি করে দেওয়া হয়ে থাকে।

স্বজনের মধ্যে বিয়ে প্রনালী ঃ

রূপিনী সমাজে প্রচলিত প্রথানুসারে দূরতম এবং নিকটতম আত্মীয় নির্ধারণের একটি তুলনা প্রবাদ আছে; যেমন "উতৈলাউ" বথত (দূলু বাঁশের থেকনা) অর্থাৎ তিনটি সিঁড়ি ব্যবধানের দূরত্বে অনায়াসে বিয়ে প্রচলন আছে। আবার "ঊানদাল বথত" (অর্থাৎ মৃত্তিঙ্গা বাঁশের থেকনা) দুই কুটুম্ব ব্যবধানে বিয়ে সচরাচর খুব কমই হয়ে থাকে।

১। "ঊীনাল বেত্রং" হচ্ছে কুটুম্ব বিশেষ আত্মীয় সম্পর্ক। এই রকম সম্পর্ক বন্ধন নারী কিংবা পুরুষের মধ্যে সাধারনত রূপিনী সমাজে বিয়ের প্রচলন সচরাচর হয় না। প্রেম বা পদস্খলনের সংশ্লিষ্ট সমস্যার ঝঞ্ঝাটে পড়ে অনেক সময় বিয়ে হওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে অর্থাৎ নৈতিক এবং সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ করণ আছে। সাধারনত এই কুটুম পরিমাপ নির্নয় করা গোটা রূপিনী সমাজের বয়ঃবৃদ্ধি ব্যক্তিদের মধ্যে যথাযথ অবগত ছিল এবং বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ব্বে এই সূত্র ভিত্তিতেই নির্নয় করা হত। যদি এইভাবে নির্ণয়ের পর নিকটস্থ আত্মীয় লক্ষগোচর হয়, তাহলে সেই বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। এই নির্ণয় পদ্ধতী হচ্ছে, যেমন ঃ বিয়ের প্রার্থীর ছেলে কিংবা মেয়ের উভয়ের পিতা মাতা পরস্পরের মধ্যে জেঠতুতো বা খুড়তুতো এবং পিসতুতো বা মামাতো,

ঘরের ভাইবোন সম্পর্ক থাকে। এটা হচ্ছে এক সিঁড়ি বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট কুটুম। আবার তাদের ঘরে যে ছেলে ও অপরের ঘরে মেয়ের জন্ম হবে এবং তাদের মধ্যে যে কুটুম ব্যবধান হবে এটাই হচ্ছে দুই সিড়িচ্যুত কুটুম অর্থাৎ তথাকথিত রূপিনী ভাষায় 'উনাল বেত্রং' (মৃত্তিঙ্গা বাঁশের দুই টাইপ)। কোন সমস্যার ঝঞ্জাট পূর্ব্বক, এই রকম বিয়ে বাধ্য হয় এবং এই রকম অবৈধ আচরণের জন্য সমাজের স্বীকৃতি না থাকাতে স্বীকৃতি লাভের প্রয়াসে পরিষদ বর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং গ্রামের মানুষের জন্য, একটি ভোজসভা আয়োজন করতে হয়; যাতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল না করে।

২। "উাতীলাউ বত্রং" হচ্ছে তিন সিঁড়ি বিচ্যুত কুটুম বিশেষ এবং রূপিনী জন প্রবাদে 'দোলু বাঁশের তিন ঘিড়া যুক্ত টাইপের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। এর নির্ধারণের পদ্ধতি হচ্ছে যেমন পিসতুতো বা মামাতো এবং জেঠতুতো বা খুড়তুতো। একে অপরের ঘরে যে ছেলে এবং মেয়ে অর্থাৎ উক্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের নাতি এবং নাতনী সাধারনত দূর সম্পর্কের ভাই-বোন সম্পর্ক হয়ে উঠে। তাদের একে অপরের ঘরে যে ছেলে ও মেয়ে জন্ম হবে, এই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে বিয়ে প্রচলন রূপিনী সমাজে অনায়াসে স্বীকৃত লাভ হয়ে থাকে।

৩। প্রাককালে রূপিনী সমাজে দুই সিঁড়ি কিংবা তিনসিঁড়ি জ্ঞাতি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও ভাগিনে এবং কাকা ভাতিজীর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে না। যদি ঝঞ্জাটের কবলে পড়ে বিয়ে হয়েই যায় তাহলে, এই সম্পর্ককে "সৗয় হালক্" অর্থাৎ কুকরের সম্পর্ক বলে অভিহিত করে সমাজের লক' ধিক্কার দিয়ে থাকেন।

৪। স্ত্রীর বড় বোনের সঙ্গে (জেঠুশ এর সঙ্গে) রূপিনী সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন তো হতেই পারে না। উপরন্তু গা পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারত না। কেউ যদি অজ্ঞাতসারে পরস্পরের মধ্যে স্পর্শ হয়ে যায়, তাহলে কৌতুক ছলে তাদের পরস্পরের মধ্যে অর্থ জরিমানা না হয় এক বোতল 'চুয়াক' অর্থাৎ মদ প্রদান করে নিস্পত্তি করে ফেলতে হয়। এইসব সাধারণ ব্যাপারে 'দিয়ান, এর কোন প্রয়োজন হয় না। বৌদি, ননদ, শালীরাই সাধারণত এই দণ্ডে আরোপিত করতে পারে। আবার শালী কিংবা বৌদির সঙ্গে তৎকালে বিবাহের প্রচলন ছিল, তবে তারা যদি স্ত্রীহীন বা স্বামীহীনা হয়।

চামরীয় তিসাই কাইমুল ঃ

প্রাককালে সমাজে ৫বৎসরের জন্য "চামরীয় তিসাই কাইমুল" অর্থাৎ ঘরে জামাই তুলে বিবাহ প্রথা খুবই প্রচলন ছিল। তখনকার রূপিনী গোষ্ঠীর নারী খুবই মূল্যবান বটে; তাই পুরাধামে শ্বশুরবাড়ী ৫বৎসর খেতে - এইভাবে অতিক্রান্ত হলে স্ত্রী সমেত নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তন করে থাকে। ফলতঃ এই ঘর জামাইত্ব গ্রহণের বিপন্নতা থেকে এড়িয়ে যাওয়ার

প্রয়াসে সে কালের যারা অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিরা, কোন গরীবের মেয়েকে 'পণ প্রদান করে অথবা অবলা মেয়েকে নাবালিকা থেকেই ঘরে নিয়ে ভরণ পোষন করে রাখা হত। তারপর ঐ মেয়ে উপযুক্ত হয়ে উঠলে, তার সঙ্গে নিজের উপযুক্ত ছেলেকে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া হত। সমাজ থেকেও তা অনায়াসে স্বীকৃত দিতে বাধ্য। আজকাল অবশ্য নব্যরূপিনী সম্প্রদায় কাছে উত্তরোত্তর এই ঘর জামাই প্রথা বিলুপ্ত প্রায়।

বাল্য বিবাহ ঃ

যেহেতু রূপিনী গোষ্ঠীরা প্রাচীন হিন্দু ধর্মের অঙ্গ, শৈব্য ধর্মে অনুপ্রানিত সেইজন্য অবস্থাপন্ন পরিবারে বাল্য বিবাহ কিছু কিছু প্রচলন ছিল। তবে ইহা ঘর জামাই উঠার ভয়েই বিশেষ করে, এই প্রথাটি সূচনা হয়ে থাকে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্ব্ব উক্ত সূত্রতে, অর্থাৎ কোন গরীবের মেয়েকে পিতা মাতার পন প্রদান করে নাবালিকা থেকেই উক্ত ব্যক্তিরা ঘরে নিয়ে যেত। তারপর যদি ছেলের পিতা মাতা বর্ষীয়ান হয়, তাহলে তাদের মৃত্যুর পর পন দ্বারা করে উক্ত মেয়েকে ঘর থেকে বিতাড়িত করার সুযোগ যাতে না থাকে এবং তার ব্যবস্থা জন্যই বাল্য বিবাহ বন্ধনে উভয়কে ভরণ পোষন করে ঘরেই রাখা হত। তবে উভয়েই উপযুক্ত হয়ে উঠলে পুনঃ বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এক সঙ্গে শয়ন, তৎকালীন সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। ঘর জামাই প্রথা বিলুপ্ত সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই আজকাল এইসব প্রথা রূপিনী সমাজে বিলুপ্ত প্রায়।

নাইকাইমুন ঃ

সাধারন রূপিনী গোষ্ঠীর সমাজে পূর্ব্বউক্ত দূর সম্পর্ক কুটুম অথবা কুটুম শূন্য নির্নয়ের পর শুধু পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। সেকালে পাত্র-পত্রীর পরস্পরের পছন্দের উপর বিশেষ নির্ভর করে না। তারপর উভয় পক্ষে বিয়ের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে সম্মতি লাভ হলে "সানকুসু" অর্থাৎ উপ মঙ্গলাচন্দনের জন্য দিন ধার্য্য করা হয়ে থাকে। "সানকসু" অনুষ্ঠানের মধ্যেই আবার "হামচীক সানকতর" অর্থাৎ পূর্ন মঙ্গলাচন্দন অনুষ্ঠানের জন্য দিন ধার্য্য করতে হয়। এই সানকুসু এবং সানকতর উভয় ভোজ সভা অনুষ্ঠানের জন্য পানাহারের খরচা হবে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বহন করতে হয়। কে কত হারে খরচা করবে তা সামাজিকভাবে নির্ধারন করা আছে। যেমন ঃ ছেলের পক্ষে এক বা একাধিক মূরগ অন্যদিকে মেয়ের পক্ষেও এক বা একাধিক মূরগী এবং তার সঙ্গে "আরাক" অর্থাৎ মদ, ছেলের পক্ষ থেকে প্রদান করতে হয়।

আবার মেয়ের পক্ষ থেকে "চুডাকবীতীক"অর্থাৎ কাঁচা মদ ঐ মঙ্গলাচন্দন (সানকতর) অনুষ্ঠানে প্রদান করতে হয়। এই 'সানকুসু এবং সানকতর' সাধারনত পাত্রীর বাসভবনেই সম্পন্ন হতে হয়। অনুষ্ঠানের দিনেই বিয়ের আগাম হিসাব পত্র স্থির করা হয়ে থাকে এবং বিয়ের দিন ধার্য্যও সেই দিনেই স্থির করা হয়ে থাকে। চূড়ান্তভাবে মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর উক্ত বিয়ের পাত্র, পাত্রীর পরিবারে কিছু দিনের জন্য "তানছন তৈয়ছন" করতে হয় (অর্থাৎ পাত্রীর পরিবারে গিয়ে নানারকম কাজে সহায়তা করতে হয়)। যতটুকু সম্ভব পাত্র তার স্বীয় বাড়ীতে বসবাস করই এই 'তানছনতৈয়ছন' কাজটি সম্পন্ন করতে হয়, তবে দূরবর্তী বাসিন্দা পাত্রের ক্ষেত্রে ঐ পাত্রীর আবাস ঘরেই কিছু দিনের জন্য রয়ে যেতে হত। তবে পাত্রীর সঙ্গে কথা বলা এবং এক বিছানাতে শয়ন সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

তারপর পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে এবং বসতির সব লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার বন্ধুবান্ধব সহ পাত্রীর বাসভবনে অর্থাৎ যেখানে তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে আগের দিন উপস্থিত হতে হয়। সেইদিন থেকে ৫বৎসর পর্যন্ত ঐ শ্বশুড় বাড়ীতেই উক্ত জামাইকে থাকতে হবে। এইজন্য বেতের হাতের বয়নাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বাসন বসন অনেক কিছু বহন করে নিতে হত। এই বিয়ের পূর্ণ খরচা পাত্র পাত্রী উভয়েই সমান হারে বহন করে নিতে হয়। বসতির অন্যতম অচাই(ওঝা)এইসব বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ অব্দি সম্পন্ন করে থাকেন। সমাজের পরিষদ বর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকলেও উক্ত অচাই এর সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় মধ্যবর্তী কালে রূপিনী সমাজে কামছিকাউ এর সম পদ-পর্যাদা সম্পন্ন "অচাইজুঙ" (মুখ্য ওঝা) সমগ্র বসতির আচার অনুষ্ঠান, পূজা-পার্ব্বন সব কিছুই তাঁর কর্তৃক পরিচালিত হবেন। এমনকি সামাজিক শাসন পরিকাঠামোতে তার ভূমিকা কম ছিলেন না।

আধুনীক হিন্দু ধর্মের ধাঁচে এসে ব্রাহ্মণের হাতে বিয়ের রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান তুলে দেয়। ফলে এইসব প্রাচীন প্রথানুবর্তী বিয়ে এবং আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্ব্বন সব কিছুই পুনঃ সংস্কার হয়ে, রূপিনীরা আজ নব্য যুগে আঁধারে বাস করছে।

বিবাহের পণ প্রথা

বিবাহের পন প্রথা সেকালেও রূপিনী সমাজে প্রচলিত ছিল কিন্তু তা প্রদান করতে হয় ছেলে বা পাত্রের পক্ষে। তখনকার রূপিনী সমাজে সাধারনত পাত্রীর অভিভাবকরা বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্নাসিকা পূর্ণ স্থান ছিল, কেননা সেকালে রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে মেয়ের

সংখ্যা কম ছিল। তাই পুরাদমে ৫বছর যাবৎ সশ্রম ঘর জামাই হিসাবে অতিবাহিত হবার পর, স্ত্রী সন্তান সমেত নিজ গৃহে প্রত্তাবর্তন নাহয় শ্বশুড় বাড়ীতেই রয়ে যাবে তা স্থির করা হয়ে থাকে। ফলে এই সশ্রম ঘর জামাই উঠার বিপন্ন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা 'পণ' মাধ্যমে পাত্রী ক্রয় করে নিয়ে পাত্রের বাসস্থানে বিয়ের আয়োজন করা হত। রূপিনীর মধ্যে এই ব্যবস্থা সামাজিক ভাবে কোন অবৈধ ছিল না।

অগ্রজ জাতির ধাঁচে অনুসরণেই হোক বা কালচক্রের আবর্তনেই হোক এই পনপ্রথা পরিবর্ত্তন হয়ে বিপরীত দিকে মূল ঘুরে যায়। ফলে, আজকাল নব্য রূপিনী সমাজে প্রাককালের সেই পনের মাধ্যমে পাত্রী ক্রয় ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘটে গিয়ে এবং পক্ষান্তরে কিছু কিছু অংশে বিয়ের সময় কন্যার পক্ষ থেকে পাত্রকে পন, প্রদান করতে দেখা যায়। পূর্ব্বের সমাজ পরিকাঠামো উত্তরোত্তর শিথিল হওয়াতে রূপিনী সমাজে সহসা আধুনীকতা বিরাজ করতে পেরেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সমাজের অন্যান্য অপরাধীর দণ্ডবিধি

শুধু নারী সংক্রান্ত অপরাধীদের দণ্ড প্রদান এবং নিস্পত্তি এ সীমিত করণ নিয়েই কেবল রূপিনী সমাজে তৎপরতা থাকত তা নয়, নানাবিধ অপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান এবং অর্থদণ্ড সহকারে যা সামাজিক প্রথানুবর্ত্তী আইন আছে, তাই সম্পাদন করে থাকেন। এই বিচারে দোষী ব্যক্তিদের দৈহিক শায়েস্তা প্রদান উক্ত বিচারালয়েতেই (দিয়ান নক থাক) সম্পন্ন করে ফেলত, বিলম্বতার বাকী রাখে না। এই শাস্তির ভয়েই সেকালের মানুষ কোন সমাজ বিরোধী অপরাধ কার্য্যে লিপ্ত হতে সদা সচেতন ছিল। এইসব অপরাধ বা সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য দণ্ডবিধি নিম্নে দেওয়া হল ঃ

শিখাও অর্থাৎ চুরি করার অপরাধে দণ্ডবিধি ঃ- প্রাককালে রূপিনী সমাজে চুরি করা এক গুরুত্ব পূর্ণ অপরাধ বলে গণ্য হত। এই দুবৃত্ত কাজের জন্য তিনবার পর্যন্ত সাধারণ দৈহিক দণ্ড দিয়ে অব্যাহতি দেওয়া হত। কিন্তু চারবারের সময় পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে এক হাত কেটে ফেলা হত। আবার অনেক সময় পরিবার সমেত সমাজ থেকেই বহিষ্কার করে দেওয়া হত; তা বিচারের রায় সাপেক্ষ। কিন্তু প্রাক আধুনীক কালে এসে চুরিবৃত্তির অপরাধীদের কঠোর দণ্ডবিধির অনেকটা শিথিলতা ঘটে এবং তা পক্ষপাত আকারে বিচার সৃষ্টি হয়। চাক্ষুস প্রমান ব্যতীত সন্দেহে চোর বলে দোষারোপ করাও শেষে হয়ে উঠে এক প্রকার অপরাধ। ফলে সাক্ষীকারী এবং আরোপিত চোর এর মধ্যে প্রমানের জন্য প্রবল দ্বন্ধের উপনীত হলে তখনই প্রয়োজন হয় "তীয়লুপমুন" অর্থাৎ জল

পরীক্ষা। বলাবাহুল্য, শুধু চুরির সঠিক প্রমানের জন্যই "তীয়লুপমুন" প্রনালীটি ব্যবহার করা হত না। সবক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ছিল। ইহার প্রনালী হচ্ছে যেমন ঃ সাক্ষীকারী এবং দুবৃত্তি কাজে আরোপিত উভয় এই জল পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। ইহা অংশ গ্রহণের আগে উপদেবদেবীকে মানস করে বাচ্চা মোরগ জলের মধ্যে উৎসর্গ করতে হয়। তারপর জলের নীচে মাটিতে গাড়া পরপর দুইটি দণ্ডায়মান বাঁশ ধরে সমান মুহুর্তে উভয়ে জলে ডুব দিয়ে যথাসম্ভব শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় জলের আধারে থাকার প্রয়াস করে। এইভাবে কিছুক্ষন জলের আধারে থাকার পর উভয়ের মধ্যে যে প্রথম উঠে পড়বে অর্থাৎ চুরি কর্মে আরোপিত ব্যক্তি যদি আগে উঠে পড়ে এতে প্রমান হয় যে, সেই প্রকৃতপক্ষে চুরি করেছে। আর যদি সাক্ষীকারী আগে উঠে যায় তাহলে তার প্রমান মিথ্যা বলে গন্য হবে। এই অপরাধে সামাজিকভাবে সামন্যতম অর্থ জরিমানা হলেও চুরির প্রমানের পর শাস্তি হবে ভিন্নতর। এইভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রমানিত হয় যে সেই প্রকৃত চোর তখন তাকে বিচারের রায়ে বা কিছু পরিষদবর্গ শুনানী দেবে তাই দণ্ড প্রদান হয়ে থাকে। চুরির দ্রব্য মূল্যায়নের উপর তাকে অর্থদণ্ড দাবী করা হয়ে থাকে এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে নেয়। তবে চুরিকৃত দ্রব্যাদি যথাযথ মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া বিচারে চুক্তি সাপেক্ষ ছিল; যদি ঐ দ্রব্যাদি ফেরতের প্রতিকূলতা আসে তাহলে খরিদমূল্য নির্ধারণ করে টাকা প্রদান করতে হয়।

খুনির দণ্ডবিধি ঃ- সামাজিক পরিকাঠামোর দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রাককালে রূপিনী সমাজে খুনাখুনী সচরাচর হয় না, বললেই চলে। তবে অনেক সময় অবচেতন অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে প্রহারের পর, অনেক সময় উক্ত ব্যক্তি মারাও যেতে পারে। সমাজের ব্যক্তিরা তখন তাকে খুনী বলে আরোপিত করে থাকেন এবং আক্রোশিতভাবে কিংবা হিংসাত্মক খুনাখুনী দৈহিকভাবে হয় না। দৈবের বলেই তখনকারদিনে মারামারি হয় বলে জনশ্রুতি হতে জানা যায়। কেউ যদি এই দৈবের বলে বলীয়ান প্রমান দাখিল করতে পারে তাহলে সেকালে সমাজে খুনীর অপরাধে আরোপ করা যায়, এবং তার হবে অন্যান্য চেয়ে কঠোর শাস্তি। সেকালে দুই কুড়ি অর্থাৎ ১২০টাকা খুনীর ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড সাধারনত সীমিতকরণ ছিল; সেটাই সেই যুগের উচ্চ পরিমানে অর্থদণ্ড।

যুগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তার সাথেভেসে যায় পুরানো দিনের আচার বিচারের ব্যবস্থার কথা এবং রূপিনীদেরও এই অবস্থা থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত ঘটেনি। ফলে উক্ত সমাজের পরিষদ পরিকাঠামো দিনের পর দিন শিথিল হতে, হতে বর্তমানে তা ক্ষীন অস্তিত্বের রূপ ধারন করে। শুধু নামই বিরাজ করে রয়েছে। অভিযোগকারীর অভাবে উক্ত পরিষদের কার্য পরিচালনা নিস্ক্রীয় হয়ে পড়ে। তবে সামাজিক বন্ধন অনুষ্ঠান কের পূজাতেই এইসব

পরিষদবর্গের সভ্যের চেহারা লক্ষগোচর হয় মাঝে মাঝে। এই অবস্থায় যুগের পরিস্থিতির পরিবেশে সমাজের অপরাধীদের বিচার করবে তা প্রত্যাশার অতীত। ত্রিপুরার শেষ রাজা বীর বিক্রমের সময় থেকেই খুনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক সরকারের বিচারালয়েতেই সম্পন্ন করতে হয়, আর প্রকৃত দোষীকারীদের দণ্ড হিসাবে কারান্বিত হতে হয়।

মারপিটের মীমাংসা বিধি ঃ কোন ব্যক্তি নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরে বেদম সে প্রহার করে থাকে। বিচারে যদি প্রহারিত ব্যক্তি নির্দোষ হয়ে থাকে, তাহলে বিচারে তাকে পুনরায় শারীরিক দণ্ড পেতে হয়, না হয় অর্থ দণ্ডে আরোপিত করা হয়ে থাকে। আবার যদি নির্দোষ ব্যক্তিকে প্রহারের পর অঙ্গে কোন হানি ঘটে তাহলে দুকুড়ি অর্থাৎ ১২০টাকা জরিমানা করতে পারেন। এই দণ্ডবিধানে মিটিয়ে ফেলার পর পরস্পরের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া হয় যাতে আর কোন পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে। বয়স্ক ব্যক্তি যদি কোন কম বয়সী ব্যক্তিকে প্রহার করে কারণ দর্শালে বিনা দণ্ডতে নিস্পত্তি করে নিতে পারে। কিন্তু একজন কম বয়সী ব্যক্তি যদি বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রহার করে তাহলে এটা জঘন্যতম অপরাধ বলে পরিগনিত হয়ে থাকে। এতে সমাজে বিচার ব্যতীত নিস্পত্তি লাভ হতে পারে না; তবে তা অভিযোগ দাখিলের সাপেক্ষ।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো এইসব মামলা ছোট খাটো বিচার গ্রামের পরিষদ সভায় সম্পন্ন করে মিটিয়ে ফেলতে পারে এবং আজও তা প্রচলিত আছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অপরাধীদের সাধারনত সরকার শাসনের হাতে তুলে দিতে হয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে, অগ্রজমান রূপিনী সমাজে উত্তরোত্তর নগন্য হতে যাচ্ছে তা নামেই শুধু বাহুল্য রয়ে যায়।

সম্পত্তি বন্টনের বিধি বিধান ঃ- রূপিনীরা রক্তগত সম্পর্কে অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিকতার সূত্রতে সংরক্ষিতভাবে পুষিয়ে রাখা হয়ে থাকে। আদিকাল থেকে চলে এসে প্রাকআধুনিক পর্যন্ত কেবল এই রীতির সূত্র ধরে সম্পত্তির বন্টন নির্ধারণ করা হত (পায়াংপাঞ্চির মধ্যে তা পূর্ব্বেই উল্লেখিত) এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে "পায়াংপাঞ্চি রীগমুন" অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতি নির্ধারণ। আসলে এই পায়াংপাঞ্চি পদ্ধতিতে সম্পত্তি প্রাপ্তির দাবীদার হতে পারে সেটা আদিম রূপিনীদেরই ঐতিহ্যবাহী সূত্র মাত্র যা অন্যান্য আদিবাসী সমাজে বিরল। কোন ব্যক্তির সন্তান সন্ততী না থাকলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠবে, পায়াংপাঞ্চি নির্ধারনে ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার। যখন তাদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়ে যাবে, তখন বিচারের মাধ্যমে সমাজ (লক') স্থির করে দেবে ঐ সম্পত্তির অধিকারী কে হবে। সামাজিক বিচার "দিয়ান" রায় ঘোষিত হবে তাই চূড়ান্ত

স্বীকার করতে হবে। তবে সমাজেও পায়াংপাঞ্চির মূল সূত্র ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। নিকটস্থ উক্ত পাঞ্চির সম্পর্করাই প্রধানত অগ্রাধিকার পাবে। তারপর নিকটস্থের মধ্যে কেউ না থাকে তাহলে বিক্ষিপ্ত পায়াংপাঞ্চি সম্পর্ক ব্যক্তিরাও অনেক সময় ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দাবীদার হয়ে উঠতে পারে এবং অনেক সয়ম পেয়েও যায়। কিন্তু পায়াংপাঞ্চি "অকচাক" অর্থাৎ স্ত্রীর গোত্র কোন সময় ঐ সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে না। তারা যতই নিকটস্থ সম্পর্কভুক্ত হোক না কেন। অবশ্য এই পায়াংপাঞ্চি উদঘাটন করে সম্পত্তির বন্টন প্রক্রিয়া শুধু নিঃসন্তান ব্যক্তিদের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু যারা সসন্তান জীবনযাপন করে পূর্ণ বয়সে গৃহকর্তা সংসার হতে পার হয়ে যায়, এদের ব্যাপারটা আলাদা। সাধারনতঃ পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের জেষ্ঠ্য পুত্রই সম্পত্তি এবং পরিবার দেখাশুনার অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন এবং তিনিই ভাইবোনদের নিয়ে যুগ্ম পরিবার পরিচালনে অভিবাবক হিসাবে স্বীকৃত হন। তিনি ইচ্ছা করলে ছোট ভাইদের পিতৃ সম্পত্তি বন্টন বুঝিয়ে দিয়ে পৃথক পরিবার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারেন। অন্যথায় তাদের পিতৃ সম্পত্তি দাবী করতে হলে সামাজিক বিচারের জন্য আবেদন করতে হবে তাও পায়াংপাঞ্চির নির্ধারনের সাপেক্ষ। কেননা বাপে যদি সপুত্র বিধবাকে পুন বিবাহ করে থাকে তাহলে সৎমাকে সঙ্গে নিয়ে আসা ঐ পুত্র সেই পরিবারে পালক হিসাবে বিবেচিত হবে এবং পাশাপাশি উক্ত পরিবারে রক্ত সম্পর্ক পায়াংপাঞ্চি হতে পারে না। এই সূত্রে ঐ পরিবারে সেই সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে না। তবে মানবিক পক্ষে জেষ্ঠ্য পুত্রের অনুমোদনক্রমে মৃত গৃহকর্তার সম্পত্তির কিছু অংশ উক্ত সতীন ভাইকে দেওয়া যায়। আধুনিক রূপিনী সমাজে এই পায়াং প্রথাতে সম্পত্তির বন্টন বিলুপ্ত প্রায়। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সূত্রের মাধ্যমে সম্পত্তি বন্টন এখনো চলছে।

জন কামুন ঃ- রূপিনী সমাজে 'জন' অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন হারা ব্যক্তিদের দূর সম্পর্ক আত্মীয় পরিবারে পালিত হিসাবে রাখাকে, তথাকথিত ভাষায় 'জন' বলে আখ্যায়িত হত। সাধারনতঃ পায়াংপাঞ্চি সম্পর্ক, গোত্রের সূত্র ধরে নাবালক ছেলে এবং মেয়েকে "জন" হিসাবে ভরন পোষন করতে হত। তা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পরিবার বর্গের পায়াংপাঞ্চি নির্ধারিত ব্যক্তিদের কাছেই এইসব অসহায় ছেলে মেয়েদের চুক্তি সাপেক্ষে তুলে দেওয়া হয়। যদি ছেলে বড় হয়, উক্ত 'জন' ঐ পরিবারের সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে। কেননা, সে ঐ পরিবারের বংশ সূত্রে পায়াং পাঞ্চি বটে। উক্ত "জন" ঐ দাবী সামাজিকভাবেও স্বীকৃত ছিল, তবে পরিবারবর্গের উত্তরাধিকার সদস্যের মত সমান হতে পারে না। মেয়ে 'জন' এর ক্ষেত্রে বিয়ে দিয়ে বিদায় করলেই, উক্ত পরিবারের চুক্তি মিটে যায়। তবে বিয়ের পূর্ব্বে তার পূর্ণ ভরন পোষন ঐ পরিবারকেই বহন করতে হয়।

অনেক সময় পায়াং পাঞ্চির উত্তরাধিকার সূত্রে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি দখল করে নিলে তাহলে, উক্ত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বা ঐ পরিবারের গৃহকর্ত্রীকে সম্পত্তিক সমেত সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত দখলদারী ব্যক্তি গৃহে নিয়ে এসে আজীবন সযত্নে লালন পালন করতে হয়। এই সূত্রে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর গোত্ররা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর দাবীদার হতে পারে না। কেনান তারা হচ্ছে "পাঞ্চিঅকচীক" অর্থাৎ স্ত্রীর গোত্র সম্পর্ক। আবার প্রয়াত ব্যক্তির স্ত্রী যদি এই মর্মে বলে যে, সে সম্পত্তি আয়ত্তকারী পায়াংপাঞ্চি সঙ্গে থাকার অনীহা প্রকাশ করে এবং সগোত্রের সঙ্গে আজীবন থাকতে চায়; তাহলে প্রয়াত স্বামীর কিছু সম্পত্তির অংশ ভাগ করে দিয়ে দিতে হয়। প্রায়শই উক্ত নিয়মেই প্রচলিত হয় বলে জনশ্রুতি থেকে জানা যায়।

রূপিনীদের প্রাককালের সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা রক্ত ধারা সম্পর্ক বলে যে "পায়াংপাঞ্চি" সূত্রে নির্ধারণ করা হত তা পিতৃতান্ত্রিকেই নামান্তর মাত্র। আধুনিক রূপিনীদের মধ্যে এই নিয়ম আদৌ বিদ্যমান হলেও নিঃসন্তান ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর, তাদের সম্পত্তি নিকটস্থ আত্মীয়দের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়। আবার নিকটস্থ আত্মীয়দের মধ্যে কেউ যদি না থাকে তাহলে নিকটস্থ নারী সম্পর্কও অনেক সময় সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে। প্রাককালের মত বিক্ষিপ্ত সম্পর্ক পায়াংপাঞ্চি খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে বের করে সম্পত্তি তুলে দেওয়া বর্তমান যুগে আর নেই। তখন নিঃসন্তান ব্যক্তির পালিত পুত্র না হয়, তার মনঃপূত ব্যক্তির নামেই সম্পত্তির ওয়ারিশ করে যায়। এরপর ঐ সম্পত্তির উপর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করার মত অধিকার থাকে না। সমতল ভূমিতে পত্তনের পর এই ভূ-সম্পদ রূপিনীরা আবাদ করছে, তা কমবেশী সবটাই সরকারী নথিভুক্ত মালিক এবং তার উত্তরাধিকার ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলেই যে কোন ব্যক্তিদের সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে পারে না। এইসব দেখাশুনার কাজ (পৌরাণিক প্রথাভিত্তিতে গড়ে উঠা সম্বল) সামাজিক শাসনের উপর সম্পত্তির মালিক নির্ধারণের জন্য ছাড়িয়ে দেওয়া হয় না। রাজস্ব এবং ভূমি আইন অনুসারে পিতৃ সম্পত্তি সংক্রান্ত নিয়ে আইন বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজনীয়তা আছে। একটি যুগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই দিন দিন ব্যবস্থাপনারও পরিবর্তন হতে থাকে। এতে নব্য সমাজের মানুষরা নিত্যনুতন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার প্রয়াসে উত্তরোত্তর তাদের আদিম সংরক্ষিত সামাজিক বিধিবিধান দিন দিন পশ্চাতে ঠেলে দেয়।

সামাজিকভাবে ত্রিপুরার রাজন্য বর্গের সঙ্গে রূপিনী সম্পর্ক

রূপিনীদের কিংবদন্তীর মতে প্রাচীনকালে তিপরা রাজরাজাদের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্কের প্রকাশ পায়। কিন্তু উপযুক্ত নিদর্শনের অভাবে উপস্থাপনা বাতুলতা ছাড়া আর

কিছু নয়। প্রাককালের লেখক অর্জুন দাস বৈরাগী এবং দ্বিজরাম গঙ্গা প্রমুখ ব্যক্তিদের লেখা পুঁথি থেকে কিছু কিছু সার নিষ্কাশন করা যায় যে, রূপিনীদের সঙ্গে তিপরার মহারাজরা বিশেষ সম্পর্কবদ্ধ ছিল বটে কিন্তু 'জুলাই' প্রজা বলে চিহ্নিত হওয়ার পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক অনেকটা খাট সৃষ্টি হয়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিপরার মহারাজার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও, রূপিনী গোষ্ঠীরা একেবারে রাজ-পাটের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করে দেয় নি। রাজার সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন হওয়ার পর অন্যদিকে ত্রিপুরার ঐতিহ্য প্রজাবৎ এবং সুহৃদয়নী মাতাইস্ত্রী অর্থাৎ ত্রিপুরার মহারানী রূপিনীদের (জুলাই) পরিচালনা এবং দেখাশুনার ভার হাতে তুলে নেন। তদবধি উক্ত গোষ্ঠীরা বৎসরান্তে রানীকে কর (কানসুমারী) বোঝার সময় জুম কৃষির উৎপাদনের কিছু কিছু অংশ এবং এর পাশাপাশি কারুকার্য্যকৃত বয়ন বস্ত্রাদি রানীকে (মাতা ইস্ত্রী) জমা প্রদান করতে হত। এইভাবে ১৫৮০ থেকে শুরু করে ১৯৩০খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে সিংহভাগ জুলাই প্রজা বলে ত্রিপুরার রাজার দ্বারা চিহ্নিত ছিলেন। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের আমলে চন্দ্র সাধু এবং যজ্ঞ সিং রূপিনী জুলাইদের মান্যগন্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন সমাজে যজ্ঞ সিং ছিলেন পরিষদবর্গের অন্যতম সভ্যপদে আসীন (কালেম) এবং অন্যদিকে চন্দ্র সাধু কোন পদে বহাল না থাকেলও ত্রিপুরা মহারাজের সঙ্গে একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একদিন উভয়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ হলে চন্দ্র সাধু এবং তার অনুগামী কয়েকটি পরিবার নিয়ে বড়মুড়ার পাদদেশে হাওড়া নদীর তটভূমিতে এসে প্রথম বসতি গড়ে তুলেন। মহারাজের অনুমোদনক্রমে বিশেষ করে তিনি ঐ নবগঠিত বসতির সর্দ্দার তথা রূপিনী গোষ্ঠীর প্রথম সর্দ্দারের প্রকট লাভ হয়। 'জুলাই' শব্দটি উন্মোচন করে এই দফাটির নাম রাখা হয় রান্তী (রূপিনী) এবং উক্ত দফাই প্রথম রাজার প্রজা বলে ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব রাখেন। তারপর চন্দ্রসাধু রূপিনী তার সর্দ্দারী প্রভাব প্রতিপত্তি আরোও প্রসারিত করার জন্য জুলাই (রূপিনী) থেকে কয়েকটি পরিবার ঐ রান্তী দফাতে সংযোজন করে নেন। পরবর্তীকালে তার নামকরনেই একটি বিরাট বসতি গড়ে উঠে। বর্ত্তমানে ঐ গ্রামটির নাম হচ্ছে 'চন্দ্রসাধু পাড়া'। অতঃপর প্রয়াত পিতার সিংহাসনে বীর বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সিংহাসনে আসীন হলেন তার সঙ্গে চন্দ্রসাধু রূপিনীর মিত্রতা আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছিলেন এবং রাজার পরম মিত্র বলে সমগ্র রূপিনীদের মধ্যে একটা হিড়িক পড়ে যায়। এতে রাজার ভূষিত প্রতিনিধি তথা রূপিনীদের প্রথম সর্দ্দারের প্রতিপত্তি বেড়েই চলে। চন্দ্রসাধু এর এই অসাধারণ প্রভাবে মোহিত হয়ে এবং তার সঙ্গে সামাজিক সূত্র বন্ধনের জন্য আরো কয়েকটি বসতি জুলাই (রূপিনী) সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে নবগঠিত সমাজ অর্থাৎ রান্তী (রূপিনী) দফাতে সন্নিবিষ্ট হয়। ত্রিপুরার রাজার অনুমোদনক্রমেই এই নুতন যোগদানকারীদের "নুতন রান্তী" বলে চিহ্নিত করা হয়। যারা পরবর্তী সময়ে নুতন রান্তী বলে আখ্যায়িত হয়েছিল এইসব বসতি হল যেমন ঃ বড় দোয়ার (বড় মুড়ার

পশ্চিম পাদদেশ তৈয়লাইফাং এর তটভূমি), চাম্পা (চম্পকনগরের দক্ষিণ), নারেঙ্গ (বড়মুড়ার পর্বতোপরি) তথাকথিত তারা সবাই চন্দ্র সাধু সর্দ্দারের অধিনস্থ ছিল ।

এইভাবে পুরান ও নুতন রাস্তী মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে ত্রিপুরার মহারাজা তাদের হালাম সম্প্রদায়ে সঁপিয়ে দিয়ে নানান রাজসম্মানে অনুকূলতা এনে দেন । ঐ নব গঠিত রূপিনী গোত্রের সামাজিক শাসন পরিকাঠামোর সবচেয়ে উচ্চপদস্থ এবং ত্রিপুরার মহারাজের দ্বারা স্বীকৃত একজন "রায়" বলে অধিষ্ঠ করে দেওয়া হয় । এই রায়ের নিম্নগামী পদ হিসাবে তাদের পূর্ব্বের পরিষদ বর্গের সভ্যরা বহাল রয়ে যান (অর্থাৎ কামছিকাউ এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা রায় পদটি ।) রূপিনীদের অপভ্রংশ যারা নিজেকে রানীর "জন" বা জুলাই প্রজার জন্য তাদের সীমিত অধিকার এবং পৌরাণিক আচার আচরণ ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে এতদিন ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, চন্দ্র সাধুর অবদানে সমাজের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনে সত্যিই সে দিন চমকে যায় । তাতে জুলাই রূপিনীদের অপর একটি অংশের সামনে একটি নুতন পথ প্রসারিত হয়ে যায় । ফলে শাক্ত ধর্মের অনুশীলনকারী রূপিনী গোষ্ঠীর একটি শাখা (অর্থাৎ জুলাই রূপিনীর শাখা) হালামভুক্তি গ্রহণের জন্য রাজার কাছে গিয়ে জোড়দার দাবী রাখে । পরপর রুপিনীদের দুইটি দফা "হালাম" সম্প্রদায় এর মধ্যে সঁপিয়ে দেওয়ার পর মহারানী এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ থেকে এক প্রতিবাদ স্বরূপ সাড়া আসে । তবু মহারাজা অনেক ভেবেশুনে 'হালাম'ভুক্ত করণের শেষতম দফা এবং "পাইথাক" ঐ দফার নাম আখ্যায়িত করে হালামের সাথে অন্তর্ভুক্তি করে দেন । গাদা বন্দুক, তলোয়ার, সোনার মোহর, ঝড়িৎ পোষাক পরিচ্ছদ সহ অনেক পুঁথি পত্র উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করেন "পাইথাকদফার" একজন উচ্চ পদস্থ রাজার প্রতিনিধি রায় বলে তাদের সমাজে অধিষ্ঠ করে দেন ।

অতঃপর জুলাই(রূপিনী) হিসাবে রয়ে যায় রূপিনীদের বিরাট একটি অংশ এবং যারা হিন্দু ধর্মের পরম প্রভাবিত সাধু, বৈষ্ণবের অনুশীলনকারীর অংশ এবং তার সঙ্গে মুষ্টিমেয় শাক্তবলম্বীর গোষ্ঠী সমূহ । বীর বিক্রম মাণিক্যের আমলে জুলাই (রূপিনী) দেখাশুনার কাজে নন্দ কেশব কর্তার কাছে দায় দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মহারানীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি (মাতা ইস্ত্রীখানচমা) । মহারানীর সহমর্মিতায় অনুপ্রানিত এবং সদাচারে লিপ্ত উক্ত কর্তা সাধু-বৈষ্ণবদের অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ।

যখন একের পর এক দফা বেঁধে, বেঁধে জুলাই জাতি অর্থাৎ রূপিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রহণ করেন । তারা রাজার প্রদত্ত সম্মানে মুখরিত হয়ে উঠে । এইসব তাণ্ডব কীর্তি দেখে অপভ্রংশ রূপিনী জুলাইরা নীরব থাকতে পারেনি এবং তা অচিরেই সাড়া উঠে 'জুলাই' অর্ন্তভুক্ত মুষ্টিমেয় শাক্ত অবলম্বী থেকে । এর প্রতিনিধিত্ব ভাবে পরিচালনা করেন অভিমুন্য রূপিনী এবং তার অনুগামীরা ; কিন্তু তারা ফলপ্রসূ করতে

পারেনি । কেননা এই সংশ্লিষ্ট দাবীতে সাধু, বৈষ্ণবের থেকে কোন মতামত নেয়নি । রূপিনীদের একটি অংশ যারা সাধু বৈষ্ণবের অনুশীলনে ব্যতিব্যস্ত তারা মহারানীর দ্বারা পরিচালিত "জুলাই" অর্থাৎ রানীর 'জন' বলে অভিহিত হলেও সাধারনত নামই শুধু বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রীতি নীতি চাঁপিয়ে দেওয়া হত না। তাই মদ মাংসে অপরিহার্য্য সামজিক রীতি নীতি হালামে উক্ত সাধু বৈষ্ণবদের সমাজ সঁপিয়ে দেয়ার বিষয়ে নন্দকেশব কর্তা অত্যন্ত অনভিপ্রেত ছিলেন। শাক্ত এবং সাধু দ্বিমত পোষনে হালামভুক্তের পর শাক্তরাই কেবল সমাজের আচার বিচারে সভ্য বা সর্দ্দারের পদ গ্রহণ করে থাকেন। এর প্রশ্ন তুলে রূপিনী জুলাই এর মধ্যে এক ভীষন গোলযোগ বাঁধে। এর সুবিচারের জন্য রাজার কাছে অভিযুক্ত হলেও জুলাই (রূপিনী) নব গঠিত হালাম (রূপিনী) এর তিনটি দফা সহ সমগ্র রূপিনীকে একটি বিচার সভায় আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং এই বিচার কাজে পরিচালিত করেন নন্দকেশব বাবু। তিনি সমাজের বৈষম্য সৃষ্টির মদত দাতা এবং সাধু বৈষ্ণবদের অবমাননাকারী ব্যক্তিদের জনবহুল বিচারের সভায় কঠোরভাবে দৈহিক শায়েস্তা প্রদান করেন। এইদিন থেকেই রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে "থাইথাক" নামে আরোও একটি দফার উৎপত্তি হয়ে চতুর্থ দফাতে (চারখিল) পরিনত হয়েছিল এবং তদবধি ঐ চারিদফাই 'হালাম' জাতি বলে সনাক্ত হয়েছিল। চতুর্থ দফা অনুমোদনের সময় রাজার একটি চুক্তি সন্নিভুক্ত ছিল যে 'সাধু বা বৈষ্ণবরা যদি সর্দ্দার বা পরিষদ সভ্যের পদে সম্মত থাকে এইসব পদে তাদের বহাল রাখা যায়..তবে মদ, মাংসের আচার অনুষ্ঠানে উক্ত সাধু বৈষ্ণবদের গ্রহণের বাধ্যবাধকতা করতে পারবে না।

তখন থেকেই রূপিনী গোষ্ঠীরা রাজার খাতায় হালাম বলে নথিভুক্ত হয় এবং তাদের সামাজিক শাসনের পরিকাঠামো সবচেয়ে উচ্চ পদ মর্যাদা তথা রাজার প্রতিনিধি হচ্ছে 'রায়'। হালাম ভুক্তির পরবর্তীকাল থেকে পুরান রাস্তী, নুতন রাস্তী, পাইথাক, থাইথাক এই চারটি দফায় চারজন সমাজের মুখ্য সভ্য হিসাবে রায় পদে অধিষ্ঠত হন। আবার বসতির মুখ্য পাত্র হিসাবে কিংবা বসতিকে দেখাশুনার জন্য একাধিক সর্দ্দার রূপিনীদের প্রত্যেকটি দফাতে সন্নিবিষ্ট করে দেওয়া হলেও উক্ত সর্দ্দাররা রায়ের নিম্ন পদের প্রতিনিধি। অন্যদিকে যারা প্রাক হালাম অন্তর্ভুক্তি কালে সমাজ শাসনের জন্য যে পরিকাঠামো ছিল পূর্ব্বের ন্যায় তারা স্ব স্ব মর্যাদা এবং কার্য নির্বাহে বহাল থাকেন শুধু 'কাঞ্চন বা কামসিকাউ এর 'কার্যদিকটি রায়ের নিম্ন পদ হিসাবে পরিগনিত হন। পূর্ব্বের সমাজ ব্যবস্থায় কামছিকাউ এবং মনোনীত সভ্য য়াকসুং-খুকসুং রায় এবং প্রশাসনের কাজে নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়েন। কেননা প্রাককালেও তাদের খুব একটা মুখ্য কাজে নিযুক্ত ছিলেন না। শুধু কামছিকাউকে সহযোগীতা করার কাজেই বহাল রাখা ছিল তাই সমাজ পুর্নবিন্যাসের পর "সেঙজাকীরাক" এবং "সেঙজা কুসুর" কাজ বৃদ্ধি পায়। আবার অন্যদিকে 'খান্ধল' সর্দ্দারের সহকারী হিসাবে অনেক সময় কাজ চালিয়ে যেতে হলেও পরিষদ সভাতেও তাদের

কাজ নিভাতে হতেন। ঐ নুতন সমাজে পরিষদ বর্গের সভ্য নিযুক্ত করার পদ্ধতি হচ্ছে ৫বছর অন্তর অন্তর ১২পাঞ্চীর লোককে সমান সুযোগ প্রদান করে, পর্যায়ক্রমিকভাবে মনোনীত করা হয়ে থাকেন এবং বঞ্চিত হয়ে কোন পাঞ্চির পক্ষে যাতে আক্ষেপ না করে, তার দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা করা ছিল।

সমগ্র রূপিনী গোষ্টীগত সমস্যা এবং অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ অথবা একটি দফায় তার দ্বারা বিচারের সমক্ষ হয়ে উঠবে না এইসব সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে (চারখিল কাঁথুমুন) চার মণ্ডলী মিলিতভাবে বসে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। রাজার অসম ভোজনে অংশ গ্রহণ করতে হলে, চারখিল গঠনের প্রয়োজন হয় না। স্ব স্ব মণ্ডলীর (দফা) মানুষ সম্মিলিতভাবে দশনা ভোজনের অনুষ্ঠান করে পরের দিন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রাজার অসম ভোজনে রওনা দিতে হন। যে বছর থেকে রূপিনীরা হালাম গোষ্ঠী বলে ত্রিপুরার মহারাজার দ্বারা স্বীকৃতি লাভ হয় এবং সেই বছর থেকে অসম ভোজনে সরাসরি রাজার সভাতে বসার অধিকার পান। সেইবছর থেকেই 'কানসুমারী' পরিবর্তে রাজাকে 'কর' বা খাজনা প্রদান করতে হয়। তারপর চারদিবসে রাজার অসম ভোজন সমাপ্তির পর মদ ও মোষ মাংসে আপোষ প্রতিনিধিবর্গরা নিজ বসতিতে প্রত্যাবর্তন করলে তা এক রাজকীয় সম্মান ছাড়া আর কিছু নয় (প্রাক হালাম সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধিদের স্বাগত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে হালামভুক্তির পর ব্যবস্থাপনা কোন পরিবর্তন ঘটেনি)।

হালাম গোষ্ঠী অর্ন্তভুক্ত হওয়ার পর রূপিনীদের সমাজ বিভাজনের লতিকা নীচে দেওয়া হল। আবার একে দফা বন্টনও বলা যায়। যেমন ঃ

জুলাই রূপিনী

↓

↓	↓
রাইমা	রান্তী
↓	↓
পাইথাক	পুরান রান্তী
↓	↓
থাইথাক	নুতন রান্তী

রাইমা রান্তী কথাটি রূপিনী জুলাইরা একে অপরের ডাক নাম এবং এই নামটি হালাম অর্ন্তমুক্তির পূর্ব্বেই উক্ত গোষ্টীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। যারা মাড়ক হাদু অর্থাৎ বর্ত্তমানে বড়মুড়া থেকে অবতরণ করে রাইমা ছড়ার সমতলবর্তী ক্ষেত্রে বসতি গড়ে তুলে তাদের 'রাইমা' বলে চিহ্নিত করা হত। অন্যদিকে যারা বড়মুড়া (মারক হাদু) পর্বতোপরি থেকে

স্থানান্তর করে উক্ত মুড়ার পাদদেশে রাস্তী নামে ছোট ছড়া তটভূমিতে এসে প্রথম বসতি গড়ে তুলে তাদের রাস্তী বলে আখ্যায়িত করা হত।

রাইমা শব্দটি উত্তরোত্তর ব্যবহৃত না হতে হতে বর্তমানে তা মুছে গেলেও কিন্তু রাস্তী শব্দটি প্রথমেই রূপিনীর বিচ্ছিন্নকারী গোত্রের নাম তাই দফার নামকরণ তাদের সমাজে চিরস্মরণীয়; বটে কিন্তু তাদের মধ্যে পরবর্তীকালে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। বলাবাহুল্য রূপিনী গোষ্ঠীর এই দলাদলী শাখা-প্রশাখা প্রাকালে ছিল; ফলে এটা সমগ্র রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য এবং মৈত্রেয়ী বন্ধনে নিতান্তই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

হালামভুক্তির পরবর্তীকালে সামাজিক শাসন পরিকাঠামো নীচে প্রদত্ত হল ঃ

রায়

↓

কাঞ্চন বা কামসিকাউ

↓

কালেম

↓

কাবুল

↓

চাঁপিয়া কতর ও চাঁপিয়া কুসু

↓

সর্দ্দার পাত্রমিত্র খান্তুল

↓

সেঙজা কীরাক ও সেঙজা কীসু

উজান (সাকা) রূপিনীদের সামাজিক পরিকাঠামো

সাকা রূপিনী এবং খামা (পশ্চিমা) রূপিনী সামাজিক পরিকাঠামো কিছুটা বৈশাদৃশ্য আছে। তবে সেঙজা কীরাক এবং সেঙজা কীসু নাম যেমন অভিন্ন তেমনি কার্য্যক্ষেত্রেও কোন পার্থক্য নেই। খুব সম্ভবতঃ রূপিনীদের এই দফা প্রতিবেশী পর রাজ্য সীমান্তে বসবাসকারী আদিবাসী বলে সরাসরি ত্রিপুর রাজের প্রতিনিধি মুনসীর দ্বারা সমাজ পরিচালিত ছিল এবং এই মুন্সীর বিকৃত নাম অনুসারেই মুক্তিয়ার শব্দটি নিষ্পন্ন হয় বলে একান্ত ধারনা। মুক্তিয়ারকে সাহায্য দানের আর একজন সহকারী মুক্তিয়ার থাকতে হয়। তাকে ছোট মুক্তিয়ার বলে আখ্যায়িত করা হয়। ছোট মুক্তিয়ারের নির্দ্দেশক্রমে সেঙজা কীসু, বিচার

বিষয়ক বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন ।

মুক্তিয়ার

↓

ছোট মুক্তিয়ার

↓

সেঙজা

↓

সেঙজা কুসু

সেঙজা কুসু থেকে ক্রমপদউন্নতি হয়ে মুক্তিয়ার পদে আসীন হতে পারে তবে তা তার কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে । প্রতি ৫বছর পর মুক্তিয়ার অবসর গ্রহণ করলে ছোট মুক্তিয়ার মুক্তিয়ারের কার্য ভার গ্রহণ করে থাকেন ।

সপ্তম অধ্যায়

রূপিনীদের শেণী বিভক্ত (পাঞ্চী)

রূপিনীদের কিংবদন্তীমতে বর্ণ বৈষম্য বা শ্রেণী বিভক্তকরণ ভারতের পৌরাণিক হিন্দুর ধাঁচে গঠন এবং তা গড়ে উঠেছিল বৃত্তি মূলকভাবে । এই কথাটি অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকতে পারে না, কেন না রূপিনীদের প্রাকপুরুষ ছিলেন ভারতের প্রাচীনতম আদিবাসী তথা অস্ট্রীক জাতিভুক্ত পাইলাং বা পায়াংদের উপগোষ্ঠী । কিংবদন্তী অনুসারে ত্রিবেগার প্রাচীনতম রাজা 'সুবরাই' এর বিয়ের অনুষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয়, কাজের বিশেষ দক্ষ এবং পটু ব্যক্তিদের । তখন তিনি বিশাল জনজাতি কিরাত গোষ্ঠী থেকে প্রতিটি কাজের বিশেষ দক্ষ এবং পটু ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে আছেন এই ভাছানু ব্যক্তিদের মধ্যে এক গোত্রের লোক তিনি বেশী পেয়েছিলেন কেননা কিরাতদের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁজগোজ সূক্ষ্ম নিপুন কারুকার্য্যে দখল ছিল না । এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে সুবরাই রাজা তাদের কার্য্য দক্ষতা এবং পটুতাই প্রসন্ন হয়ে সংস্কৃত ভাষায় তাদের ভূষন করেছিলেন । এই ভূষিত উপার্ধিই পরবর্তীকালে অস্ট্রীক ভাষান্তর করে রূপিনীদের

বর্ণের নাম রূপ লাভ হয় বলে জানা যায়। আবার কারোও কারোও মতে রূপিনী রাজার রাজ সভাতে প্রাককালে যারা স্ব স্ব দক্ষ এবং পটু হিসাবে কাজ নির্ব্বাহ সম্পন্ন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাদের বংশবিস্তার ঘটলে, তারাই এক একটি 'পাঙ্খী' অর্থাৎ বর্ণ সৃষ্টি হয় বলে অনেকে মত পোষন করতেন।

তৃতীয়তঃ রূপিনী ছিলেন সামাজিক নীতি প্রিয় গোষ্ঠী। সামাজিক পরিকাঠামো দৃঢ়ভাবে গড়াই তাদের মূল লক্ষ। তাই সমাজ পরিচালনার এবং স্বয়ং সম্পূর্নতা লাভের জন্য, প্রাককালে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত রেখে কাজের দক্ষতা ভিত্তিক কার্য্যভার তুলে দেওয়া হয় বলে অনেকে মত পোষন করে থাকেন। পরে উত্তরোত্তর বংশ বিস্তার করে একটি পাঙ্খীভুক্ত হয়ে ১২টি বর্ণে রূপলাভ করে। বলাবাহুল্য্য উত্তরকালে সামাজিক শাসন পরিষদের সভ্য মনোনীত করতে হলে, প্রতি ৮ বা ৫বৎসর অন্তর অন্তর প্রতিটি পাঙ্খীর পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রতিনিধি বাছাই করতে হত। যাতে কোন পাঙ্খীর পক্ষ থেকে পরিষদ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণে, বঞ্চিত বলে আক্ষেপ না জন্মে।

চতুর্থতঃ আবার কেউ কেউ অবতারনা করেন যে রূপিনীদের ধর্ম আচার অনুষ্ঠানে, যারা উত্তরাধিকার সূত্র থেকে সম্পন্ন করে এসেছিলেন এবং তাদের নিজ নিজ কাজের দক্ষতা অনুসারে পাঙ্খী বা শ্রমবর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল বলে, অনেকে অভিমত করে থাকেন। বস্তুতঃ প্রাককালে কোন গোষ্ঠীর বৈষম্য ছিল না। শুধু ভাষার প্রভেদ ছিল, তখনকার মূল বৈষম্য। ফলে রূপিনী গোষ্ঠী প্রথম সংগঠিত হয় কিছু কিছু অন্যান্য গোষ্ঠীর লোক সমন্বয়ে, এবং এই মিশ্র জাতি প্রথম উপনিবেশ গড়ে তুলে তীয় রূপিনীর উপত্যকায়। যারাপরে রূপিনী গোষ্ঠীতে এক বা একাধিক পরিবার নিয়ে অনুপ্রবেশ করে এবং তাদের স্ব স্ব প্রতিভা বা দক্ষতা প্রদর্শন করতে পেরেছিল। তাদের এই প্রতিভার জোড়েই এক একটি উপগোষ্ঠী (পাঙ্খী) নাম রাখা হয়ে থাকে। আবার যারা প্রতিভা শূন্য গোষ্ঠী কোন কাজে দক্ষতা দেখাতে পারেনি, প্রাককালে তাদের নবাগত গোষ্ঠীর নাম জুড়ে পাঙ্খীর নামকরণ হত। এইভাবে রূপিনী গোষ্ঠীর আভ্যন্তরিন একে অপরের বংশ ভিত্তিক নাম আদান প্রদানে শেষে উক্ত গোষ্ঠীর অন্তর ১২টি পাঙ্খী এর বিভক্ত হয়েছে বলে একান্ত ধারনা। এই বিভক্ত করণ পাঙ্খীর নাম হচ্ছে যেমন ঃ ১। কাজারী ২। তীয়র ৩। ফীঙচাউ ৪। কেরজাঙ ৫। সীমজাঙ ৬। মুড়িয়া ৭। দারিয়া ৮। সুতুবীরিছা ৯। পায়তাক্রা ১০। সূতার ১১। ফারুটে ১২। চুয়ানমীচীমছা ইত্যাদি। প্রাককালের রূপিনী সমাজে তারা কি কি কার্য্যে বহাল ছিল। পাঙ্খী বা বর্ণভিত্তি নীচে দেওয়া হল ঃ

কাজারী ঃ রূপিনী অন্তর গোষ্ঠী বর্ণে সবচেয়ে জনবহুল নিয়ে গঠিত হচ্ছে "কাজারী পাঙ্খী"; তারা আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত আছে। যেমন ঃ ১। বদ্রকালিম ২। পুরসাটটে

৩। পুঙখীরায় ৪। মসতন। রূপিনীদের প্রাচীনতম লোককথায় কাজরী গোষ্ঠীর একটি করুন কাহিনী ছিল। তা এইরকম যেমন ঃ হিড়ম্ব দেশের কোন এক রাজা তার শক্তিবর্ধকের জন্য প্রতিদিন রণচণ্ডীর মন্দিরে নরবলী দেওয়া হত এবং এই বলীর জন্য একমাত্র গোষ্ঠী হচ্ছে অগত্যা "কাজারী" গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ নয়। একদিন গরীব বিধবা মায়ের সন্তানদ্বয়ের মধ্যে জেষ্ঠ্য ভাইয়ের বলীদানের পালা এসে পড়ে। এই দুঃখে জর্জরিত দুই ভাই এবং মা সমেত গলাগলী করে ক্রন্দনের মুহুর্তে, ঐ পরিবারে একজন যুবক অতিথি হাজির হন। তিনি এই মর্মান্তিক কান্নার কারন বুঝিয়ে নিয়ে বলী দানের পালা জেষ্ঠ্য ভ্রাতার পরিবর্তে ঐ অতিথি যুবক অত্র বলী দানের জন্য প্রস্তুত হলেন, ঐ পরিবারের মা এবং দুই ভ্রাতা প্রানপণে আগুন্তুক অতিথিকে বারণ করলেও, কিন্তু অতিথি যুবক প্রতিরোধ উপেক্ষা করে, আত্মবলীর জন্য তত্র ছুটে চলে রণচণ্ডীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে। তারপর বলীকাঠে শির হেলন করে দিলে বারংবার খড়গের কূপেও ঐ অতিথিকে শিরচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়নি। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে হিড়ম্বরাজ তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন, অতিথিটি অদ্ভুত রূপ ধারনে, রণচণ্ডীর মন্দিরে নরবলী বন্ধ করার জন্য রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে বিলীন হয়ে যান। তদবধি কাজারীদের বংশবিস্তার অবাধ গতিতে চলতে থাকে তা মহামায়ারই একটা কৃপা বর্ষন বলতে পারেন।

সাধারণতঃ প্রাককালে কাজারীদের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বনের সঠিক তথ্য না পেলেও বিশেষতঃ তারা শিল্পবিলাসী এবং ধনবান ছিলেন বলে অনেকে অভিমত করে থাকেন।

তীয়র ঃ পৌরাণিক লোককথার ভিত্তিতে "তৈয়ব পাঙ্খী" সুবরাই রাজার বিবাহে জলবাহক হিসেবে কাজ করত, কিন্তু তা কতটা সত্য তার কোন নিদর্শন নেই। বুৎপত্তি অর্থ বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, তীয় = জল; য়র = প্রবাহ, অর্থাৎ সংযোজন হয়ে "জলপ্রবাহ"। কিন্তু জলপ্রবাহের সঙ্গে একটি গোষ্ঠীর কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? তাই এটা একটা রূপক উপাধি বলা যেতে পারে। কার্যতঃ এই পাঙ্খীভুক্ত লোক জলপ্রবাহের মত চটপটে কোন কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে এবং যে কোন কাজে, জলের মত নির্মলভাবে সমাধান করে থাকেন। তৃতীয়তঃ সামাজিক বিচার আচারে ঐ পাঙ্খীর লোক আইন প্রণয়নে সম্পর্কে জলের মত অভিজ্ঞতা রাখে এবং তাতে অনর্গল ভাবে তর্ক দিয়ে যেতে পারে। আবার কারও কারও অবতারনা যে তীয়র > তীয় = জল; হর = আগুন সংযোজন হয়ে 'জল আগুন' অর্থাৎ বিচারের সময় কোন কোন সময় জলের মত হয়ে, আবার কোন কোন সময় আগুনের ন্যায় তেজস্বময় হয়ে দোষী ব্যক্তিদের শাসন করতে হয়। খুব সম্ভবতঃ তারা প্রাচিন বংশধর "পায়াংদের" রক্তগত সম্পর্ক "তিয়র" বা "তীয়র" পাঙ্খীর মধ্যে বিশেষভাবে পেয়েছে বলে অনুধাবন করা যায়। কেননা রূপিনীদের সমাজের বিচার আচারের রীতি নীতির নাম এবং

সভ্যপদের নাম অস্ত্রীক ভাষা থেকেই রপ্ত হয়েছে তা সন্দেহের কারণ নেয়।

ফুঙচাউ ঃ কিংবদন্তী মতে ফুঙচাউরা সাধারণত সুবরাই রাজার বিবাহে বার্ত্তা বাহক তারা দূর দূরান্তে পদচারণে মাধ্যমে বিবাহের শুভ সংবাদ বিলিয়ে দিত। দ্বিতীয়তঃ রূপিনীরা ছিলেন সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজবদ্ধ জীব হয়ত তখনকার সমাজ ব্যবস্তা অর্বাচীন বা প্রাক আধুনীক কালে ভিন্নছাচ হতে পারে। হয়তো তাদের বিচার আচার রূপিনী রাজার অধিনস্থ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত না রেখে, বাইরের অন্য গোষ্ঠীদের বিচারের ক্ষমতাও রাখতে পারে। তাই দূরপাল্লাবার্তা- বাহক হিসাবে রূপিনী গোষ্ঠীরা মধ্যে "ফুঙচাউ পাঞ্চী" এরা মধ্যে সম্পন্ন করতে হত। দোষীব্যক্তি বা অপরাধী বিচারে অংশ নিতে কোন অনীহা প্রকাশ করলে এবং তাকে ঘর থেকে জোড়ে নিয়ে আসার অধিকার ছিল ঐ ফুঙচাউদের। সাধারণতঃ গড়নে তারা লম্বা এবং দৃঢ় মাংসপেশী ও গায়ে লোমশ যুক্ত হয়ে থাকে, এবং অনেকটা মঙ্গোলীয় বিশিষ্ট হতে ভিন্ন তাদের শারীরিক গঠনের লক্ষ করা যায়।

কেরজাঙ ঃ খামা রূপিনী (অর্থাৎ পশ্চিমা রূপিনী) দের মতে সাধারণত কের অর্থাৎ পূজা জাঙ অর্থাৎ পুরোহিত বা কর্তৃপক্ষ এবং তাদের গোত্রের মধ্যে অচাই অর্থাৎ ওঝার কাজকে বৃত্তিমূলক সমাজের অভ্যন্তরীণ চালিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আবার সাকা রূপিনী অর্থাৎ উজান রূপিনীদের সমাজে এই কেরজাঙ খীলের ব্যক্তিরা পূজার সময় পাঁঠাবলী মাংস ব্যতিত নাড়িভুঁড়ি কাটা ছেঁড়া সহ নিষ্কাষন করে খাদ্য উপযোগী করে তুলত। তাই তাদের নাম উক্ত রূপিনী গোষ্ঠীর সমাজে "পুনখিতে" বলেও চিহ্নিত করা হত।

সীমজাঙ ঃ সাধারনত সীমজাঙ খীলদের নির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বনের সম্পর্কে পরিষ্ফুটভাবে কোন ইঙ্গিত পায়নি বটে। আবার কেউ কেউ তাদের রূপিনী গোষ্ঠী অন্তর সামাজিক পূজা পার্ব্বনে শঙ্খ-ঘন্টা বাঁজার জন্যই সীমজাঙ পাঞ্চীদের গোষ্ঠগত অবলম্বন বলে জানা যায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্গত করতে গেলে কোন অর্থই পাওয়া যায় না, তাই এই শব্দটি পায়াংদের পৌরাণিক ভাষা অষ্ট্রীক ভাষার অর্ন্তগত শব্দই বলা যেতে পারে। আবার রূপিনীদেরপৌরাণীক ভাষা অন্তর্গত বুৎপত্তি বিশ্লেষন করলে যথা ঃ সম্ = টাকা পয়সা, জাঙ = বড়, অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ

মুড়িয়া ঃ মুড়ি শব্দ হচ্ছে শিঙ্গা বা বাঁশী, রূপিনীদের মধ্যে যারা শিঙ্গা বা বাঁশী বাজায় প্রাককালে তাদের মুড়িয়া বলে চিহ্নিত করা হত। মুড়িয়ারা সাধারণতঃ আচার অনুষ্ঠানে মুড়ি বাজাতে হয়। তাছাড়া যুদ্ধে সময়ে এই শিঙ্গা ধ্বনির আওয়াজে যুদ্ধ আরম্ভ এবং শেষ হওয়ার

ইঙ্গিত বহন করে থাকে। সেই সূত্রেই "মুড়িয়াখীল"এর মধ্যে বাঁশী বাজার বিশেষ একটি পারদর্শী ছিল বলেই তারা মুড়িয়া বলে আখ্যায়িত হত।

দারিয়া ঃ শব্দগত ভাবে দারিয়া এর সার্থকতা অর্থ খুঁজে পাইনি খুব সম্ভবতঃ অস্ট্রীক ভাষা থেকে এই শব্দটি রপ্ত হয়েছে বলে অবতারনা করা যায়। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় প্রহার জাতীয় 'ডোল' বাজককেই দারিয়া খীল বা পাঞ্চী বলে চিহ্নিত করা যায়। এই শব্দ সূত্রেই ককবরকের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙখল কথাটি প্রচলিত আছে। এই পাঞ্চীভুক্ত খামা রূপিনীদের গোষ্ঠীর অন্তর্গত সংখ্যায় নগন্য হলেও অপভ্রংশ সাকা রূপিনীদের অন্তর গোষ্ঠীতে তাদের সংখ্যা খুব একটা কম নয়।

সতুবরিছা ঃ এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যেমন সতু ছোট; বরাই জাতি (বড়ু) অর্থাৎ এই গোষ্ঠীরা সংখ্যায় খুব কম। এই পাঞ্চী অর্থাৎ উপগোষ্ঠীরা সাকা রূপিনীদের মধ্যে নেই। শুধু খামা রূপিনীদের অন্তর গোষ্ঠীর মধ্যে নগন্যতম সংখ্যায় দেখা যায়।

পাইতক্রা ঃ এই উপগোষ্ঠীরা সাধারনতঃ রূপিনীদের মধ্যে পালোয়ান গোষ্ঠী বলে ধরা হয়। প্রাককালে তারা কুস্তী, এবং নানান বল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হত। রূপিনী গোষ্ঠীর অর্ন্তগতএই মুষ্টিমেয় বর্ণকে তথা কথিত ভাষায়, "পাইতক্রা পাঞ্চী" বলা হয়ে থাকে, এবং তারা রূপিনীদের আদি পুরুষ, বলে বলীয়ান "হাইছার"বংশধর বলে জনশ্রুতি থেকে জানা যায়। এই বংশবৎ, পালোয়ানদের মধ্যে একজন কোন এক গোষ্ঠীর পালোয়ানের সঙ্গে এক "ঢালা" পূর্ণ ভাত এবং এক ডালা পূর্ণ তরকারী খাওয়ার প্রতিযোগীতা হয়েছিল। এই স্থান বর্ত্তমান অমরপুরস্থিত "ডালাক" নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

সূতার ঃ প্রাককালে রূপিনী গোষ্ঠী অন্তর্গত 'সূতার' এর অবলম্বন হচ্ছে নানান কায়দায় বেতের দ্রব্যাদি বয়ন, এবং কাঠের নানা জিনিষ নির্মাণ ছিল তাদের মুখ্য কাজ। শুধু তাই নয়, তারা হচ্ছে নানা শিল্পজাত দ্রব্যের কারিগরী এবং নিপুন কারুকার্য্যের দক্ষ বিশেষ শিল্পীকে তথাকথিত রূপিনীদের ভাষায় "সূতার" বলে আখ্যায়িত ছিল। অগ্রজ জাতিদের মধ্যে 'সূতার' বলতে কেবলমাত্র কাঠের মিস্ত্রীকেই নির্দিষ্টভাবে বুঝায়। কিন্তু রূপিনী গোষ্ঠীর অন্তর্গত 'সূতার' বর্ণ (পাঞ্চী) ব্যাপক শিল্পের পারদর্শী উপগোষ্ঠীকে বুঝায়। এতে রূপিনীর সূতার বর্নের নামকরণ অর্থবিস্তার লাভ হয়।

ফারুটে/পারুটে ঃপ্রাককালে এই ফারুটে পাঞ্জী' এর জন গোষ্ঠীই রূপিনীদের রাজা, "হাইছা" এর মাচান বহাক ছিলেন। আবার মধ্যবর্তীকালেও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মুখ্য সভ্যদের প্রয়োজনবোধে মাচানে বহন করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে হত। তাদের আকার সাধারণভাবে বেঁটে এবং খুব বলবান হয়ে থাকে। সাকা রূপিনীদের গোষ্ঠীঅর্ন্তগত ফারুটে পাঞ্জীভুক্ত সংখ্যায় অধিক ছিল।

চুয়ান মীচামছা ঃ অর্বচীনকালে সমাজের আচার অনুষ্ঠানের জন্য মদ ও কাঁচা মদ (চুয়াক বাই আরাক) সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল। এই জনগণের (লকনি) মদ ও কাঁচা মদ জোগান দেবার জন্য চাই বিশেষ দক্ষ কারিগরী গোষ্ঠীর উপর,এইসব উৎপাদনের ভার ন্যাস্ত থাকে। প্রাককালে রূপিনী সমাজে যারা এইসব কাজ নির্ব্বাহে জর্জরিত ছিল তাদের জনগোষ্ঠীকে তথাকথিত ভাষায় চুয়ান মীচুমাছা বলে চিহ্নিত করা হত। সামাজিকভাবে তাদের কোন মর্যাদা নেই বলে আজকাল এই বর্ণে কেউ পরিচয় দিতে চাই না। ফলে তারা বাহ্যিকভাবে অন্য বর্ন বলে পরিচয় দিতে দিতে উত্তরোত্তর এই পাঞ্জীর লোক নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

উজান (সাকা) রূপিনীদের শ্রেণীভাগ

রূপিনীদের 'খীল' বা দফা সৃষ্টি পেছনে সাকা বা খামা রূপিনীদের বিবরণ যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় বলে অরুন দেববর্মার পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়। তাদের এই গোষ্ঠীগত বা 'পাঞ্জী'করণের নেপথ্যে কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই এইসব উপগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিষয়ে তারা একমত।

প্রাককালে রূপিনীরা যখন তীয়রূপিনীর সংলগ্নের স্থানবতী এলাকার বাস করত, তখন তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে তীয়রূপিনীতে এসে একটি সার্ব্বজনীন পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠান করতে হত, এবং ঐ উৎসব উক্ত স্থানে বাসিন্দা রূপিনীদের আদি কাল থেকেই তারা মেনে আসছিল। ঐ উৎসবের পরিচালক হল 'হাইছা' অর্থাৎ রূপিনীদের রাজা এবং পূজার কাজের সম্পাদনার ধর্ম এবং পূজা পার্ব্বনের সর্ব্বচ্চ পুরোহিত, তথাকথিত ভাষায় 'অচাই ঝুগু' ছিল মুখ্য। এই সুবৃহৎ আনুষ্ঠানিক কাজ নির্ব্বাহের জন্য অগনিত কর্মঠ লোকদের সাময়িকভাবে নিয়োগ করতে হত বলে উত্তরোত্তর তাদের স্ব স্ব কাজের দক্ষতা বেড়ে যায়। পরবর্তী পূজায় তাদেরই

আবার উক্ত কাজের সম্পন্নের জন্য ডাকা হয়ে থাকে। এইভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত পূজার কাজে জড়িতবদ্ধ হয়ে এসে উত্তরকালে একটি জনগোষ্ঠীর আকার ধারণ করে ; এইসব ভিন্ন ভিন্ন কাজের দক্ষ ভিত্তিতেই গড়ে উঠে ১২টি বর্ণ (পাঞ্চি)। তাই আজকাল রূপিনী গোষ্ঠীর অন্তর্গত শ্রেণী কতকি নাম হিসাবে তারা সযত্নে লালিত রেখেছে।

সাকা রূপিনীদের মধ্যেও "বারপাঞ্চী" এর উল্লেখ আছে বটে। কিন্তু মধুবনের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে আট (৮)বর্নের অধিক পূর্ণাঙ্গভাবে বলতে পারিনি, নীচে তাই দেওয়া হল ঃ

১। **পারতে/ফারতে ঃ** পাল্কী বা মাচান বাহক (খামা রূপিনীর অনুরূপ)।

২। **হাতানছা ঃ** হা মানে মাটি; তান মানে কাটা, ছা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ছেলে ; মূলগত অর্থে ছা কথাটির অর্থ হচ্ছে মানুষ। বস্তুতঃ যারা মাটি কাটে তাদের হাতানছা বলে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণতঃ উক্ত গোষ্ঠী পূজার মণ্ডপ বসার স্থানে, মাটি কেটে পরিষ্কার করা ঐ গোষ্ঠীদের বিশেষ একটা ভর্তানো ছিল। তাছাড়া বসতির অঙ্গন পরিষ্কার রাখা, রাস্তা ঘাট মেরামত করা, ও তাদের কাজের আওতায় আনা হয় বলে জানা যায়।

বায়ুঙছা ঃ বায়ুঙ কথাটির অর্থ কচু। কচু সাধারণতঃ কোন পূজার কাজে ব্যবহৃত না হলেও কচু পাতার দিকটি চিন্তা করলে অনেকটা পরিষ্কার অর্থে উপনীত হতে পারে। রূপিনীদের আদি পূজা যদি তৌয়রূপিনীর কূলবর্তী স্থানে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে, প্রসাদ ও বলীর মাংস বিতরণের একমাত্র অনুকূলতা ছিল কচুপাতার মাধ্যমে এবং কচু পাতা সংগ্রহ করে যে ব্যক্তিরা ('তৌয় খীলীম') পূজার প্রসাদ বিতরণ করে থাকে, তাকে তথাকথিত ভাষায় 'বায়ুঙছা' বলে চিহ্নিত করা হত। পরবর্তীকালে তারা হয়তো সহজলভ্য কচুপাতা বর্জন করে কলা পাতার দ্বারা আরও সুন্দর ভাবে বংশবলম্বন প্রসাদ বিতরণের কাজকে হয়তো সম্পন্ন করতে পারেন।

৪) **নারেঙছা ঃ-** বুৎপত্তিগত গত অর্থানুসারে কোন প্রকার খুঁজে না পেলেও বাস্তবিক কর্মের দিকে লক্ষ রেখে, তাদের নাকমরণের নেপথ্যে কিছুটা অর্থলভ্য

হয় । সাধারণতঃ ("তৗয়খীলুম") পূজার আয়োজনার্থে জ্বালানী কাষ্ঠ এবং ৰাঁশ সংগ্রহকারী ছাড়া আর কোন রকম বৃত্তি থাকতে পারে না তা নিঃসন্দেহ ।

৫। তৗয়ল/তিয়র ঃ খামা রূপিনীদের সংগে কোন প্রভেদ নেই ।

৬। মুড়িয়া ঃ খামা রূপিনীদের সঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্যতা আছে। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি ।

৭। খাড়িয়া/দাঁড়িয়া ঃ প্রাককালে তারা ঢাঁক বাঁজার কাজ করে তাদের পৌরাণিক ককবরক ভাষায় "দাঙখল"বলে ।

৮। কেরজাঙ ঃ এই পাঞ্চির বৃত্তি অবলম্বনটি খানা রূপিনীদের সঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্যতা আছে। সাকা এবং খামা(উজান এবং পশ্চিমা) রূপিনী গোষ্ঠীর অর্ন্তগত উত্তরকালে দফা বিভক্ত নীচে দেওয়া হল ঃ

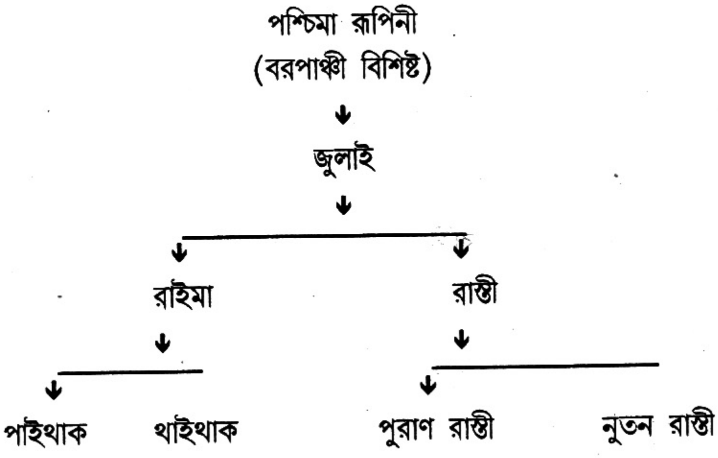

↓

উজান রূপিনী

(বারপাঞ্জী বিশিষ্ট)

↓

↓ ↓

ত্রিপুরা বর্মন রূপিনী

↓

দেববর্মা

রূপিনীদের দফা ভিত্তিক অবস্থান ঃ বর্তমানে পুরান রাস্তীরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ে ছিটে কৈলাশহরস্থিত ছৈলেংটা, গয়নামা, ময়নামা আরকিছু অংশ সিন্ধু কুমার. জাম্বীর ছড়া পর্যন্ত তাদের আবাসস্থান দেখা যায়। অমরপুরস্থিত তৈদু-তেও পুরাণ রাস্তীদের কিছু অংশ দেখা যায়। তেলিয়ামুড়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে তাদের সংখ্যা সবচেয়ে অধিক। চম্পক নগরে পূর্ববর্তী বড়মুড়ার পাদদেশে সাধুপাড়াতেও ঐ পুরাণ রাস্তীদের সংখ্যায় খুব একটা কম নয়। বলাবাহুল্য এই সাধু পাড়া থেকেই প্রথম পুরাণ রাস্তীদের উদ্ভব হয়। এই গোষ্ঠীর সংখ্যা কোন অঞ্চলে কত পরিবার আছে তা নীচে দেওয়া হল ঃ

কৈলাশহর ঃ গয়নামা ১২ পরিবার, মরাছড়া ৭১ পরিবার, জাম্বির ছড়া ৩ পরিবার, ছৈলেংটা ৭ পরিবার, সিন্ধুকুমার ২ পরিবার, খাগড়া ২৫ পরিবার।

অমরপুর ঃ তৈদু ৭ পরিবার।

খোয়াই ঃ হাওয়াই বাড়ী ৪ পরিবার, শনলং বা মুঙকুরুই সর্দ্দার পাড়া - পরিবার, পুরাণ তৈয়কৈ পাড়া ১৩ পরিবার, কলোনী তৈয়কৈ পাড়া ২৯ পরিবার, চিন্দ্রাই পাড়া ১৫ পরিবার, ছিতক পাড়া ৩ পরিবার , ছিকাম তৈয় চাকমা পাড়া ১৫ পরিবার, রুঙবেল পাড়া ৭ পরিবার, রুপাছড়া ৪১ পরিবার।

সদর ঃ সাধুপাড়া ৬০ পরিবার, ছিকাম তৈয়ছা ৩ পরিবার।

নুতন রাস্তী অবস্থান ঃ নুতন রাস্তীরা সাধারনত সদর মহকুমার মধ্যে বেশী

০৬

দেখা যায় । পুরান রাস্তী অপেক্ষা তাদের সংখ্যা তুলনা মূলকভাবে অনেক কম । কেননা তারা পুরাণ রাস্তী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, আরেকটি দফা । অরুন দেববর্মার (সহকারী গবেষক) পাণ্ডুলিপির মতে রূপিনীদের একটি অংশ মায়ানী হারুং থেকে বিতাড়িত হয়ে তাদের একটি গোষ্ঠী বড়দোয়ারে বসতি স্থাপন করে এবং রাজার কাছে বশ্যতা বা মিত্রতা স্থাপনের পর রূপিনী কাসককে ১২৩২ত্রিং সালে ৮ ভরি ওজনের কন্ঠ হার এবং মেডেল প্রদান করেন । তাছাড়া বন্দুক (গাদা), দা এবং রূপার চুঙ্গি সহ জামা ও পাগড়ি পুঁথিপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন । মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের আমলে বড়দোয়ার বসতিতে উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধির ফলে রূপিনীদের একদল চাম্পাতে গিয়ে বসতি শুরু করেন । কিন্তু বড়দোয়ার ও চাম্পা রূপিনীদের মধ্যে সচরাচর যাতায়াত এবং সামাজিক সম্পর্ক রাখতে হত । নুতন সমাজের সঙ্গে এইভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিবাদে চন্দ্র সাধুর অভিযোগে তাদের পুরাণ রাস্তী থেকে বহিষ্কার করা হয় । তারপর মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সময়ে রাজদরবারে গিয়ে তাদের নুতন দফা সৃষ্টি করে সর্দ্দার নিয়োগের আবেদন জানান । তারপর মহারাজা তাদের মোহর প্রদান করে সর্দ্দারের ক্ষমতা ও বন্টন করে দেওয়া হয় । অদ্যাবধি বড়দোয়ার, চাম্পাবাড়ীতে নুতন রাস্তী দফার লোক বলে তাদের একজনকে 'রায়'ও মনোনীত করা হয়েছিল । তাদেরই দফার একটি অংশ বড়মুড়ার দক্ষিণ অংশে পর্বতোপরিতে একটি বসতি গড়ে তুলে এই পাড়াটির নাম হচ্ছে ''নারেঙ'' পাড়া । তাহলে পরপর তারা তিনটি বসতি ও নুতন রাস্তী বলে চিহ্নিত হল ।

তাদের বসতির নাম, স্থান এবং পরিবারের সংখ্য নীচে দেওয়া হল ঃ সদর ঃ বড়দোয়ার জমি বড়মুড়ার মাঝামাঝি তীয়লাইফাঙ এর তটভূমি ১৮ পরিবার, চাম্পা বাড়ী চম্পক নগরের পূর্ব দক্ষিণ কোনে অবস্থিত এবং চাম্পা ছড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে ৩৭ পরিবার, বড়মুড়ার দক্ষিণ অংশের পর্বতোপরি পল্লী হচ্ছে 'নারেঙ'পাড়া । তাদের মধ্যেও আবার দুইটি পাড়া বিভক্ত হয়ে যায় । পুরাণ নারেঙ পাড়া ১৫ পরিবার , নুতন নারেঙ পাড়া ১৮ পরিবার ।

পাইথাক দফার অবস্থান

পুরাণ রাস্তী এবং নুতন রাস্তী দফা গঠন করে হালাম অর্ন্তভুক্তির পর ত্রিপুরার মহারাজের অনুকূলেতে উভয় দফার সর্দ্দারদের ক্ষমতা, এবং প্রতিপত্তি দেখে, জুলাই,

জাতির শক্তবলম্বীদের একটি গোষ্ঠী মোহিত হয়ে উঠে। ভাঙ্গা রূপিনী, তাঁরাচান্দ রূপিনী ও ভক্ত নারায়ণ রূপিনীদের প্রতিনিধিত্বে জুলাই থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন নিয়ে, রাজার কাছে বারংবার দরবার করেছিলেন। তারপর বীর বিক্রম ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অনেক ভেবেশুনে রূপিনী অন্তর গোষ্ঠীর তৃতীয় দফা স্বীকৃতীতে হালাম অর্ন্তভুক্তি করে দেন এবং রায় বলে কামছিকাউ এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মুখ্য সভ্য নিয়োগ করে দেন। এই তৃতীয় দফার নাম হচ্ছে "পাইথাক দফা"। তাদের অবস্থান এবং পরিবারের সংখ্যা নীচে দেওয়া হল ঃ

খোয়াই ঃ তেলিয়ামুড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে বড়মুড়ার পূর্ব্ব পাদদেশে রূপিনী পল্লী গুলি হচ্ছে; ধন চাকমা পাড়া ৩৫ পরিবার, কালী কুমার পাড়া ৩৫ পরিবার, তৈয় চাকমা পাড়া ৪৬ পরিবার, তারাচাঁন্দ পাড়া ২৫ পরিবার, বড়দেয়ার ছড়া ৫ পরিবার।

সদর ঃ রাইমাছড়ার উপত্যকার সমতল ভূমিতে বসবাসকারী পাইথাক দফা হচ্ছে যেমন ঃ অথুককী থাঙ্গ পাড়া ২২পরিবার, বেলফাঙ পাড়া ১২ পরিবার, টাকতুকু পাড়া ৬ পরিবার, নুতন টাকতুকু পাড়া ১১ পরিবার, রক্তিয়া পাড়া ৩৪ পরিবার।

থাইথাক দফার অবস্থান ঃ

রূপিনীদের কতিপয় ব্যক্তি সর্দ্দার প্রাপ্তের প্রলোভনে, রাজার অনুকূলতায় প্রতিপত্তি বিস্তার করার মোহিত হয়ে, এবং একেবারে এক রূপিনীদের অর্ন্তগোষ্টীর মধ্যে তিনটি দফা সৃষ্টি করে "হালাম" ভুক্ত গ্রহণ করে। তারপর শুধু রয়ে যায় জুলাই রূপিনীদের অপভ্রংশ সংখ্যায় অধিক যারা সাধু বৈষ্ণব ধর্মের অনুশীলনকারী। রাজার দ্বারা সর্দ্দারের মর্যাদা বিলিয়ে দেওয়া এবং রাজ প্রদত্ত ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তারের ঝাঁক জমক মুষ্টিমেয় শাক্ত অবলম্বী জুলাই রূপিনীদের কাছে আর সহ্য হয়নি। তবে তাদের সংখ্যা কম হওয়াতে স্বনির্ভরশীল হয়ে মাথাচারা দিতে পারেনি। এই নবগঠিত তিন গোষ্ঠী দ্বারা তাচ্ছিল্যতা প্রদর্শন এবং সমগ্র জুলাই প্রজাদের প্রতি যেভাবে হেয় প্রতিপন্নতা ফেলেছিল, শুধু শাক্ত কেন, সাধু বৈষ্ণবেরাও তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ফলে মুঙকুরুই রূপিনী (শাক্ত) বিশ্বমণি রূপিনী (সাধু) উভয় পক্ষের প্রতিনিধিত্বে, এই প্রবল অতিষ্ঠের রাণী রাজার কাছে তুলে ধরলেন, মহারাজ তা বদ্যান্যতায় উড়িয়ে দেন, এবং তা প্রবলভাবে আঘাত

হানে সমগ্র জুলাই গোষ্ঠীর উপর। শেষে মায়াপ্রসাদ রূপিনী (সাধু) এবং আরও কয়েকজনকে মদত পুষ্ট করে ভৃগুদাস বাড়ীর সাধু, বৈষ্ণবদের পরিবার নিয়ে এক বিরাট দল গঠন করা হয়েছিল। বার বার রাজার কাছে দরবারের পরও তিনি জুলাই গোষ্ঠীদের হালাম ভুক্তি করনে সহসা মেনে নেননি (তিনি একটি কথায় দৃঢ়বদ্ধ যে, জুলাই জাতি হচ্ছে রাণীর সেবা যত্নের জন্য, এবং মহারাণী স্বমহিমতার লোক তারা আবার হালাম ভুক্তি নিয়ে নীচে অবতরণ করবে কেন)। তবুও নাছোড়বান্দার মত একশ প্রশ্নের দাবী চালিয়ে গেলে শেষে মহারাজ অতিষ্ঠ হয়ে রূপিনী অর্ন্তগোষ্ঠীর চতুর্থ-দফা শেষতম দফা বলে হালামে অর্ন্তভুক্তির জন্য স্বীকৃত প্রদান করেন। এই চতুর্থ দফাটির নাম হচ্ছে "থাইথাক" অর্থাৎ থাই = শেষ; থাক = চরম। প্রসঙ্গতঃ আসলে হালামের সমাজ ব্যবস্থায় অবাধে মদ মাংসের স্বীকৃত ছিল, এবং আচার অনুষ্ঠানে মদ মাংস ব্যতিত শুভ কাজ সম্পন্ন হয় না। সাধু বৈষ্ণব অনুশীলনকারী তাদের সমাজের প্রতিনিধিত্ব বা সভ্য গ্রহণ করা দোষেদৃষ্ট ছিল।

তাই থাইথাক দফা স্বীকৃত দেওয়ার আগে মহারাজার পক্ষ থেকে একটি চুক্তিবদ্ধ রয়ে যায়, যে "রায়" থেকে আরম্ভ করে "সেঙজাকুসু" পর্যন্ত পৌরাণিক শাসন ধাঁচে সে সভ্য নিযুক্ত থাকবে তারা হবে শাক্তবলম্বী গোষ্ঠীর অংশ থেকে এবং তাদের দেখাশুনার জন্য উক্ত দফাতে একাধিক সর্দ্দার বহাল থাকবে। এই সব সর্দার সাধু বৈষ্ণব অনুশীলনকারী মধ্যে নিযুক্ত করা হবে। বিশেষ করে এই সর্দ্দাররা দফার প্রথম পথিকৃৎ এবং মহারাজার দ্বারাই মনোনীত হয়ে থাকেন। এই পাইথাক দফার অবস্থান এবং পরিবারের সংখ্যা নীচে দেওয়া হল ঃ

সদর ঃ বিশেষ করে পাইথাক দফার বড়মুড়া উপরি অংশ এবং এর পশ্চিম পাদদেশে জুড়ে বসবাস করতে দেখা যায়। নবীসিং পাড়া ২৭ পরিবার, ভৃগুদাস বাড়ী ২০০ পরিবার, তৈয়কলইপাড়া ৬ পরিবার, দমতী পাড়া ৩ পরিবার, গাঙ্গালং পাড়া ১৩ পরিবার, তৈয়ছাসিত্রমাপাড়া ১৩ পরিবার, খানথীং পাড়া বা বনকুমারী ১০৫ পরিবার, বিশ্বমণি পাড়া ১৭ পরিবার, নুতন খানথীং পাড়া ৩ পরিবার।

পৌরাণিক দফা বিভেদ নির্বাচনে পুরান রাস্তী, নুতন রাস্তী এবং পাইথাক, থাইথাক সম্মিলিত ভাবে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিশাল বসতি গড়ে তুলে। এই বসতিটির নামকরণ হয় "সিনাইকামী" দফা বিভেদ মুছে ফেলার জন্য নব্য রূপিনী খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যে নুতন উদ্যোগ বলে স্বীকার করতে হয়। এই সিনাইকামী ১৪০ পরিবার নিয়ে গঠিত, এবং এর উদ্যোগতা ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্বলম্বীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সাকা রূপিনীদের দফা ভিত্তিক অবস্থান

সাকা রূপিনীদের শ্রেণীভুক্ত করণকে দফা বলে অভিহিত না করে প্রকারান্তে গোষ্ঠী পরিবর্ত্তনে বলা যায়। তবে অরুন দেববর্মার পাণ্ডুলিপির মতে মহারাজা বীর বিক্রমের আমলে সাকা রূপিনীদের নোয়াতিয়া বা ত্রিপুরা বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং সেই সূত্রেই তারা নামের শেষে "ত্রিপুরা" লেখার সূচনা করে। কিন্তু বর্ম্মন এবং দেববর্মা উপাধি লেখার সূত্রে কোন মহাত্মা অনুমোদন দিয়েছেন এবং এই উপদেশদাতার এখনো অজ্ঞাত রয়ে যায়।

ত্রিপুরা বা তিপরা দফার অঞ্চল ভিত্তিক অবস্থান

কাছাড় জেলা ঃ কেলতি ২৫ পরিবার, ছাগলমুয়া ৫ পরিবার, ঢোলকছড়া - পরিবার, বেতারবন - পরিবার, দামছড়া ২৫ পরিবার।
ত্রিপুরা ঃ বৈরাগী বাড়ী (ধর্মনগর) ৩০ পরিবার, মধুবন (ধর্মনগর) ৩৫ পরিবার, আশীদ্রোন (ধর্মনগর) ৩৮ পরিবার, রাজনগর ৯ পরিবার, বাড়ীদোম ৬ পরিবার।

বর্মন দফার (রূপিনী) অঞ্চল ভিত্তিক অবস্থান

কাছাড় জেলা ঃ চেরাগীস্থিত বুটুছড়া ৩৫ পরিবার, ঢোলপ ছড়া ৭০ পরিবার, বেতারবন ৪৫ পরিবার, মুনুষ্যপুর - পরিবার, জীবনপুর-পরিবার

দেববর্মার দফার (রূপিনী) অঞ্চল ভিত্তিক অবস্থান

ধলাই জেলা ঃ কাঞ্চন ছড়া ১৫ পরিবার, নালকাটা ১৫ পরিবার। নিজের গোষ্ঠীর নাম অপরিবর্তিত অবস্থায় রূপিনীদের মধ্যে যারা এখনো আঁকড়ে ধরে রেখেছে তারা হল ঃ
দামছড়া ঃ পূর্ব্বরহোম ছড়া ২৫ পরিবার, কাঞ্চন ছড়া ঃ হাজারাধন পানা ৪ পরিবার।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস

আদিকাল থেকেই গোটা রূপিনীর সমাজে ঐতিহ্যবাহী প্রথানুসারে আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্ব্বন, এবং মানসী ও উৎসর্গ এইসব উত্তরাধিকার সূত্র থেকেই

পালন করে এসেছিল। সামজিক রীতি নীতির সঙ্গে এইসব আচার আচরণ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিল এবং কোন কোন লোকাচার সামাজিকভাবে অপরিহার্য্যতা লাভ করেছে; তা লঙ্ঘনে সামাজিক ভাবেই দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে লোক প্রচলিত রীতিশ্রদ্ধ হিসাবে পালন করে আছে। উত্তরোত্তর এই প্রচলিত রীতি নীতি অবলম্বনে তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট করে তুলে, এবং এই লোকাচার অবলম্বন ও বিশ্বাসকেই সেকালের ধর্ম বলে আরোপিত করলেও কোন ভ্রান্ত হবে না মনে করি।

সুপ্রাচীনকালে রূপিনীরা ছিলেন, নিরাকার ও নাম না জানা প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। এক্ষেত্রে তারা অষ্ট্রীক জাতির সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক অশরীর শক্তি দ্বারা গ্রাস, এবং কবলিত বলে উপলব্ধি করতে পারলেও তার যথাযথ প্রতিকার ও নিরাময় করা লৌকিক বিদ্যা সেকালে তাদের ছিল না। দ্রব্যগুণ অর্থাৎ বনজাত ঔষধের দ্বারা রোগ নিরাময়ের প্রচেষ্টাই সেকালে প্রবল ছিল বলে বিশেষ সূত্র থেকে জানা যায়। পূজা ও উৎসবে রোগ প্রশমিত করণ কোনক্রমেই ছিল না। যখনি প্রাচীন শৈব্যধর্ম রূপিনী গোষ্ঠীদের মধ্যে অনুপ্রানিত করে তুলে, উপাসনার মাধ্যমে দোহাই দিয়ে রোগ নিরাময়ের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। সেই আদিকাল সূত্রে ধরে আসা অশরীরি শক্তি মানুষকে অনিষ্ট সাধন করতে পারে এবং এ বিষয়ে নিবীড়তা প্রাক আধুনিককালে এসেও পুরাদমে ছেড়ে উঠেছে তা নয়। শৈব্যধর্মের দেব দেবীর সঙ্গেই এই পৌরাণিক বিশ্বাসকে সযত্নে গেঁথে রেখেছে। প্রাকৃতিক শক্তি অনিষ্ট সাধনের রোগ গ্রাস করণের কয়েকটি লক্ষণ হচ্ছে যেমন ঃ “হুকথাই নাঙমুন”, (জুম ক্ষেত্রেরদ্বারা গ্রাসিত রোগ) নকথাই দোষ, (ভিটে মাটির গ্রাসিত রোগ), বউমানচাকমুন (খারাপ হাওয়া গ্রাসিত রোগ), তীয়নাঙমুন (জল গ্রাসিত রোগ)। সেকালে এইসব রোগগ্রস্থের চিকিৎসা বনাজী ঔষধের প্রলেপ, এবং সেবনের মাধ্যমেই নিরাময় করে তুলা হত (শৈব্য ধর্মাবলম্বীর পূর্ব্বে)।

মধ্যবর্তীকালে যখনি চারিপাশে শৈব্যধর্মের প্রভাব আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে উঠে তখন রূপিনী গোষ্ঠীদের মধ্যেও এই ধর্ম প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার হয়ে উঠে তা সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শৈব্যধর্ম অনুপ্রানিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, রূপিনীদের মধ্যে লোকাচারবদ্ধ উপসনার মাধ্যমে উৎসর্গ এবং মানসী, দোয়াই অনেক কিছু বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। তখন তাদের প্রাককালের প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা গ্রাসিত রোগ, নামধারী এক একটি উপদেবী উদ্ভব হয় এবং তাদের গ্রাসেই রোগ

সৃষ্টি হয়েছে বলে নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস হয়ে উঠে। সেক্ষেত্রে, পূর্ব্বে বিশ্বাস ও দোষারূপ মূলতঃ সংস্কারিত হয়ে বিবর্তন লাভ করে।

প্রচীন কালে বিশেষ করে উত্তর পূর্ব্ব খণ্ডেও "নরক রাজার" আমলের উত্তরকাল থেকেই, সামগ্রিক ভাবে কিরাত জাতিদের মধ্যে শক্তি বা শাক্ত ধর্মের প্রভাব ফেলেছিল। এই বিষয়ে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন G. P. Singh এর পুঁথি থেকে এবং তা নীচে প্রণিধান যোগ্য। যেমন ঃ On the basis of all trust worthy historical evidences we can establish the true that the contribution of the Non-Ariynas including the Kiratas to the growth of saivism sanktasm and Tantricism in gross forms are important from both religions and cultural points of view. The popularity of these important religions cults (i.e.) Saiva, Sakta and Tantrict among the Hindus may be fairly ascribed to the Kiratas of North East India, Savism and Saktasm were the prevailing religions among the Kiratas people especially the Khasis, the gaintias, the Garos, the Cacharis, the Tipperahs, the Chutiyas, the Akas and the Ldu-Mishmis in pre and post Naraka period. (Kiratas Ancient India. P.No. 424).

তৎকালীন যে শাক্ত ধর্মের প্রবল প্রভাবিত তার মূর্ত্ত প্রতীক হচ্ছে - কামরূপ কামাক্ষা মন্দির এবং তা থেকে হাজার বৎসর আগেই গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে এইসব শৈব্য বা তান্ত্রিক ধর্ম শিব ও তাঁর স্ত্রী পার্ব্বতীকে কেন্দ্র করেই প্রথম গড়ে উঠেছিল কেন না শিব ছিলেন সমগ্র ভারতের আদি এবং অনার্য দেবতা তা নীচে প্রদত্ত শীর্ষক থেকে আরও পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করে নিতে পারে; যেমন ঃ The combat beween Lord Siva in the disguise of the Kirata Arjuna a reffered to earlier is an interesting example of as sociation of Siva with primitive Non Aryan tribe (Kiratas in Ancient India. P. No. 426).

খুব সম্ভবতঃ সেই সূত্রেই মানুষ্যতম সুবরাই হরফে ত্রিলোচন রাজাকে শিবের পুত্র, বলে রাজমালাতে অভিহিত করে থাকেন। বিশেষতঃ তিনিই প্রথম শৈব্যধর্মানুবর্তী আচার ও রীতি নীতি এর পথিকৃৎ এবং তা বেশীর ভাগ প্রতিফলিত হয়, তদানীন্তন তাঁর ভূখণ্ডে বসবাসকারী কিরাত আদিবাসীদের মধ্যে।

রূপকথা উপকথা প্রচলিত প্রবাদ থেকে স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যায় যে

৩৫

(রূপিনীরা আর কেউ নয়) রূপিনী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল কিরাত জাতির বংশবৎ এবং সুবরাই রাজার বিশ্বস্ত প্রজা ছিল, এই গোষ্ঠী। রূপিনীদের মধ্যে সুপ্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে তা হচ্ছে যেমন "সুবরাই' রাজা খাই সুইনাই, হাঙরাই রাজা খাই উানাই, অর্থাৎ সুবরাই রাজা হচ্ছে লিপিকার এবং হাঙরাই রাজা হচ্ছে বাস্তবায়নকারী। রূপিনীদের ওঝারা মন্ত্র উৎচ্চারণের সময় উপসর্গ সূঃ সূচক ধ্বনিটি সুবরাই রাজাকে সমর্পিত করে মন্ত্র উচ্চারণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাককালে রূপিনীদের বিবাহে মন্ত্র গানের সুরের মত উচ্চাঙ্গ ধ্বনি করতে হয়; তা সুবরাই রাজার নাম জুড়েই গাঁথা মন্ত্র ছাড়া আর কি। যেমন ঃ "শিব সুবরাই নিয়ম খযলাইনাই নীতি সীনাম নাই...," অর্থাৎ সুবারই রাজা হচ্ছে নিয়ম নীতির পথ প্রদর্শক।

বস্তুতঃ প্রাক সুবরাই আমল থেকে ত্রিবেগ তথা তিপরাতে শাক্ত ধর্ম প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তা নিয়ম নীতি নির্ধারিত সহকারে গঠিত ছিল না। কিন্তু সুবরাই রাজার উত্তর কাল থেকে, তা যথাযথ ভাবে সংস্কারিত হয়ে, এক নব্যধর্মের রূপলাভ করে। বিশেষ করে তাঁর ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের মধ্যেই এই শৈব্য ধর্ম প্রবল ভাবে বিস্তার লাভ হয়ে উঠে। রূপিনীরাও প্রাককালে ঐ ভূখণ্ডে বসবাসকারী ছিল এবং তারা বিশ্বস্ত প্রজাও বটে। মধ্যবর্তী যুগ থেকেই সুবরাই রাজার প্রবর্ত্তন সংস্কারিত শৈব্য ধর্মের অবলম্বন রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ হয়েছিল বলে এক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়। তখন থেকেই উক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আচার আচরণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিধি বিধান সূচনা হয়।

শৈব্য ধর্ম ভিত্তিক আচার আচরণ

এই শৈব্য বা শাক্ত ধর্ম উত্তরোত্তর ব্যবহারিক জীবনে জড়িত হয়ে এক নিবীড়তায় গিয়ে পৌঁছে এবং তা সার্বিকভাবে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের রূপিলাভ করলে তখন রীতিমত বিধি বিধান সামাজিক নিয়ম বদ্ধতায় গড়ে উঠে। তখন থেকে সামাজিক ভাবেই মেনে নেওয়া উচিত বলে সকলের তরফ থেকে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়ে উঠে এক তা দেখাশুনার দায় দায়িত্বের ভার সমাজের লোকের উপর ন্যস্ত রয়ে যায়। এই অপরিহার্য্য আচার অনুষ্ঠান নীচে দেওয়া হল ঃ

জন্ম মৃত্যুর অনুষ্ঠান ও পার্ব্বন

প্রচলিত লোকাচার অনুসারে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই সহজ প্রসূ.তি এবং

মাও বাচ্চার সুস্বাস্থ্যের জন্য দোহাই মূলক পূজা ও উৎসর্গ করা রূপিনীদের মধ্যে নিয়ম ছিল। এই দোহাই মূলক পূজাকে "ডাসুংকিবই সামুং রীমীঙ" বলা হয় অর্থাৎ ৮জন দেব দেবীকে একত্রে পূজা করণের পদ্ধতি। এই আট বিশিষ্ট দেব দেবী হচ্ছে যেমন ঃ ১। মহাদেব মা দেবী ২। ত্রিপুরা সুন্দর কালী ৩। মীতাই কীথার লামপ্রা ৪। তীয়সাংগ্রমমা (জলদ্ধি দেবী) ৫। থুবনাইরগ বণিরগ (গনেশ ও কার্ত্তিক) ৬। বুরাছা (বুড়া দেবতা) ৭। নগসীগ মীতাই (কোনা দেবতা) ৮। সীকাল (ধায়ন)।

বাচ্চা ভূমিষ্ঠ গ্রহণের ৫ থেকে ৬ দিনের মধ্যে বাচ্চার নাভি শুকিয়ে গেলে, ডিম বা মোরগের ছানা উৎসর্গ করে, থুপনাইরগ বণিরগকে পূজা অর্চ্চনা করতে হয়। এতে উক্ত বাচ্চা শুদ্ধ হয়ে উঠে। এই দিনই পারিপার্শ্বিকদের নিয়ে ছোট অথবা বড় আকারে ভোজনের আয়োজনও হয়ে থাকে এবং এই উপলক্ষে ভোজন সাধারণতঃ দিনের বেলাই অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে এক কথায় "অবুলসুমীন" অর্থাৎ বর্ত বলা হয়। যতদিন পর্যন্ত শুদ্ধিকরণ ছাড়া ঐ ছোঁচি ঘরে কেউ ঢুকতে পারবে না, এবং কোন দেব দেবীকে পূজা করতে পারবে না। ঐ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর প্রমান হয়ে যায় যে, এই পরিবার শুদ্ধতা লাভ হয়ে গেছে। এক বছর বা দেড় বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে বাচ্চার মুখে প্রথম ভাত প্রদান করা আর্চানুবর্তী রীতি ছিল তা একটি পূজা অর্চ্চনাকে কেন্দ্র করেই একটি ভোজন আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই পূজাকে "খুমচাককীরী" (অর্থাৎ নজর তাড়ানী) বলা হত। বাচ্চার প্রচলিত খাদ্য ঐ পূজাতে অর্পন ৭ বোন উপদেবী বা "ডাইন" এর নামে অর্চ্চনা পাঠ করতে হয়। এই পূজা সম্পনের জন্য কেবল লাল জাতীয় ফুলই চলবে তাই একে "খুমচাক কারী" অর্থাৎ (খুম = ফুল; চাক = লাল; কারী = তাড়ানো)।

বেদ ব্রাহ্মন দ্বারা পরিচর্যা হিন্দু ধর্মে অনুপ্রাণিত, প্রাককালের আচার অনুষ্ঠান দিন দিন বর্জন করে, হিন্দুানুবর্তী আচার অনুষ্ঠান আত্মস্থ করে নেয়। তাতে পূর্ব্বে "খুমচাককারী" এর পরিবর্ত্তে "অন্নপ্রাশন" কিছু কিছু নব্য রূপিনী সমাজে অবলম্বন করতে দেখা যায়।

মৃত্যু হলে কি কি অবলম্বন করতে হয়

এক বছরের নীচে শিশুর মৃত্যু হলে রূপিনী সমাজের প্রথানুসারে তাকে দাহ না করে কবর দিতে হয়। কেননা, এক বছরের শিশু কোন বরক বা মনুষ্যত্বের

জীবনে এসেছে বলে পরিগণিত হয় না। যে মানুষের(বরক) পর্যায়ে আসেনি তার কোন ধর্মও নেই, তাই শৈব্য ধর্মের ভাবাদর্শের মতে বিপরীত সৎকার করতে হয়, তাহাই হচ্ছে কবর। কিন্তু এক বছরের উর্দ্ধে বয়স্ক শিশুকে দাহ না করে কবর দিলে তার বিরুদ্ধে কেউ যদি প্রতিবাদ করে সামাজিক বিরুদ্ধ আচরণে ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ প্রয়াত শিশুর পিতা অর্থ দণ্ড-বিধিতে পড়ে যাবে।

অর্বাচীনকালে কোন পুরুষ বা নারী যৌবন কালে অকাল মৃত্যু ঘটলে (অর্থাৎ ১৬ থেকে ৪০ বৎসরের মধ্যে) চিতার মধ্যে শব দেহের সঙ্গে লম্বালম্বি কলা গাছের গুঁড়ি কেটে এঁটে দিয়ে উক্ত শব দেহকে দাহ করা হত। আবার অনেকে আদরের একমাত্র সন্তান সন্ততী অকালে মৃত্যু ঘটলে ঐ শবদেহের পায়ের কাছে ফেলে মোরগ বা শূকর অথবা পাঁঠা বলী দেওয়া হত। এই পশুপক্ষি বলীর প্রথাকে, তদানীন্তন ভাষায় "নগনাউা"বলে অভিহিত করা হত। তারপর এই বলীর মংস খেয়ে দেয়ে এক অংশের মানুষ শ্মশানের কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এর মধ্যে শব দেহের স্নানের পর পাগড়ী সহ সাদা পরিধান সম্পন্ন করে বাঁশের তৈরী মাচান (কীথাঁয় তরাই) এর মধ্যে বহন করে শশ্মানের পথে রওনা দিতে হয়। এই শব বহনের রাস্তায়, তুলা ও ধান মেশানো (মাইথাই খুলবার) সরিয়ে ছিটিয়ে যেতে, যেতে শশ্মান ঘাটে পৌঁছে থেমে যেতে হয়। এর মূল কারণ হচ্ছে, প্রয়াত ব্যক্তি যেন পূর্ব্ব জন্মেতে গিয়ে ধান ও তুলা অর্থাৎ খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য প্রাচুর্যতা লাভ হয়। একে রূপিনরদের ভাষায় "মাইথাই খুলবার বাররীন" বলে বিশ্বাস করে থাকে। রূপিনীদের শ্মশান বেশীর ভাগ নদী বা ছড়ার বিপরীত পাড়ে সাধারনতঃ বসতির দূরবর্তী নির্জন স্থানে শশ্মান ঘাট স্থাপন করা প্রথাগত রীতি। শব দেহ নদী বা ছড়া অতিক্রম করার প্রাক মুহুর্তে ছড়ার এপাড় ওপাড় সাদা সূতা টেনে বেঁধে দিতে হয়। অন্যথায় শবদেহ বহন করে নদীর উপর যাও প্রথাগত বিরোধী।

তারপর শব দেহকে চিতার উপর চড়িয়ে দিয়ে, তার প্রচলিত ব্যবহারিক খাদ্য উৎসর্গ করতে হয়। তার পাশাপাশি ধানের ছড়ী (মাইথাই) তুলা রাখার থলী (খুলচীরীয় খক)ডুবি (তাউথু) পাখা (কিছিপ) বেতের বয়ন করে সাদা নিশানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিতে হয়। চিতার আগুন ধরার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াত ব্যক্তির ব্যবহারিক বস্ত্র এবং দ্রব্যাদি আগুনে ফেলে দিতে হয়। মৃত ব্যক্তির কাছে স্বজনরাই প্রথম চিতাতে অগ্নি সংযোগ করে থাকে। দাহ সম্পন্ন হলে শশ্মান ত্যাগ করে আসার সময় কীথাঁয় ফারা বলে একটি মোরগের ছানা অন্য স্থানে ছেড়ে দিয়ে আসা প্রথাগত

নিয়ম।

এই মৃত ব্যক্তির সংকারের কাজে যারা অংশ নিয়েছে, তারা একে, একে স্নান করে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করতে পারবে, অন্যথায় তাদের অছোঁচি বলে গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। মৃত্যুর পরের দিন থেকে স্বজন ব্যক্তিরা স্ব স্ব গৃহের উঠানে ত্রিভুজ আকারে তিনটি পালার ভরে দণ্ডায়মান মাচানের উপর ঐ প্রয়াত ব্যক্তির জন্য উৎসর্গ করে প্রতিদিন পানাহার দিয়ে, ৭দিন ৭রাত্রি পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হয়। তারপর পূর্ণ দিবসে খুব ভোরে শশ্মানে গিয়ে চিতার ভস্ম জলে বিসর্জন দিয়ে একটি পিন্ড ঘরে নিয়ে আসলে উক্ত পিণ্ডটি ঘরের বাইরে ছোট্ট একটি ছাউনি বা ঘর তৈরী করে সংরক্ষিত রাখতে হয়। একই দিনে সকালে ৪টি যুগল মোরগ ও মুরগী লাম্প্রা-তৗয়-সাঙগ্রমমা (অর্থাৎ কার্ত্তিক গণেশ-গঙ্গা-চতুর্দ্দশ দেবতা) পূজায় উৎসর্গ করে শ্রাদ্ধে (হরসিনি) কাজ সূচনা করে দিতে হয়। এই দিনই প্রয়াত ব্যক্তির পরিবার তরফ থেকে ভাত, মাছ, মাংস এবং তামাক, মদ ও কাঁচা মদ, (বৗতৗক) অর্থাৎ তার ব্যবহারিক জীবনের সব কিছুই, ঐ দিনে নাম ডেকে উৎসর্গ করতে হয়।

আজকাল অবশ্য বেদ ব্রাহ্মদের পরিচর্যায় হিন্দু ধর্মের অর্ন্তগত সনাতন ধর্মের রীতি অনুসারে, দিনদিন রূপিনীরা মূল ঘুরে গেছে। ফলতঃ "হরসিনির" পরিবর্তে ব্রাহ্মণদের নির্দ্দেশে রূপিনীরা ক্ষত্রিয় বর্ণ বলে, মৃত্যুর তিন রাত্রিতে চিতা নেভানোর হয় অর্থাৎ তেরাতেরী পালন করা হয়ে থাকে। এরপর ১৩ দিন পর পূর্ণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যদি প্রয়াত ব্যক্তি বয়স্ক হয়ে থাকে, তাহলে তার ছেলেরা যথাযথ ভাবে অবলম্বন করতে হয়। পিতা মাতার জন্য পুত্ররা কি রকম ত্যাগ করতে প্রস্তুত অর্থাৎ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর আরাম ঐশ্বর্য্য বিলাস ব্যাসন ত্যাগ করে ঐ ১৩ দিনের মধ্যে তাদের কঠোর পরিক্ষায় জর্জরিত হতে হয়। এই বিষয়ে হিন্দু ধর্মে পর্ব্বনের সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই। (তাই বিস্তারিত আলোচনা নিস্প্রয়োজন।)

অন্যদিকে বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ এবং সংকারের ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র। বৈষ্ণবরা যদিও হিন্দু ধর্মের অর্ন্তগত হলেও তাদের মৃত্যুর পর দাহ না করে সমাধি করতে হয়। এর কয়েকটি কারণ আছে। যেমন বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করতে হলে, মহন্ত অর্থাৎ মুখ্য বৈষ্ণব থেকে বেত বা কৌপিন নিতে হয়। এই কৌপিন কোন সময় দেহ থেকে পরিহার করতে পারেনা যা মৃত্যুর পরেও পরিধান হিসাবে থাকেন। তাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রের অভিমতে কৌপিন আগুনে দাহ করা নিষিদ্ধ এবং এই সূত্রেই বৈষ্ণবকে দাহ করা নিষেধ, কেন না তার পরনে কৌপিন সন্নিবিষ্ট

আছেন। তাই তাদের নীতি অনুসারে মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কোন বৈষ্ণব তিন দিনের পর সমাধি শুদ্ধন করে অষ্ট দিবসে গিয়ে শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করতে হয় এবং এই অনুষ্ঠানকে অষ্টপ্রহর আখ্যায়িত করে, সমারোহে বৈষ্ণব ভোঁজন আয়োজন করে থাকে। অষ্ট প্রহরের দিন, ত্রিনাথকে আহূত করে পূর্ণ যজ্ঞ সম্পনের মাধ্যমে ঐ প্রয়াত বৈষ্ণবের শুভ আত্মার প্রার্থনা করে থাকেন। তারপর সাত্ত্বিক আহার মন্দিরে ভোঁগ দিলে, এবং এই দেব উৎসর্গ ভোঁজ এর অংশই পরে গণ ভোঁজনে বিতরণ করা হয়। এই সব ভোজনে দই, চিড়া, খৈ আবার অনেক সময় নিরামিষ তরীতরকারী সাধারনত বৈষ্ণব ভোঁজনের আহারাদি হিসাবে পরিবেশন করা হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পিণ্ড বিসর্জন দিতে হয় না। অষ্ট প্রহরের দিনেই ঐ পূর্ণ যজ্ঞের মাধ্যমে পিণ্ডের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

বিবাহ অনুষ্ঠান ও অবলম্বন

রূপিনীদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান করতে হলে, দুইটি দিক অবলম্বন করতে হয়। ১। সামাজিক রীতি নীতি ২। ধর্মীয় বা লোকাচার রীতি নীতি, উভয় প্রনালীকেই যথাযথভাবে প্রয়োগ করে প্রাককালে সাধারনতঃ রূপিনীরা বিবাহের কাজ সম্পন্ন করে থাকেন।

১। সামাজিক রীতি নীতি ঃ এর বিষয় নিয়ে পূর্ব্বেই আলোকপাত করেছি, তাই আবার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

২। ধর্মীয় বা লোকাচার রীতি নীতি ঃ এই সব রীতি নীতি কোন বাধ্য বাধকতা আইন নয়, অথবা সমাজ শাসক বর্গরা এই সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নাক গলাতে পারেন না। কেননা এই পূজা পার্ব্বনের রীতি নীতি এবং প্রনালী তাদের আওতার বাইরে। এই বিষয়ের পরিচর্যার ভার তৎকালীন পুরোহিত (অচাই জুঙ) হাতেই কেবল দায়িত্ব থাকবে। বিবাহ অনুষ্ঠানে শুরু থেকে শেষ অবধি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব কিছু উক্ত অচাই এর নির্দ্দেশ ক্রমে চলতে হয়। আর সামাজিক নিয়ম কানুনের ক্ষেত্রে সমাজের বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা নির্দ্দেশ দেন।

প্রনালী ঃ বিবাহের প্রারম্ভে উক্ত বাসভবনের উঠানে পূজার আনন্দ হিসাবে নুতন ঘাঁটি দিয়ে কিছু উঁচা করে নিতে হয়। তারপর কাঁচা বাঁশ দিয়ে পাতলা ভাবে খুঁটি

গেড়ে বসানো হলে উক্ত বাঁশের মাথায় চিড়ে চূর্ণ করে ফুলের ছাঁচ তৈরী করে নিতে হয়। তারপর খুঁটি বসানো প্রত্যেকটি ফাঁকে ফাঁকে ধনুর আকারের ন্যায় মুড়ে দুই মাথা মাঁটিতে গেঁড়ে বসানো হয়। এটা সাধারনতঃ নরম বেতের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তারপর প্রত্যেকটি খুটির মাথা চুর্ণিত ছুচানো বেতের আগাতে ফুল গুজে দিয়ে সমস্ত খুটিটিকে ফুল সজ্জিত করে তুলতে হয়, এবং এই বাঁশের সাজ সজ্জাকে পুরোহিত (অচাই) এর ভাষায় "থিকথাং লংমা" বলে। অগ্রভাবে উচ্চতম খুঁটিতে পর পর দুইটি করবী পাতায় গাঁথা মালা ঝুলিয়ে রেখে তার পাশে জলপূর্ণ দুইটি কাঁচা বাঁশের চুঙ্গি দণ্ডায়মান ভাবে হেলিয়ে রাখা থাকে। প্রথমত এই পবিত্র জল রাখার জন্য চাই বনের পূর্ণাঙ্গ এবং অদষ্ট দণ্ডায়মান গাছ থেকে কেটে নেওয়া দুই টাইপ বিশিষ্ট চুঙ্গি। এই বাঁশের চুঙ্গি শ্বাসবন্ধ করে বিপরীত মুখের দিকে কেঁটে নিতে হয়।

তারপর পুরোহিত (অচাই) মাণ্ডপে বসে শুদ্ধ দেবতা লাম্প্রা উাথুপকে উপাসনা করে পর পর দুইটি মোরগের ছাল এবং দুইটি মুরগীর ছানা উৎসর্গ করতে হয়। উক্ত পূজা শেষ হলে পুনরায় গঙ্গা (তীয়) পূজায় লিপ্ত হয়। গঙ্গা পূজার সমাপ্তি ঘটলে পরিশেষে শাক্তবলম্বীদের মুখ্য পূজা চতুর্দ্দশ দেবতার (অর্থাৎ সাঙ গ্রমমা পূজা) বাকী থেকে যায়। তারপর সুবরাই রাজার নাম জুড়ে মন্ত্রের বন্দনাতে পূজায় লালপাথরের সিঁদূর সমর্পন করতে হয় এবং এটাই বিবাহের শেষতম মন্ত্র পাঠ। সাঙগ্রমমা পূজা সম্পন্নের পর সেই দিনের বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য পূজা অর্চনা সমাপ্তি ঘটে। তারপর ঐ উৎসর্গকৃত ৪টি পাখীর পেট থেকে নাড়ী ভুড়ি টেনে নিয়ে "অচাই" শুভ অশুভ সঙ্কেত চিহ্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতে হয়। এই নাড়ী ভুঁড়ির গাত্র চিহ্নে সাধারনতঃ তিন পক্ষের সংকেত বহন করে থাকে। প্রথমটি পরিবারের পক্ষে, দ্বিতীয়টি পুরোহিত (অচাই) এর পক্ষে, তৃতীয়টি দেব পক্ষে। পরিক্ষা নিরীক্ষা কার্য সম্পন্নের পর পূজায় অর্পিত ঐ সিঁদুরটি জলপূর্ণ চুঙ্গি দুইটির গায়ে সিঁদুর মেখে দিতে হয়। তারপর বর-কন্যা উভয়কে মুখোমুখি পূজা মণ্ডপের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঐ পূজায় অর্পন করবী পাতার গাঁথা মালা পরস্পরের মধ্যে মালা বদল করলে পুরোহিতই প্রথম ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মাথায় উক্ত জল ছিঁটিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে হয়। পরে একের পর এক স্বজন এবং বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা উক্ত নব-দম্পতিকে ঐ জল ছিঁটিয়ে আশীর্ব্বাদ করতেন। বিবাহ প্রনালী সম্পন্ন হলে সমারোহে ভোজনের আয়োজন হয় এবং ভোজনের পাশাপাশি বয়স্ক ব্যক্তিরা মদ ও কাঁচা মদ (বৌতীক) বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বীকৃত থাকলেও একেবারে

অবাধ নয়। পরের দিন নব-দম্পতির পরিচালনায় আবার নৈশ ভোজনের আয়োজন করা হয়, এবং এই ভোজনকে "খুমবার রীতসা" বলে অভিহিত হয়। এইদিন মুখ্য পরিচালক এবং ভোজনের পরিবেশনকারী হবে নব দম্পতি। দুই দিবসের পর মূলতঃ আচার অনুষ্ঠান এক প্রকার শেষ হয়ে উঠে। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে এরপর আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান তা স্ব স্ব সাধ্যের উপর নির্ভর।

আজকাল অবশ্য রূপিনীদের সমাজে হিন্দু ধর্মের অর্ন্তগত সনাতন ধর্ম উত্তরোত্তর প্রভাব ফেলার পর, বেদ ব্রাহ্মনদের দ্বারা আচার অনুষ্ঠান পরিচর্যা হতে থাকে। তাতে হিন্দু শাস্ত্রের অনুসারে পূজা পার্ব্বন, দান, বিসর্জ্জন, ত্যাগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। তার নির্দ্দেশক হচ্ছে বেদ ব্রাহ্মণ, কুল গুরু এবং সাত্ত্বিক অনুশীলনকারীরা। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে বেদ ব্রাহ্মণরাই জজমানি করে থাকেন এবং তিনিই শুরু থেকে শেষ অবধি এই অনুষ্ঠানের পরিচালনা করে থাকেন। এই প্রনালীতে বিবাহ প্রচলনকে রূপিনীদের ভাষায় "কায়কতর কায়মুঙ" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তবে বর্ণ বিশেষে এই বিবাহ প্রনালী কিছ কিছু ক্ষেত্রে হেরফের হতে পারে, কিন্তু বিয়ের ছাঁচধিক সবটাই এক। রূপিনী মেয়েদের মধ্যে যারা বিবাহিতা রমণী তারা হাতে একজোড়া শাঁখা দেওয়ার উদ্ভব হয়, যখন হিন্দু শাস্ত্রের অনুসারে বিবাহ প্রচলন (কায়কতর কায়মুঙ) সামাজিক ভাবে স্বীকৃত হয়, সেই দিন থেকে। তবে সিঁদুর (সৌন্দুর) ব্যবহার প্রাককাল থেকেই বিবাহিতা রূপিনী রমণীদের মধ্যে প্রচলন ছিল তা সন্দেহের কোন কারণ নেই এবং লোক প্রচলিত রূপিনীদের প্রবাদ বাক্য মাধ্যমেই তা অনুধাবন করা যায়। যেমন ঃ তীয়-ফঙ তীয়-জড় রায়া সিনি বা /কৗপালী সৗন্দুর ফুল জ্যা। আর বাকী সব নিয়ম কানুন শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই।

মানসীপূর্ব্বক পূজা পার্ব্বন ঃ রূপিনী গোষ্ঠীদের পূজা পার্ব্বন সাধারনত অকারণে আয়োজন হয়ে উঠে না তার পিছনে কিছু না কিছু উপলক্ষ থাকেই। এই উপলক্ষ আর কিছু নয় পরিবার বা বসতির রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের অব্যাহতি পাওয়ার জন্য দেব-দেবীকে দোহাই উপাসনা। এই উপসনার জন্য দুইটি ধারা আছে, যেমন ঃ একটি হচ্ছে বিনা পূজায় সঠিক নির্ধারণ এবং পরে মানসী করণ এবং অপরটি হচ্ছে মানসী অনুসারে কোন দেব দেবীকে পূজা এবং উৎসর্গকরণ (রূপিনীদের ভাষায় একে তীয়নাই চাকমুন, উল পুন-তাউ রাথাতরাঁই সামুঙরীমুন)। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দেব দেবীকে দোহাই দিয়ে রোগ থেকে অব্যাহতি

পাওয়াকে তথাকথিত এক কথায় "খাঙচাকমুন" (অর্থাৎ প্রতিটি দেব দেবীর প্রতি ভিক্ষা প্রার্থী হওয়া)।

বিনা পূজায় গ্রাসকারক দেব দেবীর চিহ্নিত করণ

প্রয়োজন হলেই খেয়ালখুশি মত কোন দেব দেবীকে আহূত করে উপাসনায় ওঝা (অচাই) বসতে পারে না। প্রথমে সঠিক গ্রাসকারী দেব দেবীর নাম জানতে হবে জলদিশার মাধ্যমে এবং নাম জানার পর উক্ত দেব দেবীর নাম ধরে, ওঝা(অচাই) নির্দ্দিষ্ট দিন তিথি ধার্য্য করে পূজার জন্য এটি মানসী করতে হয় (চাকমুন)। এই মানুসীর সময় রোগগ্রস্থ পরিবারের স্বল্প পরিমানে চাউল সঙ্গে তুলা পাতায় বেঁধে দিতে হয়, এবং ঐ গ্রাসকারী দেব বা দেবীর নাম ধরে পাকাপাকিভাবে তাকে পূজায় অর্চ্চনা করতে হয়। তারপর ঐ মানসী (চাকমুন) পুঁটলাটিকে বাচ্চাদের হাতের নাগালের বাইরে সংরক্ষিত ভাবে রাখতে হয়। নির্দ্ধারিত দিন তিথি এসে গেলে ঐ মানসীর নাম সাপেক্ষে দেব ও দেবীর পূজার আয়োজন করা হয়, এবং দেব দেবীর স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে ককট , গবয়, মোষ, পাঁঠা বলীতে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে।

রোগভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর পূজার প্রণালীর

লৌকিক বিশ্বাসের জীবনে রূপিনী গোষ্ঠীদের মধ্যে দুই ধরনের দেব দেবীর গোষ্ঠী আছে। যেমন এক গোষ্ঠী হচ্ছে কেবল হানিকারী বলে আরোপিত। আবার অপর গোষ্ঠীবৎ হচ্ছে মানুষের কল্যাণকামী বলে অভিহিত। রূপিনীদের ভাষায় প্রথম শ্রেণীগোষ্ঠী দেব দেবীকে "মীতাই হাময়্যা" এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে "মীতাই কাহাম" বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

মনুষ্যের হানিকারক উল্লেখযোগ্য দেব দেবী হচ্ছে যেমন ঃ সৌকাল, বুরাছা, চমগেমা, থুপলাইরগ, বনীরস, মেরেংছা ইত্যাদি। আবার মানুষের কল্যাণকামী শ্রেণী দেব দেবী হচ্ছে যেমন ঃ মহাদেব অথবা শিব সাঙগ্রমমা, লামপ্রাউথুপ, তীয়(গঙ্গা), কালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই (মীতায় হামজ্যা) শ্রেণী উপ দেবদেবীরাই বেশীর ভাগ মানুষ জাতিকে গ্রাস এবং কবলিত করে বলে রূপিনীদের অলৌকিক গতভাবে বিশ্বাস। দেবতাদের গ্রাসিত অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে কেবলে জটিল রোগে আক্রান্ত হবে এবং দিশা নির্ণয় (তীয়নাইমুন) এর মাধ্যমে যদি জানতে পারে সেই দেবতার তাকে গ্রাস করেছে আর দ্বিতীয় কেউ নয়। তখন ঐ দেব দেবীকে

আহূতকরে পূজার উপাসনায় বসতে হয়। প্রয়োজনবোধে আবার পশু পাখিও বলীর মাধ্যমে উৎসর্গ করে থাকে। তবে এইসব পূজা অর্চ্চনা, ও উৎসর্গের রীতি নীতি নির্ধারণ ওঝার অনুমোদন সাপেক্ষ। দ্বিতীয় কেউ এই ক্ষেত্রে দখলাধী করা সম্ভব নয়। নীচে সংক্ষিপ্ত আকারে রোগ ও দেব দেবী বৈশিষ্ট ভিত্তিক পূজা ও উৎসর্গ প্রনালী দেওয়া হল ঃ

উাসুং কিবমুন ঃ সাধারণতঃ জটিল রোগের ক্ষেত্রে এই ৮ বিশিষ্ট মুখ্য দেবতাকে আহূত করে ভোজ উপাসনা করতে হয়। যেমন ঃ গর্ভবতী মায়ের প্রসূতি বিলম্বনায়; কোন ব্যক্তির দূর্ঘটনায় মুমূর্ষ অবস্থায়; মহামারীর সময় প্রতিকারের ব্যবস্থায়; বহুদিনের শয্যাবস্থায় রোগ গ্রস্থের আরোগ্য হয়ে উঠার জন্য আরও অনেক কারণে ঐ পূজার (সামুঙ) আয়োজন করে থাকে। এই পূজা অর্চ্চনাকে রূপিনীদের ভাষায় 'উাসুং কিবমুন বা উসুঙকির্বাই সামুঙ রীমুন' বলে থাকে। এই পূজার মূল দেব দেবী হচ্ছে যেমন ঃ ১। মহাদেব মা দেবী ২। ত্রিপুরী সুন্দরী কালী ৩। লামপ্রা (মীতাই কীথার) ৪। তীয় সঙ্গ্রমমা ৫। থুবনাইরগ বনিরগ (গনেশ কার্ত্তিক) ৬। বুরাছা ৭। নকসীব মীতাই ৮। সীকাল

বুরাছানমীতাই সামুঙ ঃ ভারতের আদিম জাতিদের মধ্যে সব জাতির মধ্যে ঐ বুরাছা ভিন্ন ভিন্ন নাম করণে তাঁর পরিচয়। রূপিনীদের আধ্যাত্মিক জীবনেও তার নাম অনেকটি, তাই বুরাছাকে উপাসনা করতে হলে তার অনেকগুলি নাম জানতে হবে। অন্যথায় পূজার কোন কার্যকরী হবে না। তাঁর গ্রাস বা কুদৃষ্টির ফলে রোগ সৃষ্টি কারণ সংক্ষিপ্ত ভাবে নীচে দেওয়া হল। যেমন ঃ ছোট বাচ্চা যদি প্রায়শই রাত্রে অশুভ ক্রন্দনে লিপ্ত থাকে তাহলে এটা বুরাছা গ্রাস করেছে বলে আরোপ করা হয়। আবার কারোও হঠাৎ জ্বর হলে এটাও বুরাছাকেই দোষারূপ করে থাকে। বিনা হুর্টুজ চ্যুত না খেয়ে পা লেংড়া অর্থাৎ অকারণে পা লেংড়া হয়ে উঠলে একে বুরাছা দেবতার ফাঁদ লেগেছে বলে আরোপ করা হয়। বুরাছাকে পূজা অর্পনের প্রনালী এবং তাঁর আহুতি নিচে দেওয়া হল ঃ

সন্ধ্যায় উপাসনার সময় "তীয়সি নাগীরা হ্ধনঞ্জয়" নামে আহূত করে ভোজ অর্পন করতে হয় এবং তিনি পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে অর্পিত ভোজ গ্রহণ করেছেন, কিনা তা সংকেতেই উঝা বুঝতে পারেন।

দিনের বেলায় এই বুরাছাকে 'বণমালী', 'ঘনশ্যাম', 'গদাধরীরান' বলে আহূতিতে ভোজ পূজায় অর্পন করতে হয়। অন্যথায় তিনি সাড়া দেবেন না। আবার সকাল বেলাই বাবা তীয়ছিনাগ্রা, বনমালী, রাজা নামে আহূতিতে ভোজ পূজায় অর্পন করলে তবে তিনি সাড়া দেবেন। সাধারনত "বুরাছা" পূজার সময় ভোঁজ এর পাশাপাশি দুইটি মোরগ উৎসর্গ করতে হয়, তাতে পূজার পূর্ণ লাভ হয়। অনেক সময় উৎসর্গ ব্যতীত পূজা অর্চনা হয়ে থাকে, তা রোগীর জটিলতার উপর নির্ভর করে।

লাম্প্রা-ন রীমুন ঃ লাম্প্রা এর অপর নাম হচ্ছে শুক্র দেবতা (মীতায় কীথার)। এই লাম্প্রা দেবতাকে মনুষ্য গোষ্ঠীদের গ্রাসকারী বলে দোষারূপ করতে পারে না, তাই তিনি মঙ্গল-কালী দেবতা (মীতায় কাহাম) বলে চিহ্নিত করা হত। লাম্প্রা দেবতার তিন সন্তান আছে যেমন ঃ ১। সুকুন্দ্রাই মুকুন্দ্রাই ২। সুকুসিং মুকুসিং ৩। আখাঁজ বিখাঁজ। তারা অনেক সময় মনুষ্য জাতিকে গ্রাস (সিরি) বা দৃষ্টি করে রোগ শোক সৃষ্টি করতে পারে। আবার নিরাময় এর জন্য তাদেরকেই আহূত করে ভোঁজ পূজায় অর্পন করতে হয়।

থুপনাইরগ বনিরগ ঃ এই দেবতা মনুষ্য জাতির অনিষ্ট সাধক শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে এবং তাঁর কুদৃষ্টে মানুষ হঠাৎ জটিল রোগে সম্মুখীন হতে পারে, যেমন ঃ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ জ্বর হয়ে সমস্ত শরীর বেঁকে গেলে; আবার অকস্মাৎ মানুষের জবান বন্ধ হয়ে মূমূর্ষ অবস্থায় পড়ে গেলে। এইসব অপ্রত্যাশিত রোগ গ্রস্থের দায়ী হচ্ছে "থুপনাইরগ বনিরগ" কে আরোপ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ এর প্রাককালে রূপিনীরা যখন প্রাকৃতিক শক্তিকে ধরে বিশ্বাসে মতে মত্ত ছিল তখন এই সব অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত রোগ গ্রস্থকে "বউ মানচাঅ" বলে আরোপিত করা হত। কিন্তু যুগের তালে তালে শৈব ধর্মকে আত্মস্থ করার পর থেকে 'বউ' এর পরিবর্তে "থুপনাইরগ বনিরগ'কে দোষারোপ করা হয়ে থাকে।

থুপনাইরগ ও বনিরগ যুগল দেবতাকে আহূত করতে হলে ভোঁজ পূজায় অর্পন করে হয় এবং তার সঙ্গে আনুসঙ্গিক পশু পাখির উৎসর্গও এই পূজায় স্বীকৃত আছে।

সীকাল-ন রীমুন ঃ রূপিনী গোষ্ঠীদের এই অলৌকিক বিশ্বাস বর্তমানকালেও তা বিরাজমান রয়ে যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা মানব রূপই ধারণ করে এই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে বলে সমাজে 'ডাইন' বিদ্যাদর্শী বলে সন্দেহ ভাজন একে অপরকে প্রত্যক্ষ ভাবে না হয় পরোক্ষভাবে দোষারোপ করে থাকে। কিন্তু পূজা উপাসনার ক্ষেত্রে ঐ দেব দেবীর সূত্রেই অলক্ষে পূজার আয়োজন করা হয়। এই ডাইনীর কুদৃষ্টির ফলে নানান রোগগ্রস্থ হতে পারে। এই সূত্রেই তাঁকে কুকাঙ্খী উপদেবী বলে চিহ্নিত করণ হয়।

এই ডাইনকে পূজায় আহূত করতে হলে, রোগী যা খেতে প্রবল ভাবে অভিলাশ জম্মে তাহাই পূজাতে অর্পন করতে হয় এবং প্রয়োজনে মাছ, মাংস রেঁধে পূজায় উৎসর্গ করতে হয়।

কালাখী-কালাখ্যান রীমুন ঃ এই উপদেবী জলধিষ্ঠ দেবী। এই দেবীকে উপাসনা করতে হলে নোংরা জলে পূজার আসন তৈরী করে, রীতিশ্রদ্দভাবে পূজার আয়োজন করতে হয়। সাধারণতঃ এই রকম পূজা আহুতিতে একটি মোরগ উৎসর্গ করতে হয়।

ইহা মানুষের চর্ম রোগের জন্য দোষারোপ করা হয়ে থাকে এবং, এই উপদেবীকে পূজা অর্চ্চনা করলে চর্ম রোগ প্রশমিত ঘটে। সাধারনতঃ মহামারী চর্ম রোগের সময় "বীরচিক মান-চাকমুন" অর্থাৎ গুটি বসন্তের চারিদিকে সংক্রামক ফেলে উঠলে প্রতিকারের জন্য উক্ত গুটি দেবতাকে, উপাসনায় লিপ্ত হতে হয়।

"কিরি-কিরিন রীমুন" ঃ এইসব উপদেবীকে পূজায় আহূত করতে হলে, একটি হাঁস বলী হিসাবে উৎসর্গ করতে হয়। সাধারনত কোন ব্যক্তির যক্ষ্মা এবং হাঁপানী রোগ গ্রস্ত হলে এই দেবীকে নাম ধরে উপাসনা করলে, রোগী অচিরেই নিরাময় হয়ে উঠে।

মহাদেব মা দেবীন রীমুন ঃ খুব সম্ভবতঃ এই নামের অন্তরালে রূপিনীদের ভাষার অন্য কিছু একটা নাম আছে। সাধারনতঃ এই নামটি সন্ধ্যার পূজায় আহূত হয়। আবার গভীর রাত্রে আরেকটি নাম ধরে তাকে আহূত করতে হয়; তাও খুব

রীতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা পার্ব্বন সম্পন্ন করতে হয়। সবচেয়ে জটিল রোগীকে চূড়ান্তভাবে দোহাই মূলক পূজার আহূতি হচ্ছে, এই পূজা। রোগীর জটিলতার উপর নির্ভর করে, পশু পাখির বলীর প্রণালী নির্ধারণ করতে হয়। যেমন ঃ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ পাগল হয়ে গেলে, ডাইনীর কবলে পড়ে মানুষ পাগলের ন্যায় কথাবার্তা বললে হাঁস না হয় কবুতর দিয়ে পূজায় অর্পন করতে হয়।

নগসুক মীতাইন রীমুন ঃ এই পূজার উপদেবীকে পূজা অর্চ্চনা করতে হলে কোন বলী বা উৎসর্গের প্রয়োজন নেই। কেবল ভোজ অর্পনের মাধ্যমেই, এইসব উপাসনায় বসতে হয়। কোন কোন গোষ্ঠীতে একে রঙতীক পূজা বলেও অভিহিত করে থাকে। লোককথায় সাধারনত এই "কোনু দেবী" অর্থাৎ নকসুগমা মীতায় কুদৃষ্টি যাকে ফেলে, তার রাত্রে নিদ্রা হবে না। কিন্তু নগসুক/নকসুগ মীতাইকে পূজাঅর্পন করার সঙ্গে সঙ্গেই রোগী আরোগ্য লাভ হয়ে উঠবে।

দিনকাল পরিবর্তেনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের বিশ্বাস এবং ব্যবস্থাপনাও পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে লোকআধারিত কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে রোগশোক নিরাময়ের প্রচেষ্টা আজকাল নেই বললেই চলে এবং এই অচেনা অশরীরি নিরকার মূর্ত্তকে দোহাই পাঠ পূজার মাধ্যমে রোগীকে আরোগ্য করে তেলার একটা বিশ্বাস শুধু অবান্তর নয়, অযৌক্তিও বটে। তাই বর্তমানকালে বস্তুতান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে উঠে না এবং তাচ্ছিল্য হয়ে এই সব রোগ নিরাময়ের পূজা পার্ব্বন শেষে অলৌকিক এবং যাদুতান্ত্রিক মহলের ব্যাপার স্যাপার বলে পরিগণিত হয়। ফলে এইসব মান্ধাতা আমলের চিকিৎসার পদ্ধতি দিন দিন পরিহার করে রূপিনীদের নব্যগোষ্ঠীর একটি অংশ বস্তুবাদী ডাক্তার, কবিরাজীর প্রতি শরনাপন্ন হয়ে উঠে।

শুভতিথি ও পার্ব্বন

প্রাককালে রূপিনীদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিথি অনুসারে পূজা পার্ব্বন সম্পন্ন করতে হয় এবং তারমধ্যে অমাবস্যা পূর্ণিমা, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, উল্লেখযোগ্য তিথি সম্পর্কেই কেবল অবগত ছিল। এর বাদবাকী তিথি ও পার্ব্বন মূল হিন্দুরশাখা সনাতন ধর্মের অনুপ্রানিত হয়ে উঠার পর, রূপিনীদের আধ্যাত্মিক জীবনে রপ্ত হয়, তা বেশীদিনের কথা নয়। প্রাককালের এই তিথি পার্ব্বন

হচ্ছে যেমন ঃ মহাদেব মা দেবীকে পূজায় অর্পন করে উপাসনা করতে হলে, কৃষ্ণপক্ষে নিবেদন করলে রীতি অনুসারে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আবার এই পূজা অমাবস্যার দিন শশ্মানে উপাসনা হলে জটিল রোগের জন্য বেশ প্রশমিত হয়। সাধারনতঃ পূর্ণিমার দিনে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তা আধ্যাত্মিক ভাবে পূন্য বলে ধরে নেওয়া হয়। লোকাচার, উৎসব অনুষ্ঠান, পূর্ণিমার দিন ধার্য্য করতে পারলে শুভ বলে বিশ্বাস করা সেকালের একটা প্রথা ছিল। আবার বিবাহ অনুষ্ঠান "কেরপূজা", "তৗয়খীলুম" অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারলে, আধ্যাত্মিক বিচার করে শুভ এবং অন্যদিকে সুবিধা বলে সচরাচর উক্ত পক্ষতেই সম্পন্ন করা হয়। রূপিনী লোক ও আধ্যাত্মিক জীবনে শুভবার, শুভদিন সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, এইসব দিনে বিবাহ অনুষ্ঠান এবং পারিবারিক উৎসব পালন করে থাকে। আজকাল উক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দুর ধাঁচে এসে বাজারে বাজারে 'পঞ্জিকা' নির্দেশিকা অনুসারে যা, শুভ দিন তিথি উল্লেখ করে থাকে একেই শুভ বলে স্বীকার করা একটা রীতি শ্রদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তার পাশাপাশি বেদ ব্রহ্মণ যেটাকে, শুভ বলে গ্রহণ করবে সেটাই যথাযথ ভাবে শিরোধার্য্য করে নিতে হয়।

প্রাককালে থেকেই, রূপিনীদের মধ্যে তিথি পার্ব্বনটি মুষ্টিমেয় চক্ষুপাত অংশের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এইসব তিথি হচ্ছে যেমন ঃ ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে, মাইনকমা পূজা অর্থাৎ লক্ষ্মী পূজার কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এই উপলক্ষে কেউ কেউ ব্রতও পালন করে থাকেন। সেইদিনই, জুমে নবান্ন উৎসব হয়। ফাল্গুনের চতুর্দ্দশীতে কেউ কেউ শিবব্রত অথবা বেল গাছের নীচে পূজা অর্পন, সেকালে রীতি ছিল এবং এই ব্রত, বেশী বয়সীদের মধ্যে পালন করে থাকে। এইক্ষেত্রে পশু পাখী উৎসর্গ করতে হয় না। কেবল ভোজ নিবদেন করেই, পূজার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

আজকাল অবশ্য, হিন্দুর সনাতন ধর্ম অনুশীলনের পরবর্তীকাল থেকেই, রূপিনীদের মধ্যে বৃহস্পতিবার ব্রত, কৃষ্ণ জন্ম অষ্টমী ব্রত, লক্ষ্মী ব্রত, দূর্গা পূজা ব্রত সবকিছুই পালন করতে দেখা যায়। আবার কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সৎকারের দিন থেকে ১৩ দিন যাবৎ ব্রত না হয় নিরামিষ ভোজনে পালন করতে দেখা যায় (নিরামিষ ভোজন কেবল এক পিড়ি বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের মধ্যে সীমিত বংশের মধ্যে পালন করতে হয়) বর্তমানকালে এসেও জন্ম মৃত্যু অমাবস্যাতে হলে অশুভ। অন্যদিকে পূর্ণিমা তিথিতে শুভ বলে ধরে নেওয়া প্রাককালের বিশ্বাসের সঙ্গে কোন তারতম্যতা ঘটেনি। তার পাশাপাশি বিবাহের শুভ বারও, অপরিবর্তন হয়ে

যায়। আজকাল গৃহে গৃহে মন্দির গড়ে উঠাতে সনাতন দেব দেবীর পূজা পার্ব্বনে, আরো নিবীড়তা লাভ হয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পূজা অর্চনা, তিথি পার্ব্বন, আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটেছে।

পূর্ব্ব লক্ষ্মণ ও ইঙ্গিত বিশ্বাস

রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ব্বলক্ষণ ও ইঙ্গিত এবং তার প্রতিফলন নির্নয় করা সুপ্রাচীনকাল থেকেই বহন করে এসেছে। তারমধ্যে, মানুষের অলঙ্ঘনীয় রীতি নীতি হিসাবে কোন, কোন পূর্ব্বলক্ষন মেনে চলার প্রচলিত ছিল, এবং আবার কোন কোন অলীক সঙ্কেত বলে, ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করে তুলে। এইসব পূর্ব্বলক্ষন এবং ইঙ্গিতের ফলপ্রসূ নিশ্চয়ই প্রমানিত ছিল। সেই যুগে তাই তারা ঐ রীতি নীতিকে সুদীর্ঘ যুগ ধরে তলিয়ে লালন পালন করে এসেছে, তার কোন সন্দেহ নেই। মোট কথা এই নানান কুসংস্কার ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী, অনার্য সূত্র থেকেই পেয়েছিল বলে ঐতিহাসিক সূত্র থেকে অবতারনা করা যায়। প্রাককাল থেকে প্রবাহিত পূর্ব্ব লক্ষন ও ইঙ্গিত নীচে দেওয়া হল। যেমন ঃ

যাত্রাকালীন পূর্ব্ব লক্ষণ ঃ যাত্রাকালে রাস্তায় কোন সর্প ডান পাশে অতিক্রম করলে যাত্রা অশুভ লক্ষণ তাতে শত্রু নাগাল পেতে পারে। আবার সর্প যদি বাম পাশে অতিক্রম করে তাহলে, শুভ সঙ্কেত হচ্ছে শত্রু মুক্ত। যদি যাত্রার পদার্পনে হোঁচট বা গায়ে কোন আঘাত বা প্রতিরোধ আসে, তাহলে অশুভ বলে কিয়ৎক্ষণ থেমে, আবার যাত্রা শুরু করতে হয়। কেউ যদি হাসি দেয় বা নিজেরও হাসির উদ্বেগ হয়, এই যাত্রা অশুভ বলে ধরে নিতে হয়।

জন্তুর ডাকের পূর্ব্ব লক্ষণ ঃ খেক শিয়াল (শিয়াল রান্ধা) যদি বসতিতে উঠে ডাক মারে, তাহলে এটা উক্ত বসতির পক্ষে পরম অশুভ লক্ষণ। তার প্রতিফলন হচ্ছে, বসতিতে মহামারী ফেলার সংকেত না হয় কোন ব্যক্তির অশুভ পূর্ব্ব

সংকেত।

স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত ঃ প্রাককালে জুম বাছাই করার পূর্বে, উক্ত ক্ষেত্রের মাঁটি বাঁশের চুঙ্গায় ভরে, রাত্রে শোবার সময় বালিশের নীচে রেখে ঘুমাতে হয়। স্বপ্নে যদি আগুন দেখে, তাহলে ঐ জুম নিয়ে বিবাদ বাঁধার সংকেত। আর যদি ঘর ভেঁঙ্গে পড়ার স্বপ্নে দর্শায়, এতে পরিবারের ক্ষতি সাধনের সংকেত বলে ধরা হত। স্বপ্নে যদি বর্ষন অথবা মেঘ দেখে তাহলে, সুফলনের সঙ্কেত। অবার জুম ক্ষেত্রটি চাছানো পরিষ্কার দেখালে, কুফলনের ইঙ্গিত।

দৈনন্দিন স্বপ্নে যদি নদী প্লাবন দৃষ্ট হয় তাহলে, একযোগে দলবদ্ধতা ভাবে থাকার ইঙ্গিত বহন করে। আবার যদি স্বপ্নতে অন্ন ভোজনে লিপ্ত থাকার দৃষ্ট হয়, তাহলে স্বীয় পরিশ্রম সূচক দৃশ্য। স্বপ্নতে যদি অর্থ লভ্য দৃষ্ট হয়, তাহলে সম্মানের চিহ্ন। আর যদি অর্থ হানি ঘটে পরিবারের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। কারও মৃত দেহকে দাহ করার দৃশ্য হলে, মাছ বা মাংস ভোজন লভ্যের সংকেত। আবার পুরানো মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হলে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশী। স্বপ্নে মলত্যাগে স্বীয় লিপ্ত হতে দেখলে, আশা বিফলতার সংকেত বলে বিবেচিত হয়। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির মলের গন্ধ অনুভব দৃষ্ট হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি তাকে সমালোচনায় প্রবল বলে ধরে নিতে হবে।

দৈহিক ইঙ্গিত বা সংকেত বিচার

কানের ধ্বনি সংকেত ঃ অকারণে কানে যদি ইং...... ধ্বনি বাজে লোক প্রবাদের মতে "লাড়িমা মাইচান নুঙগ" অর্থাৎ লাড়িমাহচ্ছে রূপিনীদের পরলোকের রান্ধনী ঝি। সে ডাক দিয়েছে মানেই হল, উক্ত ব্যক্তির আয়ুর ডাক এসেছে। এবম্বিধে উত্তর দিতে হয় যেমন ঃ "আংফায়ান' ফায়ান-তুলামনিসিনি তাঁয় কাঁলীগখেঁই, হলং থাঁইসিনি তাঁয় কাঁফুঙখাই, - য়াখিরিক খরগ রাঁতমকাঁথাং খাঁই সাঁয়নি বক্রং কখকাঁই - আনরাফাঁইদি" অর্থাৎ হা আসব একযোগে বাধা ষষ্ঠ মন তুলা যদি জলাদিতে তলিয়ে যায় জলাদিতে যদি ষষ্ঠ খণ্ড পাথর ভাছে-শুখা কাঠের সিঁড়ি খাপে যদি নুতন পাতা গজায়, - কুকরের শির দেশে যদি সিং গজে, তার

ডাকে সে আসবে। প্রকারান্তরে ঐ লাড়িমার ডাকে সে আর যাওয়ার কথা রইল কোথায় ? এই সূত্রেই কানের ইং ধ্বনিকে, আয়ুর সংকেত বলে ধরে নেওয়া হত। কানের আভ্যন্তরীন ভাগ চুলকালে, বৃষ্টির সংকেত বহন করে।

চক্ষু নাচা ঃ যদি বাম পাশের চোখ নাচে তাহলে শুভ সংকেত। আর যদি ডান চোখ নাচে তাহলে, পরম অশুভের সংকেত বহন করে থাকে। এতে শারীরিক অসুস্থতা আসতে পারে, না হয় ঝগড়া বিবাদ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা বেশী। শুভ সংকেত হচ্ছে নানান মনোরঞ্জক দৃশ্য, এবং অভূত পূর্ব্ব দৃশ্য দেখার সম্ভাবনা বেশী।

মুখ বা ঠোঁট নাচা ঃ যদি বাম পাশে ঠোঁট নাচে তাহলে ঐ দিনে অফুরন্ত হাসির সংকেত বলে ধরে নিতে হয়, আর যদি ডান পাশের ঠোঁট নড়ে তাহলে বুঝতে হবে এইদিনে তার দুঃখ আছে। এতে কোন স্বজন ব্যক্তির বিয়োগ এর সংকেত বহন করে থাকে।

আজকাল অবশ্য হিন্দুর ধাঁচে সমাজ বিবর্তন ফলে অনেক কিছু বর্জন অনেক কিছুতে আবার বরণও করে নেয়। তাই এই সব লক্ষণ ও বিশ্বাস কোনটি আদি আবার কোনটি পরে উৎপন্ন হয়েছে, তা নিয়ে বহু বির্তকের বিষয়। তবে এটা ঠিক যে, পৌরাণিক ধাঁচের এইসব খুঁটি নাটি পূর্ব্ব লক্ষণ সংকেত উত্তরোত্তর চর্চার অভাবে আধ্যাত্মিক জীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেবল হিন্দুর সাদৃশ্য কয়েকটি লক্ষণ, সংকেত, ইঙ্গিত, সমাজে অস্তিত্ব রয়ে যায়। ফলে উপরিউক্ত যে কয়েকটি পূর্ব্ব লক্ষণের সংকেত ও বিচারের কথা তুলেছি তা, যে, কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই একাত্মতা বা ঐক্যতা আছে, স্বীকার করতেই হবে।

নবম অধ্যায়

ভাষা ও কৃষ্টি

ভাষা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনার প্রারম্ভে, অধিক কাল রূপিনীরা পদে পদে হিংসাত্মক মূলক ও বৈষম্য আচরণে স্বীকার হতে হয়েছিল, তার ইতিবৃত্তের শীর্ষক

নিচে বৃত্তান্তের মাধ্যমে পরিস্ফুট ভাবে অবতারণা করা যাবে যে, রূপিনীরা কে ? সুপ্রাচীনকালে হিড়িম্ব দেশের প্রাচীন অধিবাসী কাছাড়ীরা, কেবল রূপিনী গোষ্ঠীকেই ধরে, ধরে, তাদের পরম অধিষ্ঠ দেবী রণচণ্ডীর কাছে বলী উৎসর্গ করত । বলা বাহুল্য প্রাককালে কেবল পর গোত্রকেই দেব পূজায় বলী নিবেদন করে থাকে । তাই কাছাড়ীদের এই বৈষম্যমূলক আচরণ তার কোন ব্যতিক্রম নেই বললেই চলে । এরপরে আবার রত্ন মাণিক্যের আমলে রূপিনীরা যখনি তৈয় রূপিনীতে উপনিবিষ্ট ছিল, তখন কুকিরা সগোত্র নয় বলে, উক্ত গোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যা এবং বিতাড়নের অভিযান চালিয়ে ছিল। তাতে উক্ত গোষ্ঠীরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সুযোগ বুঝে বিভিন্ন দিকে সরে পড়ে; এই আতঙ্ক হত্যার স্বীকার ভীত সন্ত্রস্থ রূপিনীরা উত্তরকালেও স্মরণ করে থাকে ।

এইসব আতঙ্কে জর্জরিত হয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যা নিয়ে শেষে তদানীন্তন অবিভক্ত ত্রিপুরার ভূ-অংশ রূপিনীরা মায়নী হালুঙ্গে (বর্তমান পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম) উপনিবিষ্ট হয়, এবং সেখানেও সুখে দিন যাপন করতে পারেনি। অচিরেই পরগোত্র এবং শরনার্থী নিমিত্তে তিপরা রাজার দ্বারা হিংসাত্মক নিপীড়নের ফলে পুর্নবার ভীত সন্ত্রষ্ট রূপিনীরা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করে, সরে পড়ে দূর্গম পর্বতোপরির অঞ্চলে আত্মগোপনের জন্য । সেই স্থানেই, স্থায়ী ভাবে বসবাস করে জুম কৃষিকে বেছে নেয় জীবন যাপনের মুখ্য উপজীব্য হিসাবে ।

তাহলে উপরিউক্ত শীর্ষক থেকে সহজেই সার নিষ্কাষন করা যায় যে রূপিনীরা অন্যান্য জাতির দৃষ্টে পরগোত্রে উদ্ভব বলে পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই । তদানীন্তন তাদের এই বৈষম্য মূলক বিপদ ডেকে আনে তাদের সংরক্ষিত বেশ ভূষা এবং ভাষা যা কাছড়ী, কুকি এবং ত্রিপুরী জাতির বেশভূষা এবং ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল না । এই অসামঞ্জস্যতার নেপথ্যে একটিই মাত্র কারণ ছিল, যে রূপিনী গোষ্ঠীরা সাধারণ ভাবে জানা যায় যে, তারা কাছাড়ীও নয়, কুকিও নয় এবং তিপরাও নয় । তারা হচ্ছে মুষ্টিমেয় জাতি পাইলাং বা পায়াং এর উপগোষ্ঠী । ভারতের খ্রীষ্টপূর্ব্ব অধিবাসী “অস্ট্রীক” জাতিদেরই একটি শাখা । ঐ ‘পায়াং’ গোষ্ঠীরা খুব সম্ভবতঃ উত্তর খণ্ড থেকে ধাবন করে লোহিত বা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় এসে প্রথম বসবাস করেন, এবং সুবরাইখুণ্ড নামে একটি স্থানে একত্রিত হয়ে উপনিবেশ গড়ে উঠে । কারণে কারণে সেখান থেকে উৎখাত হয়ে, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে । তাদেরই একটি শাখা কপিলা নদীর দক্ষিণ পাশে তৈয়রূপিনী বা তীয়রূপিনী নদীর উপত্যকায় বসতি গড়ে তুলে । তখন থেকে ঐ

গোষ্ঠীর নাম রূপিনী বলে চিহ্নিত হয়। তাহলে এই রূপিনী নামকরণ গোষ্ঠীক্রমে নয়, আবার ভাষাগত বিচারেও নয়; যেটা নামকরণ হয়েছিল পবিত্র জল তৈয় রূপিনী নাম জুড়ে। গোষ্ঠীর নাম পরিবর্তন ঘটলেও, চির সঙ্গে জড়িত ভাষা, সংস্কৃতি ও বেশভূষা সহসা কেউ পরিহার করতে চাই না। উত্তরকালে তিব্বতুবর্ম্মন ভাষা ভাষীর সঙ্গে বেশীর ভাগ জীবন যাপন অতিবাহিত হয়ে উঠে বলে, উক্ত ভাষায় সাথে সাথে তাদের নিজস্ব ভাষাকেও একাত্ব করে নেয়। এতে বেশীর ভাগ প্রত্যয় এবং মূল শব্দের উৎসর্গ হিসাবে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়; যেমন ঃ সান্ধাইচীক এই শব্দটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ অর্থাৎ ভাই বোনের সম্পর্কে "সন্ধাই" বলা হত। পরে এই শব্দের সঙ্গে বুড়ু ভাষার অর্ন্তগত শব্দ অকচীক প্রত্যয় সংযোগ করে শব্দটিকে আরও পূর্ণাঙ্গ করে তুলে। যেমন ঃ সান্ধাই + আকচীক = সান্ধাইচীক। আর একটি উদাহরণ যেমন ঃ "আটে" = শিশু অর্থাৎ আটে শব্দটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দ এবং এর সঙ্গে বুড়ু বা বরক ভাষা অর্ন্তগত "কীলীয়" শব্দটি প্রত্যয় সংযোগ করে শব্দটিকে অতিরঞ্জিত করে তুলে; যেমন আটে + কীলীয় = আটেকীলীয় = অর্থাৎ শিশু। এইভাবে মূল পায়াং শব্দের সঙ্গে বুড়ু বা ককবরক শব্দের প্রত্যয় সংযোগ করে কৃত্রিম ভাষার রূপান্তর নিচে কয়েকটি দেওয়া হল ঃ

নং	কৃত্রিম ভাষা বা রূপিনীদের চলতি ভাষা	বাংলা অনুবাদ	আদি পায়াং বা রূপিনীদের আদি ভাষা	বুড়ু বা বরক ভাষার প্রত্যয়
১।	জীনমানসীঅ	জুরিমানা প্রদান	জানমান	সীঅ
২।	সীতুবরিছা	কমসংখ্যা	সীতুবরি	ছা
৩।	পাঞ্চীতাউ	পরবর্ণ	পাঞ্চী	তাউ
৪।	নঙখাই	খাঁড়া	নঙ	খাই
৫।	দুয়ার	দরজা	দু	য়ার
৬।	মিয়ারী	লেপ	মিয়া	রি

উপরি উক্ত শব্দের সারিতে চতুর্থ বুড়ু বা কক বরক ভাষা ভাষীর শব্দের ভাণ্ডারের অর্ন্তগত, অপ্রত্যয় শব্দ বিশেষভাবে সংযোগ স্থাপন লাভ করেছে তার কোন সন্দেহ নেই। আবার উপসর্গ হিসাবেও বুড়ু বা বরক ভাষার শব্দকে পায়াং ভাষার মূল শব্দের সঙ্গে ব্যবহার করে, কৃত্রিম ভাষা তৈরী করেছে; যেমন ঃ

নং	কৃত্রিম ভাষা বা রূপিনীদের চলতি ভাষা	বাংলা অনুবাদ	পায়াংভাষা বা রূপিনীদের আদি ভাষা	বুড়ু বা বরক ভাষার শব্দের উপসর্গ
১।	তাঙকুউা	নিরানী	খুঁউা	তাঙ
২।	তৌয়বুক	ডোবা	বুক	তৌয়
৩।	পাইতক্রা	বলবান	তাক্রা	পাই
৪।	তৌয়ফীর	জলাধার বা হ্রদ	ফীর/ফর	তৌয়
৫।	কুড়িয়ামা	বিন্নীধান	মা	কুড়িয়া/গুরিয়া

উপরিউক্ত শব্দ তালিকার তৃতীয় সারিটি, বুড়ু বা ককবরক ভাষায় অর্ন্তগত শব্দ নয়। এইসব শব্দ রূপিনীদের আদি ভাষা যা উপসর্গ ব্যতিত বর্তমানে রূপিনীরা তা ব্যবহার করে না। এই সূত্রেই উপসর্গ শব্দ হিসাবে বুড়ু বা বরক ভাষা শব্দ থেকে রপ্ত করা হয়। অথচ প্রাককালে এইসব শব্দ বিনা উপসর্গেই এক একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ ছিল। যেমন পাইতক্রা = পাই শব্দটি বাদ দিলে তক্রা/তক্র; শব্দটি স্বয়ং সম্পূর্ণ তক্রা = মজবুত বা শক্ত, এবং ককবরক শব্দে 'কৌরাক'। এই তক্রা শব্দটি ভারতের পৌরাণিক ভাষার শব্দ থেকে হয়তো রপ্ত হয়েছে এবং রূপিনীদের বাক্য বিধানে তা, শব্দ হিসাবে সংরক্ষিত রয়ে যায়। আরও কয়েকটি শব্দ আছে যা ভারতের পৌরাণিক ভাষা থেকে দারবদ্ধ শব্দ যেমন 'পাঞ্চী' অর্থাৎ বর্ণ; 'পাব' = পালন বা পার্ব্বন; 'জীনমান' = জরিমানা বা প্রতিদানে; দিয়ান/ধিয়ান = ধ্যান বা অনুধাবন করে বিচার করা।

পাঞ্চি ঃ সুপ্রাচীনকালে সমতল উপহিমালয়ের আদিবাসী নিষাদ বা অষ্ট্রীক জাতির ভাষাকে পক্ষী ভাষা বলে চিহ্নিত করতেন। খুব সম্ভবত তাদের বাক্য বিধান অনুধাবনাতীত বলে আর্যরা উক্ত ভাষাকে, পঞ্চী সুর বলে অভিহিত করত। এই পঞ্চি শব্দই পরে কিছুটা বিকৃত হয়ে পাঞ্চী শব্দে রূপ লাভ করে এবং এই শব্দটির অষ্ট্র এশিয়াটিক ভাষার অর্ন্তগত রূপিনী এবং রিয়াংদের মধ্যে আজও বিদ্যমান।

দিয়ান/ধিয়ান ঃ সুপ্রাচীনকালে সামাজিক প্রথানুবর্তী (Custom) ধর্মানুবর্তী রীতি নীতি (Cult) এর সমবেতভাবে স্মরণ করে, কোন অপরাধীকে

বিচারের ব্যবস্থা করা হত। সুপ্রাচীন অলিখিত রীতি নীতিকে সাজিয়ে গুজিয়ে আইন প্রনয়ণ, বিচার ও শাসন করা সহজ কথা নয়, এবং এতে প্রবল ধ্যান ধারনা প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতে এই ধ্যান শব্দটি বিকৃত হয়ে প্রাককালে রূপিনীদের বিচার ব্যবস্থার নাম দিয়ান/ধিয়ান শব্দে রূপলাভ করে।

পাব ঃ এই শব্দটির সংস্কৃত পার্ব্বন শব্দ থেকে নিষ্কৃতি ঘটে। বিচারের (দিয়ান) এর প্রথানুবর্তী আইন লঙ্ঘনকারীকে আপত্তি এবং নিষ্পত্তি স্বরূপ রায় প্রদান করলে এবং এই বিচারের রায় শর্ত সাপেক্ষ দোষী ব্যক্তিকে পার্ব্বন/পালন করার বিকৃত শব্দ উদ্ভব হচ্ছে 'পাব', যা রূপিনীদের সামাজিক বিচার আচারে ব্যবহৃত শব্দে রূপ লাভ করে।

জীনমান ঃ ভারতের পৌরাণিক ভাষা জুরমানা শব্দ থেকেই জীনমান বিকৃত শব্দে রূপ লাভ করে। রূপিনীদের সমাজে বিবাহের ৬ থেকে ৭ বছর পর স্ত্রীর মাতা পিতা বা বড় ভাইয়ের ঘরে গিয়ে উপহার স্বরূপ কোন কিছু প্রতিদান করতে হত। প্রাককালে প্রতিদান মূলক উপলক্ষে একটি ভোঁজ সভা অনুষ্ঠিত হত এবং স্ত্রীর শৈশবের ভরণ পোষনের জন্য বিয়ের পর জামাই এর পক্ষে দায়ীবদ্ধ জুরিমানা বলে অভিহিত করা হত এবং এই জুরমান বা জরিমানাটি বিকৃত রূপে জীনমান শব্দে রূপ লাভ করে। এইসব ছাড়াও সংস্কৃত এবং পালি ভাষা থেকে রপ্ত হয়ে এসে রূপিনীদের আদিম ভাষার শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পরিলক্ষিত হয়। রূপিনীদের ভাষার অর্ন্তগত শব্দ যা অমিশ্রিত শব্দ বলে স্বীকৃত হয়েছে, এবং আধুনীক রূপিনীদের চলতি ভাষায় ব্যবহার সচরাচর দেখা যায়, এইসব অদ্বারিত শব্দ নীচে দেওয়া হল, যেমন ঃ

রূপিনী ভাষা	বাংলা ভাষা	বরক ভাষা
ককগদল	চেঁকীশাক	মিখুমুচক
আমতীয়	আনারস	অনদ্রর্শ
নুউাই	প্রনাম	খুলুম
বাদল	জলকচু	মীয়তু

লচি	খামাকচু	খামা
পামলাই	বাঁশের মূলের উল	মিখুম্ রতৌয়
বুঙ	গ্রাম	কামি
লেমসীয়	বন্য তুলসী	বান্তা
দারিয়া	বাদ্য বাজক	দাংখল
কেরজাঙ	পুরোহিত	অচাই
জুঙ	মুখ্য	কতর
অটে	শিশু	কলাই বীছা
আম	খাওয়া	চা
নগনু	মৃত দেহের পায়ে বলি উৎসর্গ	ফারা
উা	পশু পাখি	মীয়
বাঙ	আত্মা	ফাকা

প্রাককালে রূপিনী অর্থাৎ পায়াং গোষ্ঠীরা অষ্ট্রীক ভাষা থেকে মূল ঘুরে গিয়ে যখন বুড়ু বা বরক ভাষাকে আত্মস্থ করে নেয় এবং তখন তারা অপূরক শব্দে বিভ্রান্ত হয়ে উঠে। তারা বাধ্য হয়ে বুড়ু ভাষা থেকে একাধিক শব্দ সংযোজিত করে উপ ভাষা সৃষ্টি করে। এইসব উপভাষা শব্দ এর তালিকা নীচে দেওয়া হল।
যেমন ঃ

রূপিনী ভাষা	**বাংলা ভাষা**	**বরক ভাষা**
মীয়কঙ	দেরজ	দেরশঃ
দাখুথা	তাক্কাল	দামীরা
তিপরাদাল'	এলেংচা	এলেংচা
মিসতক	বর্তা/বটা	মসদেং
উরিবার	জবা	জবা

প্রাককালে রূপিনী বড়ু বা বরক ভাষা উচ্চারণ করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক শব্দ সঠিক উচ্চারণের অনুকূলে আসে না। কেননা, প্রাককালে রূপিনীরা এষ্ট্রো এয়িয়াটিক জিভ্ভ্যস্ত বলে দ্রুত গতিতে কথা বলার প্রবনতা লক্ষ করা যায়, তাই সেখানে উচ্চারণের প্রয়াসে আদি, মধ্য পদের অন্তে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন

ঘটে এবং তাতে পদের শোভা হানি হয় এবং সঠিক উচ্চারণ বিকৃত হয়ে যায়। এই বিকৃত উচ্চারণের শব্দ নীচে দেওয়া হল। যেমন ঃ

রূপিনীদের চলতি ভাষা এবং বরক ভাষার দ্বারাকৃত বিকৃত শব্দ	বাংলা অনুবাদ	বড়ু বা বরক অর্ন্তগত চলতি ভাষা
ই	বস্ত্রাদি/কাপড়	রি
য্যাক	হাত	ইয়াক
য়্যাসি	আঙ্গুল	য়াসি
জাকঙ	পা	য়াকীং
মাকখরা	বানর	মীখীরা
কর্ফল	পেঁপে	কুয়াইফল
কক্খ্রেং	অড়ল	কয়খেলেং
বীরাচীক	বুড়ী	বীরীয়চীক
মীর্স	মরিচ	মস
তাউ	পাখি	তক
ইট্রাক	খেস কাপড়	রিতীরাক
ইছা	মেয়েদের বুকের আচ্ছাদন	রিছা
ইকনাই	মেয়েদের নিম্ন অঙ্গের আচ্ছাদন	রিগীনাই
মাব'/বীতীংব	কি	তীমা/তাম'
দাকতি	তাড়াতাড়ি	দাতি
কীবীর	পাগল	কবর
আতকা	তুতাপাখি	আকাতাক
কার্ভ	কথা	কক্
নাউ	তোমরা	নক
লাদি	নেও/লও	নাদি
খুঁনচুর	কান	খুঞ্জু

কিনদি/কিনিতদি	সরে যাও	কনদি
খাৎদি	দোড়াও	খারদি

রূপিনী ভাষায় "না"বাচক পদের অন্তে 'য়া' বা 'য্যা' প্রত্যয় সংযুক্ত শব্দ লক্ষ করা যায় যা বরক ভাষায় কেবল য়া শব্দের প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেমন ঃ (রূপিনী ভাষায়) আঙ খাঁলাই মানয্যা আবার (বরক ভাষায়) অঙখাঁলাইমায়া। দ্রুত গতিতে কথা বলার প্রবনতার 'য়া' স্থানে 'য্যা' ব্যবহার হয়। আবার অনেক সময় এই 'না' বাচক শব্দতেই 'য়া' ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন ঃ 'আঙ চায়া, অন্যদিকে বরক ভাষাতে ঠিক একই রকম লক্ষ করা যায়, যেমন ঃ আঙ চায়া। যত রাগ এবং দ্রুতভাবে বাক্য বললেও বাক্য বয়ন দ্রুত ঘটবে। কিন্তু শব্দ পরিবর্ত্তন হবে না, যেমন ঃ দ্রুতভাবে বললেও 'আঙ চ্যাজ্যা' বললে বাক্য শোভ হানি হবে। নীচে কয়েকটি এই প্রকারের অবিভক্তি শব্দ দেওয়া হল, যেমন ঃ

রূপিনী ভাষা	বাংলা ভাষা	বরক ভাষা
থাঙমানয্যা	যেতে পারব না	থাঙমায়া
হিমমানয্যা	হাঁটতে পারব না	হিমমায়া
কামানয্যা	উঠতে পারব না	কায়মায়া
চায়া	খাব না	চায়া
চামানয্যা	খেতে পারব না	চাইমায়া
থুয়া	ঘুমাব না	থুয়া
থুমানয্যা	ঘুমাতে পারব না	থুইমায়া
সিনিয়া	চিনি না	সিনিয়া
সিনিমানয্যা	চিনিতে পারি না	সিনি-মায়া

রূপিনীদের ভাষায় তরল বর্ণটি শব্দবয়নে স্বাধীন ব্যবহারের লক্ষগোচর হয়। এইক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ভাষার বৈশিষ্ট কিছু কিছু পাওয়া যায়। ভাষা তত্ত্বের পুঁথি থেকে সংগ্রহ একটি শীর্ষ এখানে উল্লেখ করতে হয়। যেমন ঃ "ধ্বনি দিক থেকে বৈদিক এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু বৈদিকের একটি মূর্ধান্য (ল) কোথাও 'ড়' ব্যবহৃত হয়ে তাই ঋগ্বেদের প্রথম বাক্যটির দু'রকম পাঠ পাওয়া যায়। 'অগ্রমীলে' > অগ্রমীড়ে ৮। ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতেও এইসব 'র' 'ল' তরল বর্নকে স্বাধীন ভাবে ব্যবহারে লক্ষগোচর হয়। (লোকেরা > লকলা,

নাতিপুতির > লাতি পুঁতিলা)। যেহেতু রূপিনীরা অষ্ট্রীক বা নিষাদা অংশের অল্পায়ন উপগোষ্ঠী, সেইজন্য কোন না কোন যোগসূত্রে এককালীন ঐ ঝাড়খণ্ডী বাসীদের সঙ্গে 'পায়াং' গোষ্ঠীরা পারিপার্শ্বিকতায় হয়তো বসবাস করেছিল। ভাষা বিধানে 'অপিনিহিত" (Ipenthesis) ব্যবহারএ অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে রূপিনী ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

রূপিনীরা সাধারনতঃ তরল বর্নটি ('র' 'ল') ব্যবহার কোন, কোন ক্ষেত্রে স্বাধীন, কোন কোন স্থানে পদের আদিতে যদি, 'র' বর্ণ থাকে পদান্তেও, 'র' ধ্বনিতে সম্পন্ন করার প্রবনতা লক্ষ করা যায়; যেমন ঃ "রাইরৌঙ" (বেতের বন) প্রকৃত শব্দ হবে "রাইলৌঙ"। আসল কথা অন্তস্থ বা তরল বর্নের কম্পমান ধ্বনি যদি পদের আদিতে থাকে তাহলে পদের অন্তেও একই কম্পমান নির্গত হয়ে উঠে এবং মৃদু ও উচ্চ কম্পনের দিকে সচেষ্ট থাকে না। আবার যদি একই বাক্যটি কোন রূপিনী ভাষী 'ল' বর্ন নিয়ে সূচনা করে তাহলে পদান্তেও 'ল' ধ্বনিতেই শেষ হয়; যেমন ঃ "লাইলৌঙ" (বেতের বন)। আবার দ্বারকৃত শব্দ ক্ষেত্রেও তারা স্বাধীন ভাবে "ল" এবং 'র' ব্যবহার করে থাকে; যেমন ঃ কৌরাই আসল উচ্চারণ কৌলায়, কঁচি; এড়েংচা > এলেংচা; অখিড়ি > অখিলি = গতপরশু; খুরুম > খুলুম = নমস্কার; ককখ্রেং > কয়খেলেং = অড়ল। রূপিনীরা প্রাককালে হয়তো উপনিবেশের খাতিরে খুব সম্ভবতঃ একটি অজ্ঞাত ভাষাকে আত্মস্থ করতে হয়েছিল। তাই 'র' 'ল' বর্নের ধ্বনি ব্যবহারে বিষম সঙ্কটে পড়ে যায় এবং যথাযথ উচ্চারণে বিভ্রান্ত হয়ে উঠে। কিন্তু আবার, তাদের আদি ভাষা অর্থাৎ 'পায়াং' ভাষায় 'ল' ও 'র' বর্নের ধ্বনিটি যথাযথই উচ্চারণ করে। যেমন রূপিনী > রূপিনী = গোষ্ঠীর নাম, কেরজাঙ > কেরজাঙ = পুরোহিত; দারিয়া > দারিয়া = বাদ্যবাজক ইত্যাদি। কদাচিৎ লুপিনী, কেলজাঙ, দালিয়া বলে ভুল উচ্চারণ করে থাকে। যদি করে তাহলে রূপিনীদের শব্দ ভাণ্ডারের অর্ন্তগত অন্য একটি নাম হয়ে যাবে।

কিন্তু রূপিনীরা অল্পায়ন গোষ্ঠী হেতু তদানীন্তন সমৃদ্ধি ভাষা "বুড়ু" ভাষাকে আত্মস্থ করার ফলে 'র' 'ল' শব্দকে উল্টাপাল্টা উচ্চারণে কি একটা সঙ্কটে পড়েছে তা নীচে দেওয়া হল; যেমন ঃ

বঃ সঠিক উচ্চারণ ঃ নুঙ লুমদেলুম ? তুমি কি জ্বরে ভুগছ ?
রূঃ ভুল উচ্চারণ ঃ নুঙ রূমদে রুম ? তুমি কি ধর না কি ?
বঃ সঠিক উচ্চারণ ঃ আঙ বৌফাঙ রাখা আমি গাছ কেটেছি।
রূঃ ভুল উচ্চারণ ঃ আঙবৌফাঙ লাখা আমি গাছ নিয়েছি। তাহলে 'র' স্থলে 'ল'

আবার 'ল' এর জায়গায় 'র' স্থান পরিবর্তনে সাদারণতঃ শব্দের অর্থভেদ ঘটে যায়। আবার Pasparticiple পদে 'মীন' শব্দের প্রত্যয় সচরাচর লক্ষ হয় যা ককবরক ভাষায় 'মা' ব্যবহৃত হয়। আবার অনুরোধ সূচক বাক্যের শেষাংশে সুনিশ্চিত এবং গুরুত্ব আরোপ সূচক রূপিনীরা সাধারনত পদান্তে প্রত্যয় শব্দ 'হারেক' ব্যবহৃত হয়। যেখানে বরক ভাষায় 'দু' বলে প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। যেমন ঃ

রূপিনী ভাষা ঃ বুঁই-ন তা সাদি হারেক ?

ককবরক ভাষা ঃ বুঁই-ন তা সাদি দু ?

বস্তুতঃ শব্দ চয়নে বিষমী ভবন (Dissmiation) শব্দ সঙ্করায়ন > (Hybrid word); মিশ্রন শব্দ > (contamination) লোক বুৎপত্তি (Folk etylology) সমগ্র আধুনিক রূপিনী ভাষাকে প্রসারিত করে, এবং ওইসব শব্দের দ্বার নেয় বুড়ু পরিবারের ভাষাকে পূর্ণ রূপে আত্মস্থ করে; প্রকারান্তে তিব্বতু-বর্মন ভাষা ভাষি পর্যায়ে এসে পড়ে। কিন্তু আসল উচ্চারণ সেই পৌরাণিক ভাষা 'পায়াং বা পাইলাং সুরে বুড়ু ভাষায় বাক্যবায়ন চালিয়ে যায়, এবং পরে রূপিনীদের প্রাককালের ভাষা হারিয়ে গিয়ে 'বুড়ু' বা 'বরক' ভাষাকে নিজের ভাষা বলে জাহির করতে থাকে। প্রাককালে সামাজিক পরিকাঠামো গঠনে, হালাম বা পুরান কুকিদের সঙ্গে রূপিনীদের সামাজিক গঠন সাদৃশ্যতা থাকলেও কিন্তু হালাম ভাষার (থাদু ভাষার) সঙ্গে রূপিনীদের ভাষা একেবারে মিল নেই বললেই চলে। হালাম অথবা পুরাণ কুকিরা "থাদু" ভাষায় কথা বলে তা G P Singh স্পষ্টই বলেছেন যেমন > The old Kukis used thad on lingna from ca is possibly an indication of the man in which the earlies kuki immigrants were over run by the later one (304).

প্রাককালে গঙ্গা নদীর (মেখগু) সীমান্ত জুড়ে সমতলীয় ক্ষেত্র (সমতল) উপহিমালয়ের কিছু অংশ এইসব স্থানের বসবাসকারী আদিবাসীরা পক্ষীসুরে কথা বলার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদিকালে রূপিনীদের পক্ষীবর্ন অর্থাৎ "পাঞ্জী" বলে চিহ্নিত করেছিল, তা বিনা কারনে নাম প্রদান হতে পারে না। এই কথাটি ভিত্তি করেই রূপিনীরা আগে পক্ষী সুরে কথা বলে না তা, কি করে বিশ্বাস করব। নিশ্চয়ই ঐ পাখি ভাষা ভাষীর সঙ্গে প্রাককালে রূপিনীরা কিছু না কিছু যোগসূত্র থাকতে পারে, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। G.P. Singh এর মূল্যবান তথ্য নীচে দেওয়া হল ঃ

The Raj is have fairly developed language, which is

known a "Rawt" its sound is belived to be some thing like twetering of birds and is entirely different from the local kumaoni or Hindi one of the particularly of these laguastic structure of the 'Rajakiratas' is that it constitutes the synthesis of the Indo Aryan group of language.

আবার ঐতিহাসিক সূত্র ধরে অনুধাবন করা যায় যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্বে ব্রহ্ম দেশের নিম্ন অংশে রামদেশ (রমণ দেশ) নামে একটি স্থানে ছিল এবং সেখানে ভারতীয় উপনিবেশ জাতির দ্বারা উক্ত স্থানে প্রবল প্রভাবিত ছিল। খুব সম্ভবতঃ এইসব জাতির মধ্যে একটি অংশ আরাকান হয়ে, ভারতে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং লোহিত এবং ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় উপনিবেশ করে। গোষ্ঠীগত এবং ভাষাগত দিক দিয়ে তারাই পূর্ব্বখণ্ডের অষ্ট্রীক বলে পরিচয় হয়। এদের গোত্র সম্পর্ক গোষ্ঠীরা হচ্ছে যেমন ঃ মনখামার, তাঁইলাং, পাইলাং/পায়াং, রিয়াং, উা, আরও অনেক। এই সম্পর্কে একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের মন্তব্য নিচে প্রণিধান যোগ্য। যেমন ঃ S. K. Chatterji while advocating the Indian origin of Burmese language has also pointed out that the oldest Pali and other in scription in Burma date back to 5th-6th centuries on the basis of literacy evidence it can be will assumed that the Raman inhabitant of South and Central Burma who are racially and linguistically kinsman of Austrics of India, received by land, sea routes Indian culture and Indian speech even before the clritian era. (P. No. 407).

সন্দেহ নেই যে রূপিনীরার আদি গোত্র হচ্ছে, ভারতের পৌরাণিক ভাষার দ্বারা প্রভাবিত অষ্ট্রীক অর্থাৎ অষ্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা ভাষী। উত্তরকালে তিব্বতু-বর্মা-ভুক্ত জাতির সাথে অন্তর্ভুক্তির ফলে বুড়ু পরিবারের ভাষা, বরক ভাষাকে আত্মস্থ করে নেয়, এবং পরিশেষে তাই রূপিনীদের আত্মভাষা রূপে প্রকটিত হয়। অষ্ট্রীক ভাষার শাখা প্রশাখার লতিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

↓ ↓ ↓

আর্য ভাষা | আর্য ভারতীয় ভাষা | তিব্বতী চীন ভাষা

↓

অষ্ট্রীক ভাষা

↓

↓ ↓

অষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা | অষ্ট্রোনেশিয়া ভাষা

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | ↓

মুণ্ডা মনখামার খাসী পাইলাং রিয়াং উা শবর নিকবর | মধ্য এশিয়ার ভাষা

↓

অস্ট্রো তিব্বত-বর্মাভুক্ত
এবং বুড়ু পরিবারের ভাষা

↓

রূপিনী

রূপিনীদের লোক সংস্কৃতি

সামজিক ও ধর্মীয় রীতি নীতি (Cult & custom) পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিবদ্ধতার নিদর্শন প্রাককালে থাকলেও লোক সংস্কৃতির নিদর্শন ও আদি জাতি পায়াংদের বিশেষ অবদান নেই বললেও চলে । যোগের এবম্বিধে তখনকার এইসব আমোদ স্ফূর্তি থাকারও কথা নয় । কেননা এই সময় ধর্ম কর্ম নিয়েই মানুষ বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকত । মধুর সুরে নাচগান এর পরিবর্তে বেরসিক মন্ত্র ধ্বনি ছাড়া আর বেশী আশা করা অবান্তর । কারন তখন ছিলেন মন্ত্র তন্ত্রের যুগ । এইসব সংস্কৃতি অনুষ্ঠান কেবল রাজরাজাদের মহলেই রাজাকে আমোদ দানের জন্য বেজে উঠত নুপুরের ঝঙ্কার তা সাধারণ.মানুষের নাগালের বাইরে ছিল । কিন্তু পূজা অনুষ্ঠানের সামগ্রী শঙ্খ, শিঙ্গা (মুড়ি) ঢাক-ডোল ছিল বটে তা অবসর বিনোদনের ব্যবহারের জন্য নয় । প্রসঙ্গতঃ হিন্দু ধর্মে শাস্ত্রিয়নুবর্তী নাচ গান সৃষ্টি হয়েছে, আর্যত্তর যুগ থেকে এবং প্রাক আর্য যুগে নৃত্য ও সুর সঙ্গীত ছিল কিনা এই সম্পর্কে সুনিাচিত রূপে

হলফ করে বলা মুশকিল। তবে আর্য প্রাকযুগেই শিবের আর্বিভাব ভারতের মাঁটিতে ছিলেন, এই কথাটি ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করে থাকেন। এই নিষাদ বা অষ্ট্রীকদের দেবতা "পশুপতী" আবার কিরাতদের দেবতা 'মহাদেব' বলে একই দেবতার দুটি নামে খ্যাত ছিলেন এবং পশুপতী হচ্ছে পশুরক্ষক দেবতা। আবার মহাদেব হচ্ছে অবিচল ধ্যান মগ্ন শিবের কল্পনা ছাড়া আর কিছ নয়। তাহলে, কখন থেকে শিব নাট্যকারের উপাধি ধারণ করে ভারতের বুকে আর্বিভূত হল তা বির্তকের বিষয়। আদিকালে শিব যদি গোটা কিরাত জাতিদের কাছে, নট বা নাট্যকারের প্রতীক বলে, আরও একটি প্রতিভাধারী রূপে চিহ্নিত হতেন, তাহলে শৈব্য তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিবের তাণ্ডব নৃত্যের দোলনও কিরাতদের কাছে সংক্রামিত হয়ে উঠত। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রনুবর্তী নাচ-গান সৃষ্টি হয় আর্যত্তর যুগ থেকে; বোধহয় তখন থেকেই শিব কে আর্যরা নট বা নাট্যকার বলে অভিহিত করে থাকেন এবং শিবের নৃত্য তখন থেকে আর্যদের মতোই চর্চার সূচনা ঘটে। যদি শাস্ত্রীয় নৃত্য সুরসঙ্গীত প্রাককাল থেকেই কিরাতদের মাঝে প্রভাব ফেলত, তাহলে অগ্রজ হিন্দু জাতিদের মত উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যেও ফুটে উঠত এক উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং ঐক্য সংস্কৃতি। একই ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত মহান একাত্মবোধ। মোট কথা অজ্ঞাতেই হোক আর সজ্ঞাতেই হোক প্রাককালে কোন অনার্য জাতি যদি আর্যদের প্রচারিত ধর্ম, আচার, অনুষ্ঠানকে বরণ করে নিয়ে থাকে, তাহলে এইসব গোষ্ঠীরাই হচ্ছে বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির অধিকারী এবং পূর্ব্বাঞ্চলের আদিবাসী আসামীস, মণিপুরী হচ্ছে এদের মূর্ত্ত প্রতীক।

রূপিনীদের আদি গোষ্ঠীরা শৈব বা শাক্ত ধর্মকে প্রাককালে আত্মস্থ করে নিলেও আর্যদের নবধর্মের সঙ্গে বিজড়িত শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্য চর্চার প্রভাব মোটেও পায়নি। ফলে তাদের মধ্যে উদ্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নির্গত একটানা লোকগীত এবং বন্য পশু পাখির গতিবিধির বিদ্রুপ ছলে উৎপত্তি হয় "দঙ্গী" নাচ। এইসব গীত ও নৃত্য শৈব ধর্ম অনুশীলনের সঙ্গে কোন সংস্রব ছিল না। এই প্রকার গানের উপাদান বিশেষ কিছু নয়। এইগুলি একটি লোকগাঁথা বাক্য বয়ন, মনোরম ব্যষ্টিত পরিবেশে বসে স্বতস্ফূর্ত ভাবে মেতে উৎত যুবক যুবতীর অন্তরের ভাষার সুরধ্বনি। আবার কোন ক্ষেত্রে কাজের তালে, তালে, নৃত্য সংগীতে মুখরিত করে তুলে তখনকার যুগে রূপিনীদের পার্ব্বত্য পল্লীতে। বিশেষ করে জুম কৃষি এবং সামাজিক জীবন যাত্রাকে কেন্দ্র করেই, তখনকার নর-নারীর জীবনের অন্তর ভাষা ফুটে তুলে; এইসব সুর, সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে। সুর ও ধ্বনি বিতানে কোন

ঘোরপ্যাঁচ জটিলতা নেই। আছে কেবল, পদ বয়নের বাহুল্যতা তাদের লোকগীতে পরিলক্ষিত হয়। এর পাশাপাশি অবান্তর উপমা ও অলঙ্কার সন্নিবিষ্টে আরও মাধুর্য করে, লোক মোহিত সৃষ্টি করে। এই সব উপমা ও অলঙ্কার তাহাদের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারনত এই সব জন প্রবাদে গাথা লোকগীতি মন্থর রাগিনীতে এক সুরে গাথা চীনা গীত ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে স্নিগ্ধতায় শ্রুতি মধুরতাকে আরও উৎকর্ষ করে তুলে এবং ছন্দের পয়ারে তা আরও সামঞ্জস্য লাভ হয়। তাই রূপিনীদের লোক গাঁথায় সন্ধগীত মালার উপাদান নিগূঢ় সত্যতাকে প্রমান কল্লে, অসীম উপমার উপস্থাপনে, প্রবল ভাবে অন্তরস্পর্শী হয়ে থাকে। এই গীত বৈশিষ্ট অনুসারে ৫ ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ঃ (১) জানীয়নি (২) ব্রজুমা (৩) ফাইলেরঃ (৪) য়াকুঙ কদিমা (৫) মায়া গাত্তী। নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া হল।

জানীয়নি ঃ সাধারনত জানীয় লোকগীত সর্বজন স্বীকৃত ছিল এবং এককালে এই গীত রূপিনী সমাজে বিশেষ প্রসার ঘটে। এই গীতে প্রয়োজনীয় অলংকার এবং পদের চরনে মিত্রক্ষর ছন্দ ব্যবহার বেশি দেখা যায়। তাই এই গীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করা যায় এবং এই গীতের অন্তর্গত একাধিক নৃত্য প্রচলিত ছিল, যেমন ঃ-

বলং তাউ খেরলাই য়াসাসে বাতরী
চাঁওয়াই য়াককীনাই বাতরী
মায়নি থঙকার বার' থাঙকারী
চুর কীতীয় কিতিং য়া-ন

মর্মার্থ ঃ বনের "খের" পাখী এক কদম লাফালে আমরা মানুষ দুই কদম বাড়াব। রার পালী বিশিষ্ট মায়ের ঘরে লাটিমের মত ঘুরব।

এই লোক গীতের তালে তালে হাত তালি ধ্বনি মিলিয়ে সেকালের যুবক যুবতীরা অর্ধআসন অবস্থায় নৃত্য পরিবেশন করত। সাধারনত এই নৃত্যে অর্ধআসনের মধ্যেই পায়ে ভর করে কদম কদমে গানের তাল মিলিয়ে এবং মেয়ে পুরুষ সমান তালে মোর ঘুরে নাচ সম্পন্ন হয়।

কোন আচার অনুষ্ঠানে উক্ত পরিবারের কর্তাকে প্রমোদ আসরে অংশ গ্রহনের

জন্য অন্যান্ন অতিথীরা আমন্ত্রন করে গানের মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান করা হত এবং কৌতুক রসের অবতারনা করত, যেমন ঃ

দুদুকামরাই নি খামফালাই কিতিং
আচক ফাইদি বা নংফাঙ ॥
মায়াম রেঙক্রাং তাউথু বীক্রাং
কাছিম বেক্রাং ॥
আইচু তকচীলা কাছিক লাঙঃপাইখা
বাচা লিয়া দীয় নংফাঙ ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ-

"দুদুকামরীয়" কাষ্ঠের গোল পীড়িতে
এসে বসুন গৃহকর্তা ।
গোলার কিনারে পাখা মেলা ডুবি
আসে পাশে কচ্ছপের খুলি ।
ভোরের মুড়গের ডাঁক শেষ প্রায়
এখনো উঠেনি গৃহকর্তা ।

এই লোক গীতের সঙ্গে সাইরেন্দা, বড় আকারের ঢাঁক (খলমা) প্রভৃতি যন্ত্র সংগীত ব্যবহার হয়ে থাকে । অনেক সময় এই গানের তালে তালে নৃত্যও পরিবেশন করা হয় ।

ব্রজুমা ঃ- এই লোকগীতের ধারাটি হিন্দু ধর্ম অবলম্বনের পরেই উদ্ভব হয়েছে, কেননা এই সব গীতে বৈরাগ্য প্রেমেরই একটি অনুকরন বলে ধারনা করা যেতে পারে যেমন ঃ-

আঙ-ব তীয়া-ন তিনত্রা
নীঙ বা খঞ্জরী তীয়দি
ফাইদি বিদেশ বেরাই রাঙয়ান'
বীরাইছা বরক তিনত্রা তীয়াই
চীলাছা বরক খঞ্জরী তীয়াই
আর মীচুমসা আর ফুটাসা
তাংজাই সাল কাতাউ না দাই

উানচীয় নগ কীচাম
খুঙসা মানীয় ফান
আ-র হরসানি বাসা
কুমার তীক্ কীচাম
থাইছা মানীয় ফান
আ-র সালসানি বাদ্রা ॥

মর্মার্থ ঃ ওগো সুন্দরী আমি তিনতারা হাতে নেব তুমি খঞ্জরী ধরে চল আমরা বিদেশে যাই। ভিক্ষার ঝুলি সঙ্গে নিয়ে, জীবন ভরা না খেতেই যাই। পরিত্যক্ত বাঙ্গালির পাড়াতে রাত্রির স্থান হলে, এক দিবসের সংস্থান হয়ে যায়, যদি পাই কুমারের পরিত্যক্ত হাঁড়িকড়ি।

এই লোকগীতির সঙ্গে দুতারা, সারেন্ধা, খঞ্জরী যন্ত্র সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এই গানের তাল নৃত্যের অনুকুল নয়, কেননা এই গীত মন্থর রাগীনিতে টান ধরে গাইতে হয়।

ফাইলে-র ঃ ফাইলে র রুপিনী লোক সাহিত্যের অন্যতম এবং প্রাচীনতম লোকগীত। এই সব লোকগীত গুলির পদগুলি যেমন অবান্তর উপমা অথচ উপভোগ্য, শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে স্থুল এবং সত্যের প্রবলতাকে আরও উৎকর্ষ করে, পদের উপাদানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আবার বিস্তর অলংকার প্রয়োগে ছন্দের পদকে আরও ঝঙ্কারিত করে, সেকালের নরনারীর হৃদয় কে নিবিড় মর্মস্পর্শী করে তুলত। ভাষার উচ্ছ্বাসকে প্রবল করে তুলার জন্য ছন্দের স্বাধীন ব্যবহার করে নিতে পরিলক্ষিত হয়। তাতে তৎকালীন সময়ের যুবক যুবতীদের অন্তরের ভাষা এবং বিরহের সুরধ্বনি, অবান্তর কল্পনা বিলাসীতে সহসা এই সুরছন্দে প্রানঞ্জলতার সহিত প্রকট লাভ হয়ে থাকে। অন্যদিকে কোন দু:খের কাহিনী উপযুক্ত উপমার প্রয়োগের মাধ্যমে করুন সুর ও ছন্দে প্রকটিত হয় এই সব লোকগীতের মাধমে।

১) যেমন ঃ- উাসক কচ'-ন তানীয়লাই মান,
পামীতীয় সে সিকাঙ কীলাইঅ।
কীপালনি কাউন' সানলাই মান',
মীকতীয়সে সিকাঙ কীলাইঅ।
বলচু তুলা-ন কীবীনাঁই নুগঅ
খাপাঙ কীবীনমীন নুগজা ॥

মর্মার্থ ঃ আগাভাঙ্গা বাঁশকে যদি কাঁটতে যাও, তাহলে শিশির বিন্দু আগে ঝড়বে। তদরুপ অন্তর ভরা দু:খের কথা বলতে গেলে, চোঁখের জল আগে ভাসে। শিমূল তুলা উড়তে দেখলেও, মনের উদাসিনতা উড়তে কোনদিন দেখিনি।

আবার এই "ফাইলে র" এর গীতমালার একটি অংশ পারিপার্শ্বিক মনোরম প্রকৃতিতে বসে যুবক যুবতীর বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে পদ গুলির শ্রুতিমধুর সুরছন্দের গীতি উদ্ভব হয়েছে।

২) যেমন ঃ- স্ত্রীঃ কানচৌলাই বাসে তাকয়ানলাই মান,
চুমনাই সে বেথা কীরাই।
পুঃ নঙখাই সিখীলা উানলাই মান,
' হরনাই সে বেথা কীরাই।
পুঃ লাফাই দি নংখাই সিখীলা।
স্ত্রীঃ কানচৌলাই বাসে লাফাই দি ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ- স্ত্রীঃ বাসে কামিজ বয়ন করতে পারলেও
চোখে পড়েনি মানান সই পাত্র।
পুঃ নংখাই সিখীলা বয়নে বিশেষ দক্ষতা আমার
কিন্তু চাই ঝুলনের মানান সই পাত্রী।
পুঃ এসে নিয়ে যাও নংখাই সিখীলা।
স্ত্রীঃ ওগো নিয়ে যান বাসে কামিজ।

বিশেষ করে ওই প্রকার লোকগীতির সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গীত ব্যবহার করা হয় না, এই সুর ছন্দের গীত মন্থর গতিতে পরিবেশন করতে হয় বলে পদ চয়নে পরিস্ফুট ভাব, শ্রুতাদের অন্তরগ্রাহী হয়ে থাকে।

এই (ফাইলে র ঃ) গীতিমালার আরও একটি অংশে দেখতে পাওয়া যায় যে সেকালের নরনারীর প্রনয় বিধানকে জটিল উপমার সহিত তুলনা করে যুবক যুবতীর ভালবাসা ও হৃদয় বিনিময় এক নিবিড় সত্যের উৎকর্ষ হয়ে উঠে। নিম্নে পদটি প্রানিধান যোগ্য ঃ-

৩) যেমন ঃ- কীনীয় খা বাকসা তঙখাইলাই,
লাফাঙ তানীয়সে হর' মুরমান'।
কীনীয় খা বাকসা তঙখাইলাই,

গীরজীঙ মুরীয়সে দা মুরমরন' ।

মর্মার্থ ঃ যদি দুই নরনারীর হৃদয় এক শ্বাসে বাঁধে, কলাগাছ কেটে আগুন ধরানো কোন অসাধ্য কাজ নয় । যদি দুই প্রেমী হৃদয় এক হাতে বাঁধে তাহলে গর্জন গাছ হেলে দা শান দেওয়া কোন অসাধ্য নয় ।

"ফাইলে র" অন্য আর একটি অংশে বিয়ে বর বা কন্যা হিসাবে পরিবার পরিজনের বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পূর্বে প্রাঞ্জল ভাষায় যে একটি বিদায়ী সুরছন্দ লাভ হয়েছে, তার পাশাপাশি পরিবারের বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের আশীর্বাদ, এই সব লোকগীতিতে পরিস্ফুট ভাবে প্রকটিত ঘটে, তা নিম্নে গীতের শির্ষক প্রানিধান যোগ্য ।

৪) যেমন ঃ- সাল' থাঙখাইব বুই নুগরীকয়ান'
হর' থাঙখাইব' সীয় সীঙরীক য়া-ন'
হরনি জরা বাই সালনি জরা
বিদায়ী রীসিদি চীন' ।

ব্যখ্যা (আশীর্বাদ) ঃ- হাফুং মাই কীরীয়অ তাঙগীর চাখাইলাই
হাফুং মাই কীনাঙ আঁঙথুঙ ।
তৈয়বুক আ কীরীথ তীয় সংখাইলাই
তৈয়বুক আ কীনীঙ আঁঙথুঙ ।

মর্মার্থ ঃ দিবালোকে গমনে লোকে চেনে ফেলে, আবার রাত্রিতেও কুকুরের ডাক, দিনে নয় আবার রাত্রিও নয় এমন মূহুর্তে আমাকে বিদায় দিন । আশীর্বাদ - অনুর্বর পাহারে চাষ আবাদ করলে ফসল প্রসু হবে, মাছহীন ডোবায় যদি জল হিচে, সেখানে মাছ ভরা হবে ।

এই সব লোকগীতের তালে তালে সুমধুর ভাবে চংপ্রেং, সারেন্দা, সুমীয় (বাঁশী) বেঁজে উঠে এক করুন সুর । এই সন্মিলিত সুরঝঙ্কারে বিরহের বেদনাকে আরও প্রবল করে তুলত ।

মায়াগাথী ঃ ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম ভাগে, রূপিনীরা যখন মায়ানি হালুঙ্গে উপনিবেশ গ্রহন করে তখন এই লোকগীত উদ্ভব হয় । রূপিনীরা হঠাৎ নুতন পরিবেশ

এবং নুতন পারিপার্শিক লাভ করে, মেতে উঠে এক নুতন সুরছন্দের ঝঙ্কারে। এই সব গানের উপাদান বিশেষ করে, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্গে সংশ্রব ছিল। সাধারনত এই প্রকার লোকগীতিতে ছন্দ পুনরাবৃত্তির পর, পর গানের পদ পরিবর্তন হয়ে থাকে। অনেক সময় উপমাই এই প্রকার সুরছন্দে গুরুত্বপূর্ন হতে দেখা যায়। "মায়াগাত্তীর্থী" লোকগীতির অংশ নিম্নে দেওয়া হল।

যেমন ঃ- হাবা সীকাঙান খলখ্রাই বারদক
থাঙগীয় খর্লাইদি সালদক।
থাঙগীয় খর্লাইমনি সালদকন' কার্রাই
থাঙগীয় লামীয়দি সালদক।
থাঙগীয় লামীয়মনি সালদকন' কার্রাই
থাঙগীয় ফেরেৎদি সালদক।
থাঙগীয় ফেরেৎমীন সালদকন' কার্রাই
থাঙগীয় কায়াদি সালদক।
থাঙগীয় কায়াইমনি সালদকন' কার্রাই
থাঙগীয় রীয়াইদি সালদক।
থাঙগীয় রীয়াইমনি সালদকন' কার্রাই
থাঙগীয় সীঙয়াইদি সালদক।
গীরজীঙ বেসকেত রাঁউইব' তাকখা
চসে চলিয়া ইছা।
হাফং জাকাথীন রাউইব' তাকখা
চসে চলিয়া ইছা
কান্দা লাথানি বখঙ রাচাকয়াই
ফার্লাই নাঙলিয়া ইছা।

(লোক প্রচলিত)

মর্মার্থ ঃ প্রথম চাষের কয়েকটি কার্পসে তুলা ফুটেছে, ৬ দিনের মধ্যেই ইহা তুলে নিতে হবে। তারপর ঐ তুলাকে একের পর এক শুকিয়ে চরখিতে পেষন করে ঝেড়ে নিষ্কাষন করতে হয়। তারপর ঐ তুলাকে সেদ্ধ করে, তা থেকে সুতা উৎপন্ন করে বয়নের জন্য তাঁতে সাজাতে হয়।

গর্জন কাঠের "বেসকেত" দিয়ে এবং পাহাড়ে পায়ে ভর রেখে টানা ধরেছি

তথাপি ই'ছা বয়ন অসম্পুর্ন রয়ে যায়। প্যার বাচাতে গিয়ে কেটে ফেলে কিনার; তাতে বিক্রয়ের মূল্য কমে যায় ঐ ই'ছা।

য়াকীঙকদিমা ঃ এই নৃত্য গীতি খুব সম্ভবত মায়াগাথী সমসাময়ীক উদ্ভব হয়। যখন রূপিনী সমাজে কামছিকাউ বলে, রাজার প্রতিবিম্ব এক সর্দারের শাসন প্রবর্তন হয় তখন থেকেই এই নৃত্যগীতের সূচনা হয়। প্রাককালে কামছিকাউ এর আব্দারে মেয়েকে কেন্দ্র করেই এই নৃত্যটির প্রথম সূচনা ঘটে বলে অনেকে অভিমত করে থাকে এবং মেয়েটির নাম অনুসারেই এই য়াকীঙকদিমা উদ্ভব হয় বলে জানা যায়।

একদিকে বর্ষার বিদায়, অন্যদিকে শরৎকালের স্বাগত, এই মাঝামাঝি সময়ে সাধারনত জুম চাষীরা, জুমের ফসল কেটে ঘরে ঘরে ঝাত করা হয়। তখন অবসর বিনোদনে জোৎস্নায় প্রতিটি ঘরের আঙ্গিনায় ধান মাড়াই এর কাজ সুরু করে দিত। একদিকে শরৎ এর অপূর্ব জোৎস্নার সন্ধ্যা, অন্যদিকে অনেক দিনের কাম্য ফসল প্রাপ্তের খুশী তখন মেতে উঠে অলোকীক পরিবেশে অলোকীক শব্দ ধ্বনি, এবং এই গীতি ছন্দের তালে তালে ধান মাড়া একটি নৃত্যের বিকল্প রূপ নেয়, তাহাই য়াকীঙকদিমা লোকগীত।

যেমন ঃ- কামছিকাউনি বীছাচীক য়াকুঙকদিমা
ফাইদি মাই নাকয়ান, ফাইদি মাই নাকয়ান
বীরকী সরয় খাচুর বাই
তাউচীলা য়াচিং সুরাঙ বাই
ফাইদি মাই নাগয়ান, ফাইদি মাই নাগয়ান
গুনথুর বীবার খাচুর বাই
উাখুমতয়া খুঞ্জুর বাই
ফাইদি মাই নাগয়ান ফাইদি মাই নাগয়ান
কামছিকাউনি মায়াম নগঅ
চীবু কাঙমাই তঙরে
ফাইদি তগীয়ান, ফাইদি তগীয়ান

(লোক প্রচলিত)

মর্মার্থ ঃ য়াকুঙ কদিমা এসো ধান মাঁড়াতে। ঘনঘটা কালো খোঁপাতে গুজানো সুরাঙ এবং ফুল, কানে তয়ার দোল সেজে গুজে এসো ধান মাড়াতে। কামছিকাউ এর খালি গোলাতে শর্প রয়েছে চল গিয়ে মারি।

নবান্ন ভোজনের দিন বা অনুষ্ঠানের দিন জুমের কাজের অবসর বিনোদনের সময় কিশোর কিশোরীর মধ্যে এই নৃত্যের লোক প্রদর্শন হয়ে থাকে। বিশেষ করে এই নৃত্যের সঙ্গে চংপ্রেং, সারেন্দা, সীমুই, তুঙতেমা (বাঁশের ডোল), খানমা (বড় আকারের ঢাক) ইত্যাদি আদি যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে এই নৃত্য পরিবেশন হয়ে থাকে।

বিশেষ করে আদিকালে সমগ্র জুমচাষী আদিবাসীদের মধ্যে সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়। তাহার একমাত্র কারন হচ্ছে সেকালে জুম কৃর্ষিই হচ্ছে সার্বিক উপজীব্য। ফলত ইহাকে কেন্দ্র করেই উদ্ভব হয় সমাজের নানা কৃষ্টি সাধন। তাই কে কাহার সংস্কৃতিকে রপ্ত করেছে তা খুবই বিতর্কের বিষয়। এই বিষয়ে "কমলিনী ঘোস" যথার্থই বলেছেন তার একটি বইয়ের মাধ্যমে (Tribal insurrection in Tripura) Page No. 9.

Most of their songs, dance and customs are inter linked with the Practice of jhum cultivation. Inspite of the heterogenous nature of the tribal population there prevaits a sense of unity among them because all of them practice jhum as their means of bivelihood. The following song of the Halam community will show that all of them identified their roots as one and unified.

Nung boroneing angba boroneing
Hobey putra thansa
Khulmu lilini dugma bai dugsa
Japhasg moramang thansa
A thuk karoi bai tal bai togoise
Nokha Machangoi thango
Tipra Khami tuisa gormun
gormun Ni thangsa.
(where do gon belong ? where do I belong ?
Basically we are one

like the dugma and dugsa Creapers
we have the same roots.
The stars and the moon
make the sky beautiful
All the rivers of Tripura
Flow to the same place.)

যদিও কমলিনী ঘোস এই চিরসত্য লোকছন্দটিকে হালামের বলে আখ্যায়ীত করেছেন বটে, প্রকৃত পক্ষে ইহা রূপিনীদের "জানীয়নি" নামক লোক সাহিত্যের গীতিমালার একটি ছন্দাঙ্গ। আবার এই লোকছন্দটিকে প্রাককালে রূপিনীরা কোন গোষ্ঠী থেকে রপ্ত করেছে কে জানে ? এই ভাবে একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠী হতে সংস্কৃতি, ভাষা, আদান প্রদানের ফলে Tibbeto Burmese Group বড়ো পরিবারের ভাষায় সংমিশ্রন হয়ে উৎকৃষ্ট ও রুচিশীল সংস্কৃতির বিকাশে সুবিশাল মাধ্যম ভাষা বলে পরিগনিত হয়েছে। ত্রিপুরার ককবরক ভাষা ইহারই একটি অঙ্গ।

লোক প্রবাদ ছড়া এবং রূপকথা

প্রাককালে রূপিনীদের লোক প্রবাদ ছড়া এবং রূপকথা খুবই প্রসারিত এবং সর্ব্বাঙ্গীণ বিষয়ে পরিপূরক ছিল বটে। কিন্তু লিখিত রূপে সংরক্ষণের অভাবে উত্তরোত্তর অবসান ঘটে। বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের একের পর এক জীবন অস্তমিতের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরোত্তর কালের গর্ভে তলিয়ে যায়; এইসব লোকসাহিত্যের উপাদান। এদের মধ্যে যা কয়েকটি বেঁচে রয়েছে তাহাই এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এর কয়েকটি ছড়া নীচে দেওয়া হল; যেমন ঃ

ডীকলে ডাক রজঙ ওর';
রজঙলে বজঙ উলি চাঅ;
উলিলে উলি তাউ চাঅ;
তাউলে তাউ নীল কুবুলঅ;

নীললে নীল হর’কমর;
হরলে হর তীয় কমর’
তীয়লে তীয় মালা তীয়কুঅ
মালালে মালা সেঙ বাই তান’
সেঙলে সে কামার নর্গ;
কাম্যরলে কামর মীছা চাঅ ॥

(লোক প্রচলিত)

মমার্থ ঃ শূকর কোথায় ? বাঁশের মূল ধসে। বাঁশের মূল কোথাই ? উলিকিট দস্ত করছে ? উলি কোথায় ? পাখী খাচ্ছে ? পাখী কোথাই ? নীলে আটকাচ্ছে। নীল কোথায় ? আগুনে ওম হচ্ছে। আগুন কোথায় ? জলে নিভানো হচ্ছে। জল কোথায় ? মালা (চর্বি ভরা শূকর) স্নান করছে। মালা কোথায় ? তরোয়াল দ্বারা কাটা হচ্ছে। তরোয়াল কোথায় ? কামারের ঘরে। কামার কোথায় ? বাঘে খাচ্ছে।

এই লোক ছড়াকে গানের সুরে গীত গাওয়া হয় না। বাচ্চাদের ঘুম পাতার সময় আবার বাচ্চাদের খেলার ছলেই এইসব ছড়া সাধারনত ব্যবহৃত করতে দেখা যায়। এইসব ছড়াও আবার কোথাও বা কয়েকটি উপমা সহকারে জড়ানো প্রবাদ বাক্য রূপিনীরা ব্যবহৃত করে থাকে; যেমন ঃ ১। কাবমুন থাকঅাঁই ফান/সাঁরীকমা থাকয্যা (অর্থাৎ কান্না সারলেও চিত্তে প্রশমিত হয় না) ২। যেমন ঃ চানাই তাউ মিছিব/তকচাকনাই রচং (অর্থাৎ দোষ কেটে গেল একজন, শাস্তী পেল দ্বিতীয়জন ৩। যেমন ঃ সেপব’কৌর্লাই খাই/মায়ুং কতরছা বাঁউা দাঙ্গদার হাঁই/বসে মাখুন্বাই দুকঅ কীচানাই (অর্থাৎ ফাঁসে পড়লে হাতীই অনেক সময় সজারুর ফাঁদে আটকাতে পারে ৪। “ই”ত্রাক নাইহনীয় য়াকুঙ মীসুরদি” (অর্থাৎ নিজের সম্বল দিকে লক্ষ রেখে যে কোন কাজ ধরবেন ৫। “উাতীয়ন নাইছিংঅাঁই ই’কীনাই সু’য়া” (অর্থাৎ কোন অনির্দিষ্টের সম্ভাব্যর নিজের কর্তব্য সঁপিয়ে দেওয়া) । রূপিনীদের লোক সাহিত্যে এইসব জন প্রবাদ বাক্য মূল্য বোধ অপরিসীম। প্রাককালের ঐ প্রবাদ অলঙ্কার শুধু সাহিত্যের শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেই মূল্যবোধ তা নয়, তার থেকে সেকালের জীবন যাত্রার সম্পর্কেও কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। আজকাল অবশ্য অগ্রজ ভাষাদের লেনদেনের সাথে সাথে এদের ভাষা অনুবাদে রূপিনী ভাষায় প্রবাদ অলঙ্কার সৃষ্টি করে। যেমন ঃ “চুবু ব’ থীয়তীয় লাথা’ব বাইয্যা তাঁই” অর্থাৎ সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না। এইভাবে আরও অনেক কিছু অনুবাদ করে সৃষ্টি হয়েছে

বটে, কিন্তু প্রাককাল থেকে ব্যবহৃত প্রবাদ অলঙ্কারের ন্যায় উন্নত প্রকট লাভ হতে পারে না।

রূপিনীদের রূপকথা

লোক প্রচলিত হিসাবে রূপিনীদের যে রূপকথা আছে, তা প্রকৃত ঘটনা না লোক গাঁথা, তা নিয়ে বির্তকের বিষয়। আবার এই রূপকথার ভিত্তিতে যে সকল, ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, তা আবার মূল-ইতিহাস নিষ্কাষন করেও পাওয়া যায় যে, বর্ণিত রূপ কথার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে একাত্বতা দেখা যায়। এইক্ষেত্রে এই রূপকথাকে উপকথা বললেও কোন ভুল হবে না। আদিকাল থেকে আরম্ভ করে, যুগ সন্ধিকাল পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে পূর্ব্বাঞ্চলে আদিবাসীদের এক নজরে দেখা যায়। কঠিন জীবন নির্ব্বাহের মাধ্যমে কৃষি কাজকে উপজীব্য করে তুলে। এই কায়িক পরিশ্রমে খেটে খাওয়া জীবনকে উৎসর্গ করার মত সত্য কথা, আর কোথাই পাবে ? এই সত্যের কর্মভূমিতে চড়ে নিজের জীবন কাহিনীকে মিথ্যা অলঙ্কারে সাজাবে তা কিছুতেই হতে পারে না। হয়তো, এতটুকু হতে পারে যে, লোকের মুখে মুখে পরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবান্তর লাভ হয়েছে, তা বিচিত্রের কিছু নয়। কেননা, যে কোন অলিখিত লোক ইতিহাসে, তা সচরাচর ঘটেই থাকে। আবার অনেক সময় প্রকৃত ইতিহাসের ঘটনাই কিছুটা অবান্তর উপমার সংযোজিত হয়ে রূপকথার আকার ধারন করে থাকে। আবার কোন কোন উপকথায় গাছ-গাছড়া, পশু-পাখি-বাক-শক্তিতে আধার হয়ে আগাগোড়া উপাদানকে রূপকথার মূল ঘুরে যায়। এর কারণ হচ্ছে, বুড়ুদের ভাষা তাদের সংস্কৃতি, এমন ভাবে প্রসারিত হয় যে অজ্ঞাত গোষ্ঠীদের কাছে তা গিয়ে পৌঁছে এবং এলোমেলোভাবে এইসব সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে। G. P. Singh যর্থার্থই বলেছেন যে The Bodo form of speech spoken by the Kirata Bodos popularly amongst both the aryans and non Aryans of North Eastern and Eastern India particularly Assam and Bengal. The movement of the Bodos over the wide areas covering the whole of Brahmaputra Valley, North-Bengal, East-Bengal and the hill areas of North-East rendered it possible for the extension of their language, which further become very rich after the collection of the folk poetry and tales (P.No.

307.) বস্তুতঃ রাজরাজাদের প্রভাবেই ভাষা, সংস্কৃতি বিকাশ খুব জোড়দার হয়ে উঠতে পারে। তাহলে অনুধাবন করা যায় যে, প্রাককালে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে শাসক রাজরাজারা বুড়ু বা (তিব্বতো বর্ম্মন) ভাষার পৃষ্ঠপোষক রাজারাই শাসন করে গেছেন। পরিপূরক রূপে বুড়ু ভাষাকে আত্মস্থকারী পরজাতির মধ্যে রূপিনীরা অভিন্ন ছিল। নীচে তাদের রূপকথা, উপকথা সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হল ঃ

১। যেমন ঃ

তাউচিং

হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে রূপিনী গোষ্ঠীদের একটি বসতি তীয়মানী হালুং নামে এক স্থানে গড়ে উঠে। সেই বসতিতে এক প্রয়াত বিধবার দুই সন্তান, সকলের তাচ্ছিল্য চোখে বসবাস করত। দৈবক্রমে উক্ত বসতিতে কলেরা (কীতুং কীলাইমুম) মহামারী ফেলে বহু মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নিলে, তথাপি নাবালক দুই ভাই বেঁচে যায়। যা বসতির অন্যান্য লোকের কাছে কাম্য ছিল না। উক্ত বসতিতে, বসবাসের অনুকূলতা আছে কিনা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সামাজিক সভা আহবান হলে ১০টি শূকর কেটে সমারোহে নৈশ ভোজনের জন্য আয়োজন করা হয়। এই ভোজনেই এই বসতির জন্য শেষ ভোজন বলে অবাধে পাড়ার সকলেই অন্ন ভোজনে অংশ নেয়। শুধু প্রয়াত বিধবার সন্তান দুই ভাইকে শূকরের নাড়ি ভুড়ি নিষ্কাশন করে দেয়ার জন্য দূরে নদীর দিকে পাঠানো হয়। নৈশ ভোজন শেষ হওয়া মাত্রই ঐ বসতি পরিত্যাগ করে একযোগে সবাই তলপী তলপা সহ নুতন বসতি অন্বেষণের জন্য রওনা হয়।

অন্যদিকে অগত্যা দুই ভাই লোকের অর্পিত কার্য্য সম্পন্ন করে বসতিতে ফিরতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। তারা নির্জন বসতিতে এসে প্রথমে হতবম্ব হয়ে পরে; সন্ধ্যার ঘন ঘটায় নিঃস্তব্ধ পরিত্যক্ত বসতিটি খা, খা করছিল। সেখানেই শুধু মাত্র দুইটি প্রাণী - তাই ঐ দুই ভায়ের ক্রন্দন ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তারা নিজেকে সামলিয়ে ত্বরান্বিতে, এই অন্ধকারের মধ্যে রওনা দেয়, এক অজ্ঞাত নির্জন অরণ্যের দিকে এবং কামছিকাউ বলে ডাকে ডাকে ব্যর্থ অনুসরণ করে; কিন্তু কে শোনে তাদের ডাক। এইভাবে দুইদিন দুই রাত অনাহারে অনিদ্রায় সহজাত প্রতিবেশীদের অন্বেষণে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে একটি গাছে টক টকে লাল পাকা ফলের দিকে জেষ্ঠ্য ভ্রাতা দৃষ্টি ক্ষেপ করলে উক্ত ফল পাবার উদ্দেশ্যে গাছে আরোহণ করেন। কয়েকটি ফল ছোট ভাই এর জন্য কাপড়ের আঁচলে বেঁধে আর একটি

ফল স্বীয় মুখে পুড়তেই তার গলায় আটকে পড়েন । কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর দূরবস্থা দেখে বার বার জিজ্ঞেস করেন 'কি হল দাদা ? কিন্তু অগত্যা জেষ্ঠ ভ্রাতার মুখে আর কোন জবাব নির্গত হয়নি সেদিন । তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অভিশপ্ত গাছ থেকে অবতরণের জন্য বার বার অনুরোধ করেন । এবং তাঁর দুই বাহু জুড়ে ধীরে ধীরে পালক গজে উঠে ডানার আকারে । অতঃপর নিরূপায় হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তাউচিংরূপ ধারণকারী পাখিটিকে অনুসরণ করতে করতে একটি রূপিনী বসতিতে পৌঁছতেই, পাখিটি তার কনিষ্ঠ ভাইয়ের থেকে বিদায় নিয়ে দিগন্তে বিলীন হয়ে যায় । এই অদ্ভুদ বিরহ বিচ্ছেদে হতাশগ্রস্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশ্রু ভরা চোখে তাকিয়ে দেখেন, সামনে একটি টংঘর এবং টংঘরের আঙিনায় লতায় জড়ানো কয়েকটি পাকা চিংড়া দেখে তিনি কিছুটা প্রসন্ন হলেন । তারপর পাকা চিংড়াটি খেয়ে উদরপুর্তি করে, তিনি ঐ টংঘরের উপর শোয়ে পড়েন । এদিকে এই টংঘরের মালিকানী এই বসতির সবচেয়ে গরীব এবং লোক অবহেলিত বিধবা নারী ছিলেন ।

তিনি জুমের কাজ সম্পন্ন করে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বীয় ভাটিতে ফিরতেই দেখেন তাঁর উত্থানের চিংড়া কে বা কাহারো আত্মসাৎ করে ফেলেছে; নিরুদ্দেশ ভর্ৎসনা করতে করতে তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করতেই দেখেন যে আগন্তুক একজন কিশোর শোয়ে আছেন । বিধবা নারী চিংড়া ভক্ষণের দোষারোপ করতেই, উক্ত আগুন্তুক কিশোর তাকে বারণ করে প্রথম তার দুঃখের কাহিনী শ্রবনের জন্য অনুরোধ জানান । তারপর আগুন্তুক কিশোরের কাছে করুনাভর বৃত্তান্ত শোনার পর বিধবা নারী করুনাভব হয় এবং অনাথা ভর্ৎসনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই ব্যকুল হয়ে পড়েন । এই বিধবা নারীর ভরন পোষনের জন্য কেউ নেই জেনে, আগুন্তুক কিশোর উক্ত বিধবা নারীর রক্ষনা বেক্ষনের জন্য পুত্রবৎ স্বীকার করতে অনুরোধ করতেই, সানন্দে বিধবা নারী স্বীকার করে নেন । তদবধি আগুন্তুক কিশের মাতা তুল্য বিধবা নারীর ভরণ-পোষন হাতে তুলে নিয়ে সুস্থ্য জীবন যাপনে ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পন করেন ।

অন্যদিকে ঐ বসতির মোড়ল কামছিকাউ প্রকারান্তে রাজা এর একমাত্র কন্যা দিন দিন যৌবন আবর্তনে, রূপে গুণে মুগ্ধময়ী বার্তা চারিদিকে হিড়িক পড়ে যায় । একদিন এই মেয়ের বিয়ের জন্য বসতির মধ্যে ঘোষনা করে দেন যে ঐ বসতির সবচেয়ে বলবান ব্যক্তির সঙ্গেই তার কন্যার বিয়ে হবে । এই বল পরীক্ষা হল, প্রথমটি কাঁচা মদে (চুয়াক) ভরা বিশাল মটকীটিকে একহাতে তুলে নিয়ে জল মিশানোর সক্ষমতার পরিক্ষা । আবার তার পাশাপাশি বাম হাতে তরোয়াল ধরে

যে ব্যক্তি চর্বি ভরা সুরাকে (মালা) দুখণ্ড করতে পারবে। এই বলবান যুবকের হাতেই কামছিকাউ তাঁর একমাত্র কন্যাকে তুলে দেবেন। তারপর বসতি যুবকরা অবাধে ঐ বর প্রতিদ্বন্ধিতে অংশ নিলে বসতির সমগ্র যুবক একের পর এক অসাধ্য বলে স্বীকার করে বিদায় নিতে হয়। কেবল বাদ পড়ে যায় বসতির সবচেয়ে নিকৃষ্ট, এবং গরীব বিধবা ঘরের পালক পুত্র, যিনি আগুন্তুক হিসাবে ঐ বসতিতে প্রথম এসেছিলেন। বহুজনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিশেষে ঐ যুবকটিকে কটুক্তি শুনে তিনি এই পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়। অন্যান্য যুবকদের কটুক্তি শুনে প্রথমতঃ তিনি এই পরীক্ষায় অংশ নিতে চায়নি। শেষে কামছিকাউ রাজার আদেশ অলঙ্ঘন না করে তিনি এই পরিক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিস্তর স্থান জুড়ে সামলে রাখা বিশাল মটকীটিকে এক নিমেষেই বাম হাতে তুলে নিয়ে উক্ত যুবকটি ঐ মটকীতে জল ঢেলে দেয়। তার পাশাপাশি বাঁধানো বিশাল শূকরটিকে বাম হাতে তরোয়াল তুলে এর কূপে দ্বিখণ্ড করে ফেলেন। তখন এই অলৌকিক শক্তি দেখে নির্বাক হয়ে সবাই চেয়ে থাকেন ঐ যুবকটির মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গা (মুড়ি) ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। সেই স্বয়ং বর সভাতে, বর এবং কন্যার পিতা কামছিকাউ অতিপ্রসন্ন, হয়ে উক্ত বিজিত যুবকের গলায় মালা প্রদানের জন্য কন্যাকে অনুমোদন দেয়। তখন থেকে রাজ জামাতা হিসাবে রাজ মহলে বসবাস করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা পালক মাতাকেও আজীবন তাদের সাথে রেখে দেন।

কুউাই পেঞ্চারাছা

(রূপকথা)

আজ থেকে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে, পর পর সাত সন্তান জন্ম হওয়ার পরে তার পিতা নাবালক শিশুদের রেখে আচানক মৃত্যু বরন করেন। এই দূর অবস্থাতে বিধবা মার হাতে লালন পালন হয়ে ঐ সাত ভ্রাতা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেন। তারা এত দুষ্টু ছিলেন যে, এই সাত ভাইয়ের তৎপরতায় বসতির লোক অতিষ্ট হয়ে উঠে এবং তাদের বিরোদ্ধে কিছু বলাও যায় না। যদি কেহ তাদের বিরোদ্ধে তিক্ততার অভিযোগ ধ্বনি তুলে তাহলে, এক যোগে সাত ভাইয়ের হাতে আক্রান্তের শিকার হতে হবে। এই সব আচরনে তাদের ‘মা’ খুবই মর্মাহত ছিলেন

- কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে সন্তানদের তিনি বারন করতেন না।

একদিন একযোগে সন্তানদের ভোজনের সময় এক ভিন্ন রন্ধনের ব্যঞ্জন পুত্রদের বিতরণ করেন, যা সপ্ত ভ্রাতারা কোন সময় খাইনি। এই তরকারি এমনভাবে তৈরী ছিল যে সমুদ্রের "আকীচাক" (মাছ) শুকানো আঁশ সহ সীমের পাতা মিলিয়ে চাঙগাল (চাখীয়) ব্যঞ্জন এবং সুস্বাদু ছিল বলে তারা অতি তৃপ্তি ভরে খেয়ে নেন। তারপর প্রসংশায় পঞ্চমুখ সপ্তভ্রাতারা মাতার নিকট থেকে জানতে চাইলেন যে এই ব্যঞ্জন প্রণালীতে অতিরিক্ত কি দিয়েছেন যা অন্যদিনের ব্যঞ্জনের অপেক্ষায় অধিক সুস্বাদু লাভ হয়। তখন মা তাদের জানান "আকীচাক" মাছের আঁশ মিলিয়ে রন্ধনের কথা বলতেই, তারা চিৎকার দিয়ে উঠেন এবং বলেন ইহার আঁশই যদি এত সুস্বাদু হয়, এর মাংস যেন আরও কত স্বাদ হবে ! তখন সপ্তভাই একযোগে সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, কোন প্রকারেই হোক ঐ মাছটি ধরে তারা খাবেন। মার নিকট হতে জানতে চাইলেন যে, উক্ত 'আকীচাক' মাছ কোথায় থাকে ? এতে মাতা সর্তক করে দিয়ে বলেন যে, উক্ত মাছটি রাক্ষস এবং সমুদ্র হল এর আসল বাসস্থান। তিনি আরও বলেন যে উক্ত মাছকে ধরার পূর্ব্বে সমুদ্রের তীরে বসবাসকারী তার পিতা অর্থাৎ পিতামহের সঙ্গে, আগে পরামর্শ নিতে হবে, অন্যথায় এই অভিযানে যাওয়া বিপদ সঙ্কুল।

তারপর, এই সাত ভাই পার্ব্বত্য পল্লী থেকে প্রায় কয়েক শত ক্রোশ দূরে দূরে অজ্ঞাত সমুদ্র তীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দূর্গম পার্ব্বত্য বনপথে যেতে, যেতে অরণ্যের কলাপাতা সংগ্রহকারী নারী এবং গাছ কেঁটে পাত্র নির্ম্মাণকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরপর সাক্ষাৎ হন। পথক্লেশে ব্যাকুল হয়ে, ঐ সপ্তভ্রাতা বনে কাজে লিপ্ত আগুন্তুক ব্যক্তিদের কাছে, পানীয় জল সংস্থানের জন্য অুনরোধ জানালে, সবাই তাদের পিপাসায় কাতর দেখে জল সংগ্রহের জন্য বনে অন্যত্র কোথাও চলে যেত। ঐ আগুন্তুক সাহায্যকারী ব্যক্তিদের অনুপস্থিতের সুযোগে অর্থাৎ তাদের জন্য জল আনায়নের উদ্দেশ্যে চলে গেলে, সপ্ত ভাইরা তাদের ফেলে যাওয়া দ্রব্যাদি কেঁটে ছিড়ে বিদ্ধস্ত ভাবে রেখে যেতেন এবং জল পান না করেই গন্তব্য স্থানের নিমিত্তে রওনা দিতেন। তাদের তৃষ্ণা বারণের জন্য জল সংগ্রহকারী ব্যক্তিরা এই অত্যাচারে ক্ষোভে তখন সপ্ত ভ্রাতার উদ্দেশ্যে অভিশাপমূলক ভর্ৎসন করত "যে উদ্দেশ্যেই তারা যাক সেই উদ্দেশ্যে সফল হবে না এবং এই অমানবিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাংস স্থলচর পশুপাখিরা ছোঁবে না। জলচর প্রাণীই তাদের ছিন্ন ভিন্ন করে খাবে। ওদের কুকর্ম লিপ্তের জন্য আরও পথে পথে অলক্ষে অভিসপ্তের

বোঝা চাঁপিয়ে পরিশেষে সমুদ্র তীরে পিতামহের বাড়ীতে পৌঁছেন। বৃদ্ধ পিতামহ তরুন সপ্তনাতীর মুখ দেখতেই, খুশীতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং সাদরে কলসী ভরা ঠাণ্ডা মদ্যবি অর্পন করলে এই কলসীর ভার ধারণের ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই হাত থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারী কলসটি ভেঙ্গে ছিটে সরে যায়। আবার পিতামহ স্নেহের পৌত্রদের নৈশ ভোজনের জন্য অবৃদ্ধি পালিত শূকর মারার উদ্দেশ্যে একটি লাঠি হাতে তুলে দিলে সাতভাই মিলেও, ঐ রোগা শূকরটি মারতে পারে নি। সেইদিন এইসব কাণ্ড দেখে দাদু সবিস্ময়ের সঙ্গে সাত ভাইদের সতর্ক করেছিলেন যে " এই শক্তি নিয়ে তোমরা আকীচাক এর সঙ্গে লড়তে এসেছ ! আকীচাক হচ্ছে মাছরূপি রাক্ষস একে ধরে নেওয়া মানব শক্তির সাধ্যঅতীত। বরং তোরা মায়ের কাছে ফিরে যাও বৎস। মা, তোদের চিন্তায় ব্যাকুল হচ্ছে মনে হয়।" ৮০ বছরের বৃদ্ধ পিতামহের বাক্য উড়িয়ে দিয়ে, শেষে তারা গন্তব্য স্থানের জন্য যাত্রার উদ্যোগ নেন।

সমুদ্র তীরে গিয়ে তারা প্রথমে 'আকীচাক' আবাস স্থান পর্যবেক্ষণ করলে, তাদের দৃষ্টিক্ষেপ হয় যে, বিশাল অঙ্গে একটি পৃষ্ঠ ভাগ দূর থেকে দেখা যায়। তখন সাত ভাই এক কন্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠেন যে "আকীচাক ডাঙ্গায় এসো তোকে মেরে তোমার মাংস দেশে নিয়ে যাবো" তারপর ধীরে ধীরে বিশাল গাত্রে আঁশ ভরা মাছ বালুচরে সপ্ত ভ্রাতার দিকে এগিয়ে আসে। খাটো তরোয়াল দ্বারা তখন উক্ত ভাইরা একযোগে কূপ এবং যথাসম্ভব দৈহিক প্রচেষ্টা উঠে পড়ে লেগে যান। কিন্তু উক্ত মাছ ঘায়েল হওয়াতো দূরেই রইল, তার গায়ে একটি ক্ষতও সৃষ্টি হয়নি। বরং আক্রমণকারীরা ঘায়েল হয়ে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়েন এবং এই দুর্ব্বলতার সুযোগেই মাছটি, সপ্ত ভাইদের, একের পর এক নিমেষেই ভক্ষণ করে ফেলে।

অন্যদিকে পার্ব্বত্য পল্লীতে সপ্ত ভ্রাতার মা অনুভব করতে পেরেছেন যে তার সন্তানের জীবন নাশ ঘটেছে। তিনি ক্রন্দনের মধ্যেও ঘর ঝেড়ে ছিলেন এবং সম্মুখে একটি ছোলা আস্তা সুপারী পেয়ে কোমরে গুজে রাখেন। তারপর কিছুক্ষণ বাদে কোমরের আঁচল ফেলে দেখেন, সুপারিটি বিলীন হয়ে গেছে। এতে তিনি খুবই বিস্মিত হন। দেখতে দেখতে এই বিধবা নারীটি গর্ভধারণ হন এবং সাত মাসে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়ে যান। তারপর এই ছেলেটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়ে উঠে। জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রবল হয়ে উঠেন এবং তিনি একদিন মার কাছে প্রশ্ন তুলেন যে, প্রকৃতই সে কি একাকী ? তখন বিবশ হয়ে মা সবকিছু অতীতের ঘটনা কনিষ্ঠ

সন্তানের কাছে বৃত্তান্ত করেন; যা তিনি এতদিন অব্যক্ত রেখেছিলেন। মার কাছে সবকিছু জ্ঞাত হওয়ার পর মার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাত ভাইয়ের উদ্ধারের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হলেন। তিনি যাত্রার আগে তার মাকে বস্ত্রের গায়ে অসংখ্য ছুরিতে সাজানো কামেজ বয়নের জন্য অনুরোধ করলে, তার মা তা অনায়াসে বয়ন করে দেন। তারপর এই কামিজ পরিধান করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাত ভাইয়ের উদ্ধারের জন্য রওনা হন পথক্লেশে ব্যাকুল হয়ে কাজে লিপ্ত আগুন্তুক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ হলে তিনিও জলের সংস্থানের জন্য তাদের অনুরোধ করেন। কিন্তু আগের সাত ভাইদের নিপীড়নের কথা ভেবে ঐ আগুন্তুক ব্যক্তিরা তার জন্য জল আনার আপত্তি জানায়। তখন তিনি প্রয়াত সাত ভাইদের কার্যকলাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তারা প্রসন্ন চিত্তে জল অন্বেষনের জন্য অন্যত্র কোথাও চলে গেলে, এর মুহুর্তে তাদের অসমাপ্ত কাজ ফেলে রাখা কার্যগুলি সম্পন্ন করে দিয়ে আসতেন। বনপথে এইভাবে পর পর আগুন্তুক মানুষের বুকভরা আশীর্ব্বাদ নিয়ে, সোজা পিতামহের বাড়ীতে পৌঁছেন এবং তার দাদু তাকে চিনতে পেরে, তার ভাইদের মতই সাদরে সম্বোধন করেন। বৃদ্ধের দুইটি পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, তিনি পিতামহের কাছে পরম আস্থা লাভ হন যে সে আকাঁচাককে মারার ক্ষমতা আছে এবং তার সপ্ত ভাইদের পুর্নজন্ম প্রদান করতে পারবেন। তারপর দাদুর আশীর্ব্বাদ নিয়ে তিনি গন্তব্য স্থলে পৌঁছেতেই দূর থেকে লক্ষদৃষ্ট হন, যে অর্ধ নিমজ্জিত এক বিশাল অঙ্গের পৃষ্ঠ ভাগ বালুচরে পরে আছে তার সপ্ত ভাইদের নর কঙ্কাল "কুঁউাই পেঞ্চারা ছা" কে দেখামাত্রই উক্ত মাছরূপি রাক্ষসটি, তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তাকে ভক্ষণ করে ফেললে; তখন এক নিমিষেই তিনি মাছের লেজের অংশ দিয়ে পায়ু কেঁটে মাছের দেহ থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন মাছের দেহ থেকে নারী ভুঁড়ি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের প্লাবনে ভেসে যায় এবং সেখানেই বিশাল গাত্র মরামাছ বালুচরে পড়ে থাকে। তারপর "কুঁউাই পেঞ্চারা" এক একজন মানুষের অস্থি গুণে জোড়া বাধিঁয়ে বন্য ওষুধের দ্বারা সপ্তভাইকে পুনঃরূপে জীবিত করে তুলেন।

তারপর সাত ভাইরা পুনর্জ্জীবন লাভ হলে, একযোগে উঠেই তারা দেবতুল্য জীবন দানকারী ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইলেন, কুঁউাই পেঞ্চারা তার নাম এবং তার জন্মের ইতিহাস থেকে শুরু করে সপ্ত ভ্রাতাদের কাছে সবকিছু ব্যক্ত করলেন। পরিচয় পেয়ে তাদের এই কনিষ্ঠ ভাইয়ের অবদান তথা তারা পুর্নজীবন লাভের পরম আনন্দে ঐ কুঁউাইপেঞ্চারাকে আলিঙ্গণ করলেন। তারপর যার যে

বহনের সম্ভব আকাঁচাক মাংস কেটে ছিঁড়ে নিয়ে, অষ্টভ্রাতা একযোগে সানন্দে, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন ।

লেঙ্কাপোড়াছা

(রূপক গল্প)

হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে, একদা সাত জন অবিবাহিতা যুবতী প্রাকৃতিক মনোরম অঞ্চলের এক নির্ম্মল ঝিলে স্নান লিপ্ত ছিলেন। এই অবস্থায় তাদের বিনা বস্ত্রে স্নানরত দেখে এক হনুমান, (লেঙ্কাপোড়া) এই যুবতীদের আচ্ছাদন, (ইকীনাই - ইছা) খেলার ছলে, গাছের ডালে তুলে ছড়িয়ে রাখেন। তারপর তাদের স্নান সম্পন্নের পর ঝিলের তীরে আচছাদনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতেই, দেখে ফেলেন এক হনুমান এই বস্ত্রাদি নিয়ে গাছের উপর ডালে সাজিয়ে রেখেছেন। এতে ঐ বিবসন নারীরা বিবশ হয়ে উক্ত বানরকে বশীভূত রাখার প্রয়াসে দাদু (আচীদূরাঙফা) বলে সম্বোধন করেন ।

যুবতী ঃ আচী আচী দূরাংফা
ইকীনায় ইছা রীবাদী
ফানথাউ আলিছা রীউই চারী-ন ।

হনুমান ঃ বলথাই উথাই খাকআঁচাফু-অ
সীচীলা লনদা চেকাউ মুন
মীয়তুদীয় তঙ্গখো মীয়তু ।

যুবতী ঃ চেখাউখ্যা আচী চেকাউখ্যা ।

হনুমান ঃ জানি সিনিদি
ইয়াখিলিক এংসা কায়লাফায়দি

এইভাবে যুবতী মেয়েরা, একের পর এক গানের মাধ্যমে বানরকে বশীভূত করতে হন, এবং সিঁড়ির এক ধাপ উঠে নিজ পরিধান বস্ত্রটি চিনে নিতে হন । ছয়জন যুবতী নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান পরে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর কেবল একজন যুবতী জলে রয়ে যান, যাকে ঐ বানর অধিক ভালবাসতেন। শেষের যুবতী মেয়েও রীতিশ্রদ্ধ ভাবে গানের মাধ্যমে নিজ পরিধান বস্ত্রটি ভিক্ষা করেন। অন্যান্য যুবতীদের

৬২

মতই, সিড়ির এক ধাপ উঠে বস্ত্র নেওয়ার জন্য বানর ইশারা দিলে বস্ত্রটি নাগালের অনেক উপরে এবং আরও একটি ধাপ উঠার ইশারা দিলে তাও নাগালের বাইরে, তৃতীয় বারে তাও কিছু বাকী, যখন চতুর্থ সিড়িতে পা রাখা মাত্রই, অনায়াসে বানর তাকে গাছের উপর তুলে নেন।

তারপর হনুমান ঐ যুবতীকেই চিরসাথী হিসাবে বরণ করে নেন এবং তার ভরণ পোষণ হাতে তুলে নেন। কিন্তু মানুষনারী বানর জাতির স্ত্রী বলে বসতির সকলের কুইসা তার পক্ষে কন্টকীর্ণ রূপে মনে মনে বিদ্ধ হতে থাকে। দেখতে দেখতে এইভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদের বানরনর দম্পতির ঘরে একটি বাচ্চাও জন্ম নেন এবং এই বাচ্চা অনেকাংশে পিতার রূপ পান। এতে মার প্রলাপ আরও বেড়ে যায়। একদিকে বানর অত্যন্ত সৎ, কর্তব্য পরায়ণ এবং জানের চেয়েও অধিক তার স্ত্রীকে ভালবাসতেন।

একদিন হনুমান স্ত্রীর নির্দ্দেশে, সূদূর অরণ্য ভূমিতে লালফল (থাইকীচাক) পাড়ার জন্য রওনা হলেন, এই সুযোগেই বানরের স্ত্রী পুত্র 'তটে' কে কোলে নিয়ে পিতামাতার ঘরে পালিয়ে আসেন। তারপর হনুমান এক খাড়ী 'থাইকীচাক' ঝাঁত করে, সানন্দে বাড়ীতে ফেরার পথে গান গেয়ে গেয়ে আসেন।

হয়াঁই তটেমা দোয়ার ফিয়াওদি
হয়াঁই তটেমা জাঙখঙ ফেরে দি,
ডিঙক্রাসা থাইকীচাক তীব'খা।

স্ত্রীকে খুশী করার জন্য স্ত্রীর মনপূত ফল নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছতেই তিনি দেখেন ঘরে মা-সন্তান কেউ নেই। নিঃস্তব্ধে শূন্য ঘরটি খাঁ খাঁ করছে। হনুমান তখন মনের দুঃখে অধীর হয়ে এদিক ওদিক নিরক্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু তাদের কোন হদিশ নেই। তারপর কেঁদে কেঁদে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অপরিচিত মানুষদের জিজ্ঞেস করতে থাকেন তার সন্তানের মাকে সেই রাস্তা ধরে যেতে দেখেছেন কি ?

বীছা তটেন বাতেআঁই
নংখাই সীকীতাং হরতে আঁই
ইয়াংদে তটেমা থাঙফাই
আঁ-আটাসঙ আঁ-আবিসঙ
আঁ-তাখুকসঙআঁ-বারাসঙ

ইয়াংদে তটেমা থাঙফাই ?
ইয়াং থাঙফাইঅ
ইয়াং থাঙফাইঅ
থাঙদি উলতাঁঙ উলতাঁঙ
নিনি তাউমান' কিরিবি
নিনি উাকমান'. কিরিবি
উাকতউ চাঁপখাই আঙব 'ফাইমান'
ইয়াংদে তটেম থাঙফাই ?

তারপর এইভাবে খুঁজতে, খুঁজতে, একদিন সত্যিই তার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলে, তাঁর স্ত্রী খুবই বিস্মিত হলেন। কেননা যে বানরটিকে চির জীবনের জন্য পরিত্যাগ করে, এড়িয়ে এসেছেন, সেই আবার তার ঘরে পৌঁছেন। স্ত্রী মনে মনে প্রস্তাব করলেন কি উপায় অবলম্বন করলে পর এই বানরের সঙ্গে চির জীবনের জন্য বিচ্ছেদ হতে পারবেন।

একদিন সপরিবার নিয়ে টংঘরে শয়নের সময়, বানরকে সবচেয়ে কিনারের মাঁচানে শোয়ার জন্য স্থান করে দেওয়া হয়, এবং তার পাশে মধ্যতে তাদের একমাত্র সন্তান তটে। রাত্রে অন্ধকার শয়নের সময়, বানরের স্ত্রী তার স্বামীকে বলেন যে, ঃ নাঁঙছা তটেন কিছিন চাআনী/থাইছিম তটেফা থাইছিন। (আরও কিছু কিনারে যান তোমার সন্তান গায়ে চাঁপা পড়বে আরও কিছু কিনারে.......আরও কিছু কিনারে....) এইভাবে ধীরে, ধীরে কিনারে চাপিয়ে তার নির্বোধ স্বামীকে মাঁচানের তলে ফেলে দেন, যেখানে নীচে রয়েছে গৃহপালিত একাধিক শূকর। এতে মাঁচানের উপর থেকে কোন কিছু নিক্ষেপের প্রতিক্ষায় থাকা গবাদিপশু শূকর এবং আরও কয়েকটি জন্তু মিলে বানরটিকে বিদীর্ণ ভাবে ছিঁড়ে ছিঁটে খেয়ে ফেলল। পরের দিন ছেলে 'তটে' তার পিতা বানর এর খুঁজে, মাকে প্রশ্ন করলেন, তটেমা তার ছেলেকে অজুহাতে ভুলিয়ে রাখেন। কিন্তু তা বেশীদিন ধামাচাপা দেওয়া যায়নি। একদিন খেলতে খেলতে 'তটে' তার পিতা বানরের খুলি মাঁচান এর নীচে দেখে, এই অর্ধচেতন শিশুটি বুঝে ফেলেন যে তার পিতা এই জগতে আর নেই। তখন তটে গানের ইশারাতে মাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তার পিতা বানরকে মাই মেরেছে এবং দ্বিতীয় আর কেউ হতে পারে না। এতে তটেমার চোখে তার একমাত্র স্নেহের সন্তান কন্টককীর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি স্বামী হত্যাকারীনী বলে সমাজে প্রচার লাভের পূর্বেই, একমাত্র স্নেহের সন্তান বানর শিশুটিকে, তিনি বিদায়ী দেওয়ার

সচেষ্ট হয়ে উঠেন; আন্তরিক ভাবে তা যদিও অনিচ্ছা ছিলেন। তারপর একদিন স্নেহভরা গানের ছলে 'তটেমা' তার সন্তান নির্বোধ বানর শিশুটিকে নির্দয় ভাবে বিদায় দিলেন।

"আঁ-মীনাইলাই পাঁথম উায়েংঅ,
বাতেরাণ' রীঙ্গ।
তাবুকলে দোয়ার খঙফাঅ,
বাতেরান নাইঅ।
মীনাইলাই তাবুক দাঙদার উাঅ,
বাতেরান নাইঅ।
রাগয়ীকখা কাঙখঙ,
রাগসীকখা য্যাকীঙ।
মীনাইলাই তাবুক উাসঙবীরীঙঅ,
বাক্‌ক্রীঙয়ান নাই-অ ॥"

"ওগো আমার চান্দো। প্রথমে শিখেছো দোলনাতে চড়া; এরপর শিখেছ দরজার চৌকাঠে চড়া; তারপর আরও পটু হয়ে লাঁফিয়ে উঠে। আমার চান্দোর পদ-বাহু মজবুত হয়ে উঠেছে। এখন লাঁফিয়ে উঠে যাবে বাঁশ কাশ বনে।"

এইভাবে, বানর শিশু মানুষ মাতাকে পরিহার করে চলে যান; তার বৈশিষ্ট সূত্র ধরে। লাফিয়ে লাফিয়ে প্রাকৃতিক সবুজ বনভূমিতে বিলীণ হয়ে যায়।

দশম অধ্যায়

লোকবৃত্তে রূপিনীদের খেলাধূলা

সাধারণতঃ রূপিনীদের লোক প্রচলিত খেলাধূলা বিস্তর সময় নিয়ে খুব একটা বড় রকমে খেলার আসর জমে উঠে না। কেননা, অবিরাম কৃষি এবং আনুসঙ্গিক কার্যে লিপ্ত থাকার ফলে তাদের খেলাধূলার আসর খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ ছিল । বিশেষতঃ কোন খেলাধূলাকে নিজস্ব এবং গোষ্ঠীগত স্বত বলে দাবী রাখতে পারে না; কেননা নিয়ম মাফিক খেলাধূলা সমগ্র তিব্বর্বতু-বর্মা ভাষা ভাষীর মধ্যে প্রায়শই সাদৃশ্য লক্ষগোচর হয় । ভাষা লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে আচার অনুষ্ঠান রীতি নীতি তার পাশাপাশি খেলার রীতি নীতি আদান প্রদান হয়ে থাকে ।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে যুগ সন্ধিকালে এসে দেখা গেল, কোন, কোন গোষ্ঠীরা কালজয়ে সদা সচেষ্ট হয়ে উত্তরোত্তর তাদের পৌরাণিক খেলা ধূলার পরিবর্ত্তে অগ্রজ জাতির রীতিনুবর্তী খেলাধূলাই পরিলক্ষিত হয় । পশ্চাৎপদ হাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই হোক, বা তার গোষ্ঠীগত বৈশিষ্টই হোক, যে গোষ্ঠীতে পৌরাণিক আচার অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এইসব গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ পৌরাণিক খেলাধূলার রীতি নীতি সংরক্ষিত রয়ে যায় । এই বৈশিষ্টের মধ্যে রূপিনীরা ব্যতিক্রম লক্ষ হয় না; কেননা, তাদের মধ্যে আদিকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা সেই সমাজ শাসন রীতি নীতি এবং ধর্মীয় আঁচার অনুষ্ঠান বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে থাকে । এতদুপলক্ষে রূপিনীদের ব্যবহারিক জীবনে মধ্যনুবর্তী কালে খেলাধূলার রীতি নীতি কালের গতিতে, সামঞ্জস্য সাধন না হলেও, বর্ত্তমানকালেও তা অস্তিত্ব রয়ে যায় । রূপিনী গোষ্ঠীদের মধ্যে বেঁচে থাকা এই রকমারী খেলার আসর ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতিতে সন্নিবিষ্ট, যা শতাব্দী ধরে উক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্গত চর্চা হয়ে এসেছে । সাধারণতঃ রূপিনীদের খেলা ও খেলারছলে পরীক্ষা নিরীক্ষা কার্য্য চার ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন ঃ ১। বেতের বয়নে কলা কৌশল পরিক্ষা ২। মানযুক্ত খেলা ৩। শক্তি পরিক্ষা ৪। শারিরীক হাল্কা এবং সাহসের পরিক্ষা ।

বেতের বয়ন কলা কৌশলের পরীক্ষা

চামারি খুমবাউ ঃ এটা সমস্ত বেতের বয়ন কলা কৌশল শিল্পের আধার । ইহা একটি সংরক্ষিত বয়নের কলাসূত্র । এটা সাধারণত ধুপদানী আঁকার । প্রাককালে এই দানীর মাধ্যমে নুতন ঘর জামাই শ্বশুর শাশুড়ীকে ফুল নিবেদন করতেন, এবং যেই এই ফুলদানী বয়নে অক্ষম সে শ্বশুড় শাশুড়ীকে ফুল নিবেদন করতে পারবে না অর্থাৎ সে, ঐ পরিবারের ঘর জামাই হওয়ার যোগ্য নয় বলে স্বীকৃত হত ।

সিনচংতরাই ঃ এটা আরও সংক্ষিপ্ত বয়ন প্রক্রিয়া, এবং এই বয়নের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির শিল্পের পটুতা পরিচয় পাওয়া যেত।

চামরাই মাইপাউ ঃ সাধারণতঃ নুতন জামাইদের প্রতি শালী বা শালারা কৌতুকছলে অপদস্থ কলা কৌশলের সূত্রে বয়ন একটি বেতের শিল্প। এই সংক্ষিপ্ত বয়ন প্রনালীকে বিশেষ একটি জটিল সূত্রে জড়িত থাকে, এবং এই সূত্রের অনুধাবন করতে করতেই অনেক সময় জামাই বাবুরা পানাহার ভুলে যেত। তাই একে 'জামরাই মাই পাউ' বলে অভিহিত করা হয়।

চামরাই হমচাম্ ঃ সংক্ষিপ্ত বেতের বয়ন কলা কৌশলের দ্বারা নুতন ঘর জামাইদের উপস্থিত বুদ্ধি পরিক্ষার এক অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে, এই চামরাই হমচাম।

মানযুক্ত খেলা

সাকীয়থাঁঙমুঙ ঃ এই খেলা রূপিনীদের অতি প্রাচীনতম এবং অন্যতম খেলা। এই ধরনের খেলার জন্য সুপ্রশস্ত ময়দানের প্রয়োজন হয় না। সমতল ক্ষেত্রভূমি বা বাড়ীর আঙিনাতেই এই খেলার উদ্যোগ নিতে পারে।

২২´ বর্গক্ষেত্রে এক প্রান্তে একটি সমান্তরাল রেখা এঁকে ঐ রেখার উপর সারিবদ্ধ ভাবে ১২টি বল (সাকীয়) পরপর সাজিয়ে বসাতে হয়, যাতে একটি বলের সঙ্গে অপরটি সংস্পর্শ না হয়; তাও লক্ষ রাখতে হবে। এরপর মাঠের কিছুদূর বিপরীত প্রান্ত থেকে একের পর এক একাধিক খেলোয়াড় হাতে বল (সাকীয়) নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসানো বল (সাকীয়) প্রতি লক্ষ করে, নিক্ষেপ করতে হয়। এই নিক্ষেপ বিভিন্ন দৈহিক ভঙ্গিতে সম্পন্ন করতে হয়। এই ভঙ্গির তিনটি প্রণালী নীচে দেওয়া হল ঃ

১। মম্ফল ঃ একটি সাকীয় মুখে পুড়ে দূর থেকে দৌড়ে এসে, উক্ত সারিবদ্ধ ভাবে বসানো বলের প্রতি লক্ষ করে নিক্ষেপ যে কোন বল আঘাত করতে হবে,

যদি নিক্ষেপ লক্ষ বিচ্যুত হয় তাহলে এই খেলা অবৈধ হবে।

২। **চিংচঙ্গ ঃ** এই প্রণালীতে খেলোয়াড় এক পায়ে ভর করে দ্বিতীয় পা তুলে, আঙ্গুলের ফাঁকে 'সৗকীয়' গুজে এবং বিপরীত প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে সারিবদ্ধ ভাবে রাখা, বলের বিপরীত মুখে দাঁড়িয়েপায়ের নীচে দিয়ে সৗকীয় নিক্ষেপ করতে হয়। যদি এই নিক্ষিপ্ত বল, সারিবদ্ধ 'বলে' আঘাত না করে তাহলে সেই খেলোয়াড় অবৈধ বলে চিহ্নিত হবে।

৩। **গুলটায় ঃ** এই প্রণালীতে খেলোয়াড় প্রথমতঃ সোজা মুখে কিছু দূরবর্তী হতে দৌড়ে এসে সারিবদ্ধ ভাবে বসানো বলের ১২´(বার ইঞ্চি) ব্যবধানে দাঁড়াতে হয়। তারপর পৃষ্ঠ অংশে মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে পায়ের নিচে থেকে ঐ সাজানো বল (সৗকীয়) এর প্রতি লক্ষ করে বল (সৗকীয়) নিক্ষেপ করতে হয়। যদি নিক্ষিপ্ত বল (সৗকীয়) লক্ষচ্যুত হয়, তাহলে ঐ খেলোয়াড় অবৈধ বলে ঘোষিত হবে।

ভারেচেক থাঁঙমীন ঃ মান বিশিষ্ট এই খেলা যেমন খুবই মজা ছিল, তেমনি নিয়ম কানুন পালনও খুবই জটিলতা বটে। ছোট ছোট বেত চিড়ে তৈরী ৫´´ (পাঁচ ইঞ্চি) মোট ২০টি (বিশটি) কাঠি নিয়ে ৪ (চার) থেকে ৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে, খেলার আসর গড়ে উঠতে পারে। এলোমেলো কাঠির মধ্যে যতদূর সম্ভব কাঠি টেনে বের করতে হবে। যেখানে ঐ কাঠি টানাতে অপর কাঠি যাতে না নড়ে। এইভাবে ২০টি কাঠির মধ্যে সাধ্য মত যা কিছু হাতে আসবে এক এক জন খেলোয়াড় উক্ত টানা কাঠি নিয়েই খেলবে; তারপরেও অনেক কিছু নিয়ম কানুন, এবং তা বিশেষ করে হাতের কেরামতি বটে। হাতের থাবা থেকে হিঁচকে থাবার পৃষ্ঠে কাঠিটি নেওয়া; বাহুজোড়াতে কাঠি রেখে হিঁচকে ধরা; কনুইতে কাঠি রেখে চট করে ধরা ইত্যাদি ঐসব সম্পন্নের পর কাঠি হাতে যা বেঁচে থাকবে, তাহাই এক একজন খেলোয়াড় এর, কাঠি হিসাব করে মান নির্ণয় করা হয়। যারা কাঠি হাতে ধারণ করে রাখার পটুতা নেই তারা এই খেলার নিয়ম অনুসারে মানবিহীন বলে গণ্য হয়ে থাকে।

শক্তি পরীক্ষা

মীছামীয়সেকমীন ঃ এই ধরনের খেলা সাধরণত খেলার ছলে শক্তি পরীক্ষারই নামান্তর মাত্র । রূপিনীদের মধ্যে কেউ কেউ এই খেলাকে "তালা চাবিৎ খীলাওমীণি"ও বলে থাকে। 'মীছামীয়সেকমীম' অর্থাৎ বাঘের থাবা থেকে শিকার উদ্ধার করণ। বিশেষ করে এই খেলা যুবকদের মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল এবং এটা খুবই শক্তি সাপেক্ষ খেলা বলে, এক কালে রূপিনীদের মধ্যে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই খেলার প্রণালী যেমন সহজ, তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ নয় এবং তিন জন খেলোয়াড় মধ্যে দুইজন প্রতিবন্দক এবং তৃতীয় জন প্রতিপক্ষ; যেমন ঃ দুইজন প্রতিবন্ধক খেলোয়াড় বসে একে অপরের কাঁধে আড়াআড়ি ভাবে দু' পা তুলে দিলে এবং তৃতীয় খেলোয়াড় অর্ধ শয়ন আসনে পূর্ণ পদদুইটি সমান্তরাল ভাবে আড়াআড়ি ঐ দুই ব্যক্তির পায়ের ফাঁদে পা গুঁজে দেবে। এতে প্রতিবন্ধক খেলোয়াড়ের আড়াআড়িভাবে মিলিত চার পায়ে প্রতিপক্ষের পা দুটিকে এমন ভাবে ছিনে আটকাবে ঐ তৃতীয় খেলোয়াড় অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নিজের পা দুটি টেনে বের করা কষ্টসাধ্য। আর যদি সহসা টেনে নিতে পারে তাহলে দুইজনের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের শক্তি বেশী বলে বিবেচিত হয়।

সীমপেঁচীতিসামীন ঃ এই কথাটির অর্থ হচ্ছে, লবনের বোঝা উত্তরণ শরীরের আর কোন স্থানে স্পর্শ না করে, কেবল হাতের ভরে ভারী ভারী জিনিষ তুলে নেওয়া। এই খেলায় প্রবল হাতের পেশীর ক্ষমতা সাপেক্ষ, তাই এই খেলা সাধারণত সব খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

দেঙধরসেকমীন ঃ বিশেষ করে দুই জনের মধ্যে এই খেলা প্রতিদ্বন্ধ হয়ে থাকে। একজন খেলোয়াড় ৬ ইঞ্চি লম্বা একটি দ্বন্ধ দন্ডায়মানভাবে মাটি স্পর্শ করে একহাতে ধরে রাখবে এবং দ্বিতীয় জন উপর দিকে একহাতে ধরে একে জোড়ে মাটি স্পর্শ করতে হবে। এইভাবে দ্বন্ধটি যেই আগে ছিনিয়ে নিতে পারবে সেইজন হাতের শক্তি বেশী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

উানচায়চর্খা তিসামীন ঃ এই কথাটির অর্থ হচ্ছে বাঙ্গালীর চর্কা উত্তরণ। একজন দৃঢ় ভাবে সোজা দাঁড় অবস্থায়, বলবান ব্যক্তি উক্ত খাড়া ব্যক্তির পায়ের পাতা নিচে দু'হাতের তালু পেতে জোঁড়ে ধীরে ধীরে কোমড় অবধি উত্তরণকেই রূপিনীরা "উানচায়চর্খাতিসামীন" বলে অভিহিত করেন।

আথুক মীয়চামীন ঃ সাধারনত এই খেলা, এক নিমিষেই শেষ হয়ে যায়; অনেক সময় কৌতুকছলে একজন বলবান খেলোয়াড় অপর জনকে ডিগবাজীতে উল্টে দিয়ে মজা করে থাকে। তাই একে বিদ্রূপ ভাষায় আথুক মীয়চামীণ (অর্থাৎ ইচা ব্যঞ্জনের মজা) বলে রূপিনীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দুইজন খেলোয়াড় পরস্পরের পৃষ্ঠে, পৃষ্ঠে ঠেসে একজন উল্টোদিক থেকে অপর আর একজন খেলোয়াড় এর বাহুমূল জড়িয়ে দুই হাতে ধরতে হয়। তারপর প্রথম খেলোয়াড়টি সম্মুখে নুয়ে পড়লে, তার সঙ্গে পৃষ্ঠে, পৃষ্ঠে অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিও চক্রাসনের মত পিঠে হেলে সঙ্গে সঙ্গে দু পা তুলে ডিগবাজী খেয়ে প্রথম খেলোয়াড়ের সামনে পড়বে।

বুটুল বীমুখু সীকমীণ ঃ এর মূল অর্থ হচ্ছে বোতলের মুখে ছিপি ভরা এবং এর নামকরণের সঙ্গে খেলোয়াড়দের জোড় পরিক্ষা অনেক সাদৃশ্যতা আছে।

পঞ্চামীরমীণ ঃ এই খেলা অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও দেখা যায়। পঞ্চাধরা শব্দ থেকেই পঞ্চামীরমীণ কথাটি উদ্ভব হয়; তাই নিয়ম কানুনও ঐ পঞ্চাধরার সঙ্গে 'পাঞ্চামীরমীণ' কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

শারীরিক হাল্কা এবং সাহসের পরীক্ষা

বাইলেংবাতমীন ঃ একটি বাইলেং (ঢালা) দ্বারা এই খেলা সম্পন্ন করতে হয়। বৃত্তাকার ঢালাটিকে অর্ধব্যাসার্ধে ধরে ঘুরালে, তার গতির সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড় লাফিয়ে, লাফিয়ে, আবর্তন করে যাবে; যদি গতির সঙ্গে তালমিল লক্ষ

না হয়, তাহলে উক্ত খেলোয়াড় বাইলেং (ঢালা) এ পা আঘাত পড়ে লুটিয়ে পড়ে যাবে। পটু খেলোয়াড়রা সাধারণত সামনে এবং পিছনে উভয় দিকেই বাইলেং ঘুরিয়ে লাফিয়ে, লাফিয়ে সহসা আর্বতন করতে পারে। এই ধরনের খেলা শারীরিক হাল্কা এবং সাহসের সাপেক্ষ, তাই চর্চা ব্যতিত সাধারণ মানুষের কাছে সাধ্যাতীত।

মীসীয়সাকীনাঙ বাতমীন ঃ এই খেলা যেমন ঝুঁকিবহুল তেমনি অত্যন্ত চমকপ্রদ; তার পাশাপাশি প্রবল দৈহিক হাল্কারও প্রয়োজন আছে। রূপিনীরা এই খেলার নাম যথার্থই আখ্যা দিয়েছেন যথা ঃ 'মীসীয় = হরিন; সাকীনাঙ/সাগকীনাঙ = গর্ভবতী; বাতমীণ = লম্ফ; মিলে একটি পদ সৃষ্টি হয় 'মীসীয়সাকীনাঙ-বাতমীণ' অর্থাৎ গর্ভবতী হরিণের লম্ফ। এই খেলার প্রণালী বাহ্যিক ভাবে সহজ হলেও কার্যতঃ তা সম্পন্ন করা কুবই কঠিন বটে। বানর বাচ্চা বহনের ন্যায় লম্ফকারী ব্যক্তিরবুকে দ্বিতীয় আর একজন হাল্কা ব্যক্তি একযোগে এমন হাত পা জড়িয়ে ধরবে, কোন রকম ঝাঁকুনিতে ঐ ব্যক্তি পড়ে যাবে না। তারপর লম্ফকারী মাঁটিতে দুই বাহুর অঙ্গুলী ভর করে অর্ধ পদদ্বয় ভাঁজে এবং বুকে জড়ানো একজন মানুষ নিয়ে লম্ফনের জন্য প্রস্তুত হবে। নার্তিদৈর্ঘ্য সম্মুখে তৃতীয় আরেজন খেলোয়াড় কনুইতে ভর করে হামাগুড়িতে (শক্ত খাড়া অবস্থায়) লম্বালম্বিভাবে শোয়া থাকবে এবং ঐ লম্ফকারী হেলিয়ে তার উপর দিয়েই লাফিয়ে যেতে হবে।

বাঙক্রংবিরমীন ঃ "বাঙক্রং" হচ্ছে গোবরে পোকার মত একধরনের বাদামী রঙের উড়ন্ত পোকা যা বাঁশ বনে বেশী দেখা যায়। এই পোকা বন বনে গুঞ্জনে ধীর গতিতে উড়ে থাকে যা খুবই আকর্ষণের বস্তু। রূপিনীরা ঐ পোকা উড়ার কৌশলটি একটি খেলার ছলে ছাঁচ অনুসরণ করে থাকে, তাই হচ্ছে "বাঙক্রংবিরমীন"।

একজন হাল্কা এবং দৃঢ় পেশী বহুল খেলোয়াড় মজবুত একটি পালাতে তার দুপা কাপড়ের দ্বারা এমন ফাঁস দিতে হবে, যে ফাঁস অনায়াসে ঘুরবে, কিন্তু বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা নেই। তারপর খেলোয়াড় পালাতে ভর করে ধীরে ধীরে সমান্তরালভাবে শূণ্যেতে উপুর হয়ে শুয়ে এবং তার দু'কান ধরে পাখার মত পালাটিকে কেন্দ্র করে ঘুরবে।

এছাড়াও এইসব শারীরিক হাল্কা এবং সাহসের পরীক্ষার জন্য আরও অনেক কিছু আছে। যেমন ঃ "মীসাআবক চারীমীন, লমর উাতমীন, ঈশাম উতামীন (বাঘ

বাচ্চাকে দুধ দান, চের কামড় দিয়ে তুলা, গাইল কামড় দিয়ে তুলা) ইত্যাদি। আবার খেলার ছলে নৃত্য পরিবেশনও হয়ে থাকে। এই খেলাকে রূপিনী ভাষায় 'লমর বাতমীন' অর্থাৎ চের লম্ফন বলে অভিহিত করা হত। এছাড়াও মানবিশিষ্ট খেলার মধ্যে করবী, "বউটালিও থীঙমীন" অর্থাৎ করবী বিচি খেলা, আবার আনন্দ বর্দ্ধক খেলার মধ্যে 'চুরকিতিংরীমীন' অর্থাৎ লাটিম ঘোরানো, 'দুরক্ষা থীঙমীন' অর্থাৎ কাপড়ের মোচা খেলা ইত্যাদি। আবার শক্তি পরীক্ষামূলক খেলা হচ্ছে যেমন : 'মাইচীলীয় খগ হরমীন' অর্থাৎ ধানের বীজ রাখার খলী উত্তোলন ইত্যাদি।

প্রাককালে জুম কৃষি কাজের অবসরে, অবসর বিনোদনের জন্য এইসব খেলাধূলার আসর জমে থাকে এবং মনমাতানো জ্যোৎস্না রাত্রে রূপিনীদের যুবক যুবতীরা এইসব খেলা ধূলায় উৎসাহী হয়ে উঠত। কিন্তু সমতল ভূমিতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের খেলা ধূলার রূচি পরিবর্তন করে নিতে পরিলক্ষিত হয়। রূপিনীদের প্রাক জীবন যাপন জড়িত আচার, আচরণ কৃষি উপজীব্য রীতি নীতি উত্তরোত্তর পরিহারের সঙ্গে সঙ্গেই, তাদের আদি কালের খেলা ধূলার চর্চার অভাবে কোন কোন খেলা বিলুপ্ত প্রায়। ফলে নব্য রূপিনী সমাজে, দিন দিন সার্বিক প্রচলিত খেলাকেই আত্মস্থ করতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন "বলখেলা, বলীবলখেলা, ডু ডু খেলা, দারীবান্দা, গোলাপখেলা, টেংদাংখেলা আরও কতকি খেলাকে আত্মস্থ করে নেয়। আবার শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে, সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিচর্চার নিত্য নিতুন অসংখ্য খেলার চর্চা করতে হয় বলে আদি কালের বিশেষ একটি গোষ্ঠী দ্বারা উদ্ভব খেলাধূলা দিন দিন তাচ্ছিল্য হয়ে যায়। আজকাল রূপিনীদের শিক্ষিত মহলে অগ্রজ জাতি থেকে রপ্ত করা ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, তাসখেলা ইত্যাদি প্রসার ঘটেছে।

একাদশ অধ্যায়
লোক প্রচলন কবিরাজী ঔষধ ও ব্যবহার

জুমচাষের উদ্দেশ্যে রূপিনীরা আদিকাল পার্ব্বত্য বনে বনে বেশীরভাগ কাল যাপন করতে হয়েছিল বলে, তাদের গোষ্ঠীর অন্তর্গত বনাজী ঔষধ পত্রের ব্যবহার খুবই প্রসারিত ছিল। কেবল রোগ নিরাময়ের জন্যই বন্য ঔষধ পত্র ব্যবহার, রূপিনীদের মধ্যে সীমিত ছিল না। গৃহস্থের ভোগ্য পণ্যাদি উৎপাদনের কাঁচা মাল

হিসাবে উদ্ভিজ্জ পাতা, মূল, কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহর্য্যতা লাভ করেছে। বস্ত্রের রঙেবেরঙ তুলার কাজে, মদ্যাবি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার; মৎস শিকার, পশু পাখি শিকার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বনাজী ঔষদের ভূমিকা অপরিহর্য্য রুপে ব্যবহারের স্থান আছে।

প্রাককালে রূপিনীদের সমাজে রোগ নিরাময়ের জন্য যে ব্যক্তি লতাপাতা সংগ্রহ করে পেষন বা চূর্ণের পর, লোকের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের, 'অচাইধঙ' বলে তথাকথিত ভাষায় অভিহিত ছিল। 'অচাই' শব্দটি সাধারণত পূজার পুরোহিত বুঝায় কিন্তু 'ধঙ' শব্দের মূল খুঁজে পেলাম না। অনেকে আবার অচাইবঙ > অচাইধঙ-ধঙ বলেও উচ্চারণ করতে শুনা যায়। এতে বুঝা যায় যে, ধঙ ধঙ > দং দং চুর্ণ ধ্বনি থেকে এই ধরনের নামকরণ হয়। কি কি বনাজী ঔষধের উপর ভিত্তি করে প্রাককালে ঐ অচাইধঙ এর দ্বারা রোগ চিকিৎসা হত তা নীচে প্রদান করা হল।

কেঁপে কেঁপে জ্বর উঠা ঃ ১০৮ প্রকার একযোগে বনাজী কুড়িয়ে নিয়ে এবং তাকে পেষন করে আগে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর রোগীকে লেপে আবৃত্ত করে ঐ ঔষধটি আগুনে পুড়িয়ে উক্ত ধোঁয়া দ্বারা রোগীকে ওম দেওয়া হয়। এই প্রনালীকে রূপিনীদের ভাষায় "হমমীন" বলা হয়ে থাকে। ১০৮ প্রকার বনাজী ঔষধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লতা-পাতা ও মূলের নাম হচ্ছে; যেমন ঃ ১। আভম বীলাই বা বসক ২। কর্কীর্ফাই (গন্ধপাতা) ৩। তিপরা দাল' বসক (এলেংচার শীর্ষক) ৪। খারমীং বসীক (বিষাক্ত পাতার শীর্ষক) ৫। চিরিমিনি বীলাই (চিরিমিনি পাতা) ৬। তুলসীকসম বসক (কাল তুলসীর শীর্ষক); ৭। মন্দুর বীসক (মন্ধুর গাছের শীর্ষক) ৮। বাসক বীলাই (বাসক পাতা) ৯। আমগাছের শীর্ষক ১০। হেংড়া বীসক (শিউলী গাছের শীর্ষক); আরও অনেক কিছু। আর যদি কিছু দিন অন্তর অন্তর যদি জ্বর পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে ভাল্লুকের লোম তাবিজ বা কবজ বানিয়ে পরিয়ে দিতে হয়।

কাশী রোগী ঃ সাধারণত এই রোগীর কোন চিকিৎসা করা হয় না। কিন্তু রোগী যদি মারাক্ত (Chronic type) হয়ে যায় তার উপশম করার জন্য তত্র ব্যবস্থা নেয়। যেমন ঃ হাক্ষা কংকীরাই (Hooping cough) হলে উল্লুকের পিত্ত এবং গলা (হোলীকনি তত্র বীকখীরী) পেষন করে তার সঙ্গে সাতক্রা বীকুর

(সাতকড়ার বাকল) ছেঁটে মিশাতে হয়। এইভাবে রোগী কয়েকদিন ব্যবহারের পর তা অবশ্য ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

গুটি বসন্ত (বীরছীক) ঃ প্রাককালে রূপিনীদের পার্ব্বত্য পল্লীতে সচরাচর এই 'বীরছীক' (গুটি বসন্ত) মারাত্মক ভাবে মহামারী ফেলে দিত। যেহেতু রূপিনীদের অর্ন্তগোষ্ঠী মধ্যে এই রোগী নিরাময় করার জন্য কোন নির্ভরযোগ্য বনাজী ছিল না। সাধারণত এই রোগীর প্রাথমিক অবস্থায় সাদা চন্দনের প্রলেপ সারা শরীরের মেখে দিলে অনেকটা প্রশমিত হতে পারে।

কলেরা/আমাশা ও অন্যান্য পেটের রোগী ঃ কলেরা রোগী প্রকান্তরে মহামারী রোগী প্রাককালে রূপিনীদের স্থান পরিবর্ত্তনের একটি কারণ। কোন বসতিতে মহামারী ফেললে উক্ত বসতি পরিত্যাগ করে তারা অন্যত্র কোথাও গিয়ে নুতন ভাবে উপনিবিষ্ট গ্রহণ করে থাকে। এইসব মহামারীকে কোন দেবদেবীর কুদৃষ্টি বা গ্রাস বলে বিশ্বাস করতেন। তাই এই রোগী বনাজী ঔষধ পত্রে দ্বারা রোগ নিরাময় এর প্রচেষ্টা রূপিনীরা সাধারণত করে না; তার নিরাময়ের বনাজী ঔষধও নেয়। তবে সাধারণ ভাবে পেট ফাঁপা অনবরত দাস্ত পায়খানা, বমি, বাচ্চাদের আমাশা ইত্যাদির জন্য পেয়ারা গাছের শীর্ষক (গয়াম বসক) তার সঙ্গে আনারসের কঁচি পাতা (আমতীর বীলাই) বন্য গাছের শীর্ষক (তুখারঙ বসক) মিশিয়ে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

হাড়ভাঙ্গা রোগীর ঔষধ ঃ এই ধরনের রোগীকে নিরাময় করে তুলা প্রাককালে রূপিনীদের মধ্যে এক অতুলনীয় বনাজী ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু এইসব বন্য ঔষধ অভিজ্ঞ সম্পন্ন বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা জগৎ থেকে উত্তরোত্তর বিদায় নেওয়ার পর, ঔষধ পত্রের নামও তাদের সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যায়। যা কিছু জন প্রবাদে বেঁচে রয়েছে এইসব বন্য ঔষধের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য; নিম্নে দেওয়া হল ঃ ১। চীয়ান লাই (মদ্যাদি ঔষধের পাতা) ২। ছিন-স্রাবমা (বন্য ছোট আকারে উদ্ভিদ) ৩। হালরীতুমা (বন্য ছোট আকারের উদ্ভিদ) ৪। ইন্দ্রগো-বীলাই (ইন্দ্রগো পাতা) ৫। বিথি সীরাফমা (লতা জাতীয় বন্য ঔষধ) এইসব ভিন্ন ভিন্ন দুস্প্রাপ্য বনাজীকে একসাথে করে ছেঁটে বা পেষণ করে হাড় ভাঙ্গা স্থলে প্রলেপ করে কিছুদিন

কাপড়ের ফাঁস দিয়ে বেঁধে রাখলে তার ফলপ্রসূ কিছুদিনের মধ্যে বুঝা যায়।

তাছাড়া মাথা ধরাতে 'মাছেংতুমপা' পাতা ছেঁটে মাথাকে লাগালে প্রশমিত হয়ে থাকে; ঘা হলে বা ফুলে প্রবল বেদনা অনুভব হলে 'বয়কুমড়ার' আলু বা মূল সেঁটে বা পেষন করে ক্ষত স্থানে প্রলেপ করলে সুফল পাওয়া যায়। আবার ফোঁড়া হলে 'উরিবার' (জবা ফুল) সেঁটে উক্ত স্থানে লাগালে খুবই সুফল পাওয়া যায়। অঙ্গ কাঁটা যখন রক্ত বের হবে তখন 'সানব্রেমান' (মরিচা লতা) পাতা সেঁটে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত স্রোতের ক্ষততে প্রলেপ করলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। আর যদি ক্ষত স্থানে অতিরিক্ত জ্বলে তাহলে 'খুমপুইবীথা' (দোলনচাঁপা মূল) পেষন করে উক্ত ক্ষত স্থানে প্রলেপ করে দিলে খুবই আরাম পাওয়া যায় এবং ঘাও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ছোট খাট কাঁটাতে 'কৗছা কৗথাঙ' (পাথরকুচি) পাতা সেঁটে এর রস ঢাললে খুবই প্রশমিত হয়।

আহারের সঙ্গে বনাজী ব্যবহার ঃ রূপিনী গোষ্ঠীরা আহার হিসাবে একটি খাদ্যুপযোগী বনাজী ঔষধ ব্যবহার করে থাকে। এইসব ঔষধ গাছ ঘরের আঙিনায় বা জুমে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও অনেক সময় করে থাকে। যেমন 'মৗয়লাউ পান্দা' মৗয়ছেংসা, পেট ফাঁপা এবং বদ হজমে, হজম শক্তি বর্দ্ধকের এক অতুলনীয় বনাজী ঔষধ; এইসব বনাজী ব্যঞ্জন হিসাবেও খুবই সুস্বাদু। আবার 'কেরাংমৗয়থাফেক' যেমন ব্যঞ্জনে খুবই সুস্বাদু তেমনি বাতের রোগীদের জন্য উত্তম বনাজী। তাছাড়া, চাপাও, কণ্ডকা, বিশকচু ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ অতুলনীয় ঔষধ, পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যঞ্জনে আহারও হয়ে উঠতে পারে।

প্রাণীজ মধ্যে চোখের রোগীদের মধ্যে শামুক (ছিকামু ক) গায়ের জল খুবই ফলপ্রসূ। আবার অবৃদ্ধি বাচ্চাদের স্বেদ করে খাওয়ালে বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। কুইচচা মাছ ব্যঞ্জনে যেমন সুস্বাদু তেমনি এর কাঁচা রক্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারলে রূপিনীর বিভিন্ন ঔষধের কাজে ব্যবহৃত করে থাকে।

ভোগ্য পণ্যাদি উৎপাদনে বনাজী

মদ্যাদি উৎপাদন ঃ প্রাককালে রূপিনী সমাজে মদ্যপান, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে এক অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত ছিল এবং এর উৎপাদন বাধা নিষেধ ছিল

না। ফলে গৃহস্থ জীবনে ভোগ্য পণ্য হিসাবে মদ উৎপাদন করা গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। ছিনগ্রাবমা (ছোট আকারে বন্য উদ্ভিদ) চুয়ানলাই, আমগু, কাঁঠালের পাতা, চালের সঙ্গে মিশিয়ে, গাইলে পেষণ করা হয়। তারপর একে আঠা বানিয়ে বরি তৈরী করে, রৌদ্রে শুকিয়ে মদ উৎপাদনে ব্যবহৃত করতে হয়।

বস্ত্রের রঙ করণ ঃ প্রাককালে রূপিনীরা দূর্গম পার্ব্বত্য পল্লীতে বসবাস করতে হয় বলে তাদের মধ্যে সাবলম্বী হওয়ার প্রবনতার খুব একটা ঝুঁক ছিল। ফলে প্রাকৃতিক রঙ তোলার রঙ সাদাই বেশী বস্ত্র ব্যবহার করতে হত। কিন্তু রঙে বেরঙের পোষাক পরিধান করার সচেতনতা তখনও মানুষের প্রবনতা ছিল এবং বাধ্য হয়ে সেকালের মানুষ বনাজীর দ্বারা কাল এবং লাল রঙ করণের পদ্ধতি সৃষ্টি করে কাল রঙ তোলার জন্য বনাজী গাছ জুমে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে উৎপাদন করতে হয়; আবার লাল রঙ তোলার জন্য 'অসূল' গাছের মূল তুলে পেষনে খারের সঙ্গে মিশিয়ে ঐ রাসায়নিক জলে বস্ত্র বয়নের জন্য প্রস্তুত সূতাকে সিদ্ধ করলে লাল রঙ ধরে যায়। কাল রঙ তেলার প্রণালীতেও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য। কেবল বনাজী গাছটি পরিবর্তন হবে।

শিকারের বনাজী ব্যবহার ঃ মৎস শিকারীরা এইসব বন্য ঔষধ প্রয়োগে অতি সহজে মাছ ধরে থাকেন। কোন মাছ ভরা আবদ্ধ জলে ছোট আকারের বন্য উদ্ভিদ এর মূল অর্থাৎ 'আরু' গাছের মূল পেষন করে উক্ত জলে ঘুলিয়ে দিলে আধ ঘন্টা পরেই মাছ নেশাগ্রস্থ হয়ে ভেসে যাবে; তখন অনায়াসে ঐ জলের উপর ভাসানো মাছ ধরে ফেলতে পারে। কোন পশু পাখি শিকারে তীর বা বল্লমে 'টুল' গাছের রস মেখে নিলে, ঐ তীর বা বল্লম পশু পাখিকে বিদ্ধ করা মাত্রই বিষাক্তে জর্জরিত হয়ে শিকারের স্থানেই লুটে পড়ে যাবে। মৃমূর্ষ অবস্থায় পশু পাখি দৌড়ে গিয়ে শিকারীকে বিভ্রান্ত করে তুলার কোন প্রশ্নই উঠে না।

ধণ্যমানিক্যের রাজত্ব কালে ত্রিপুরা রাজ্য

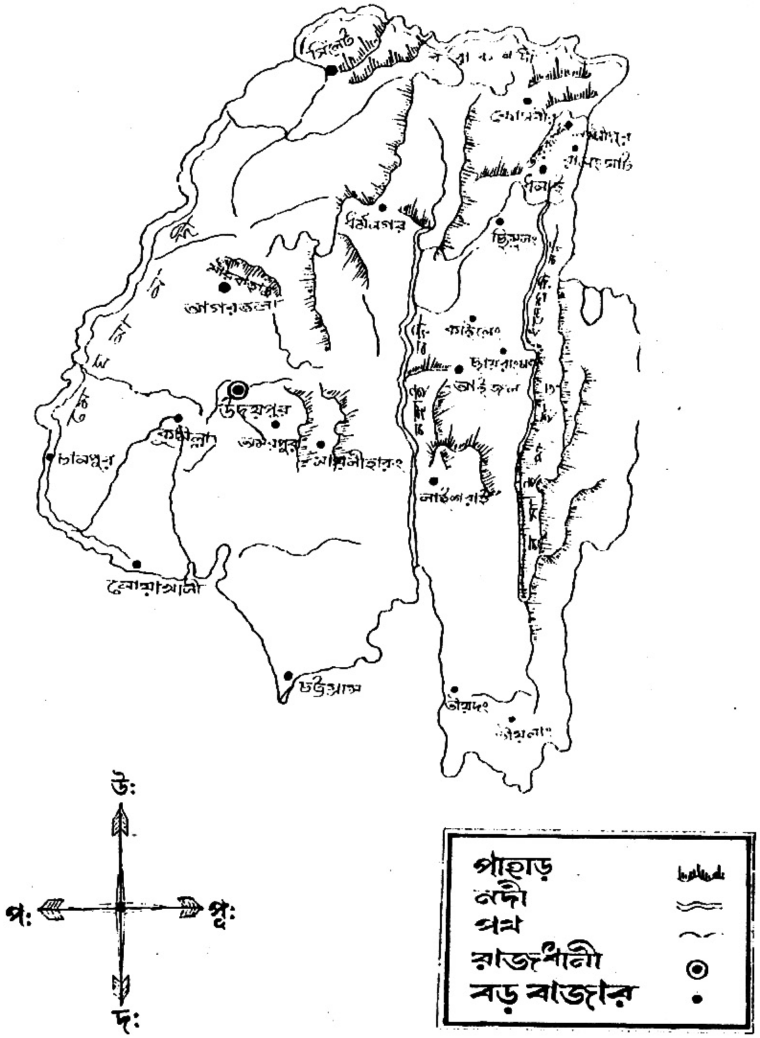

ত্রিপুরা রাজ্যে
রূপিনী অধ্যুষিত অঞ্চল

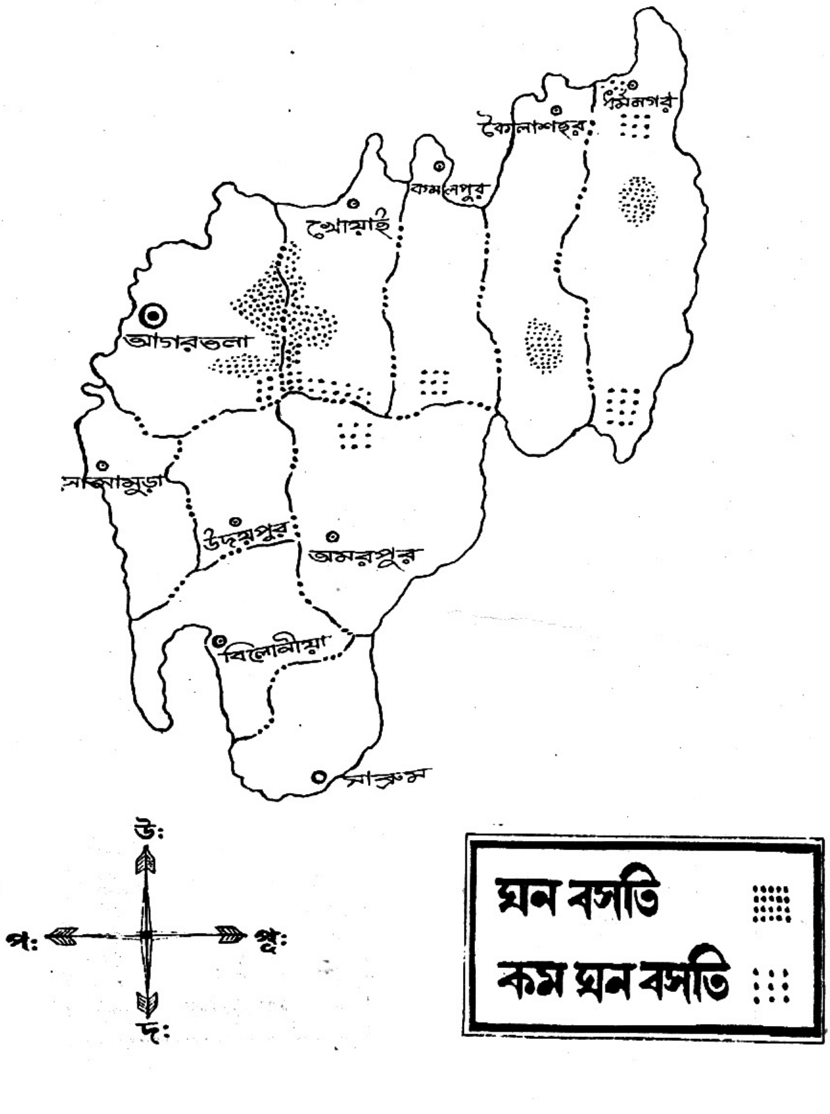

থাইথাক সর্দার ভক্ত নারায়ণের ছেলে এবং থাইথাকদের 'রায়' শ্রীরাজকুমার রূপিনী

আমার পূজনীয় পিতামহ শ্রীরামধন রূপিনী যিনি রূপিনী গোষ্ঠীর খুঁটিনাটি তথ্য এই পুঁথিতে সম্ভরন করেছেন ।

সনাতন ধর্মের পর রূপিনীর বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন

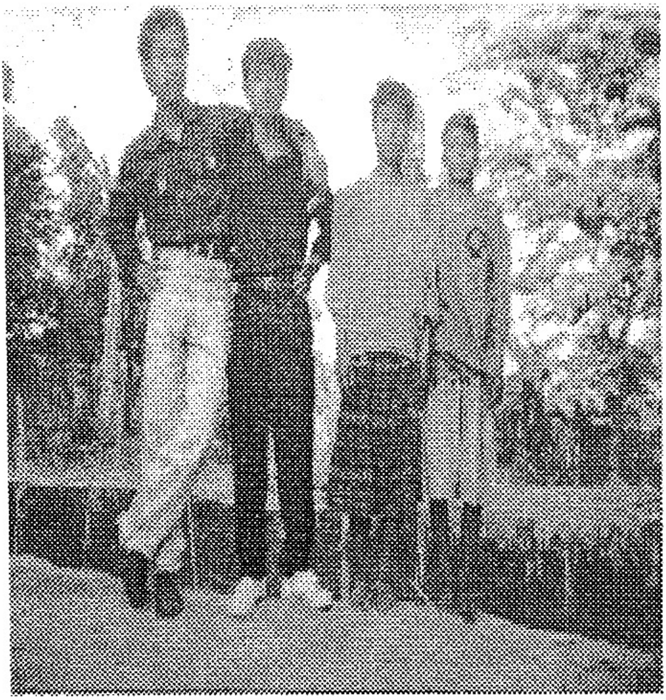

রূপিনী গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

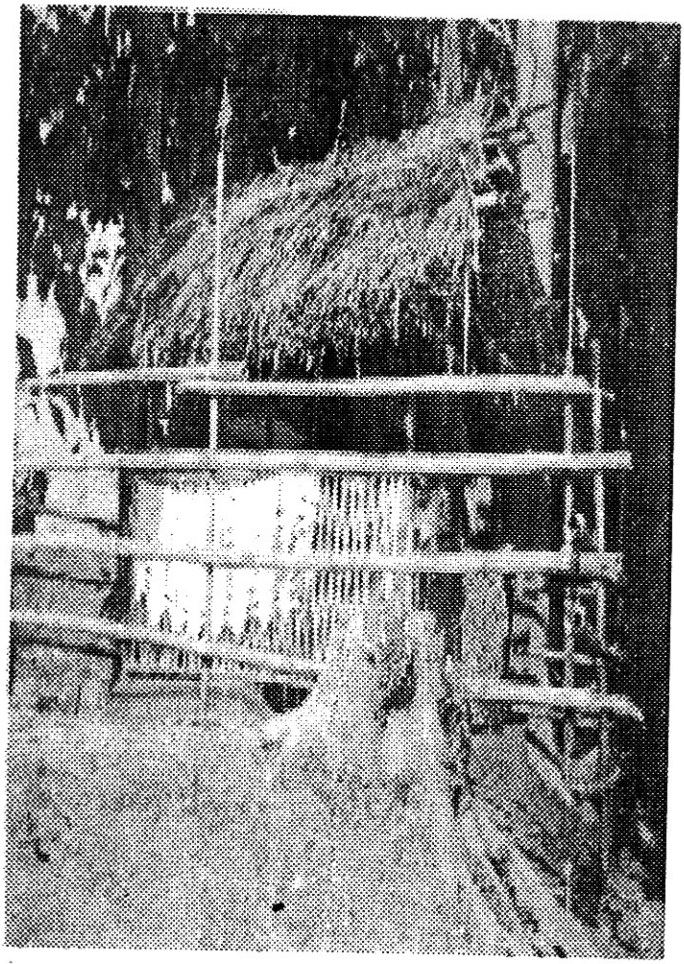

বৈষ্ণবদের সমাধি ঘর

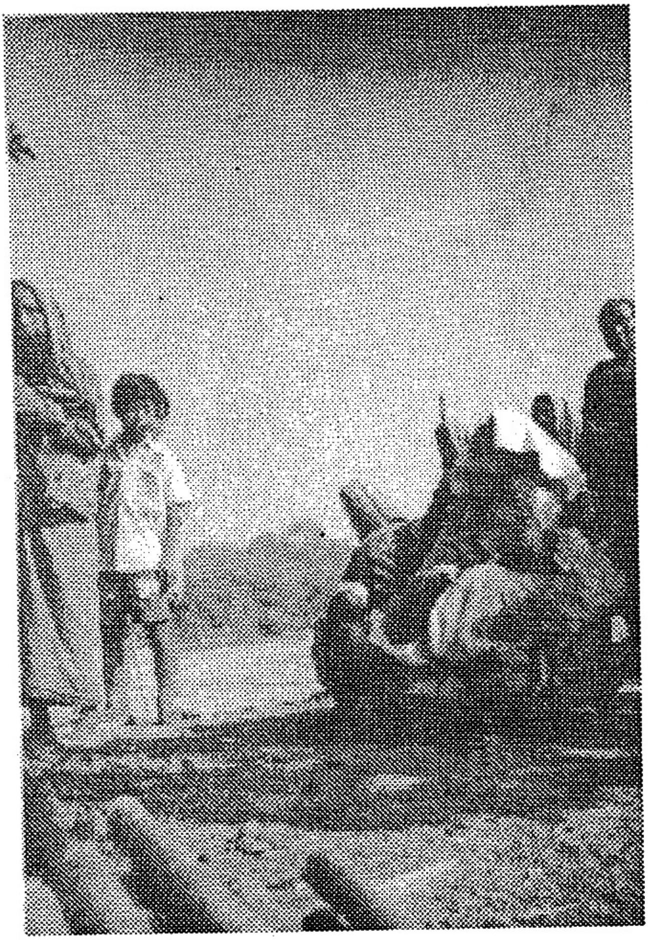

সমাধিকরণের পূর্বে বৈষ্ণবকে গর্তের সম্মুখে রাখা হয়েছে

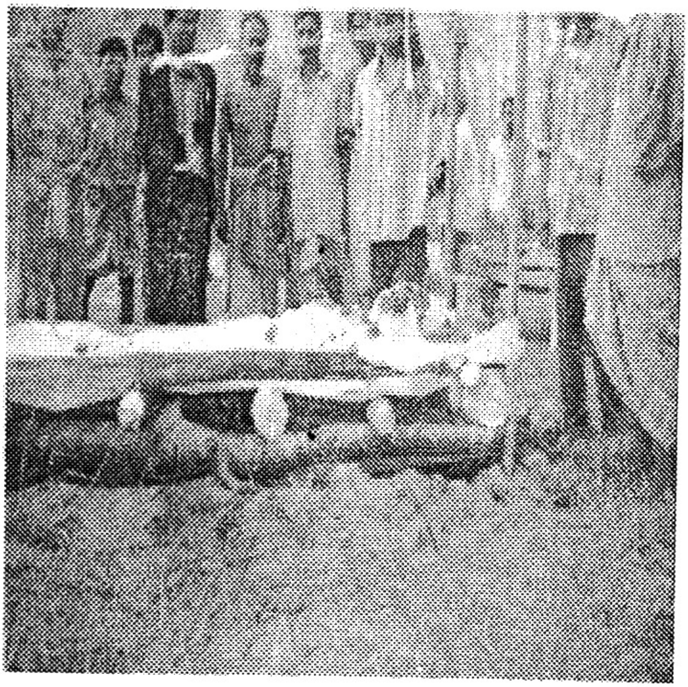

শশ্মানে দাহের পূর্বে শবদেহ সাজানো হচ্ছে।

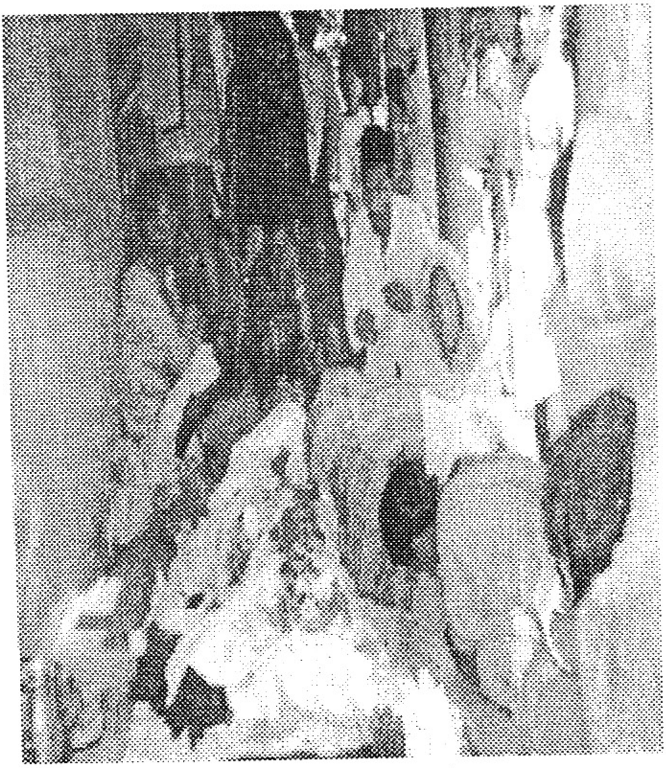

শশ্মানের নেওয়ার পূর্বে স্বজনবর্গ ক্রন্দন করছে।

পিনীদের লোক আচার অনুষ্ঠান অনুসারে বিবাহ প্রথা।
ত্মীয়-স্বজনবর্গ পূজার জল বাঁশের চৌঙ্গীতে ভরে বর-
্যাকে আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক খেলাধূলাকে পরিহার করে সার্বজনীন খেলা বরণ করে নেন।

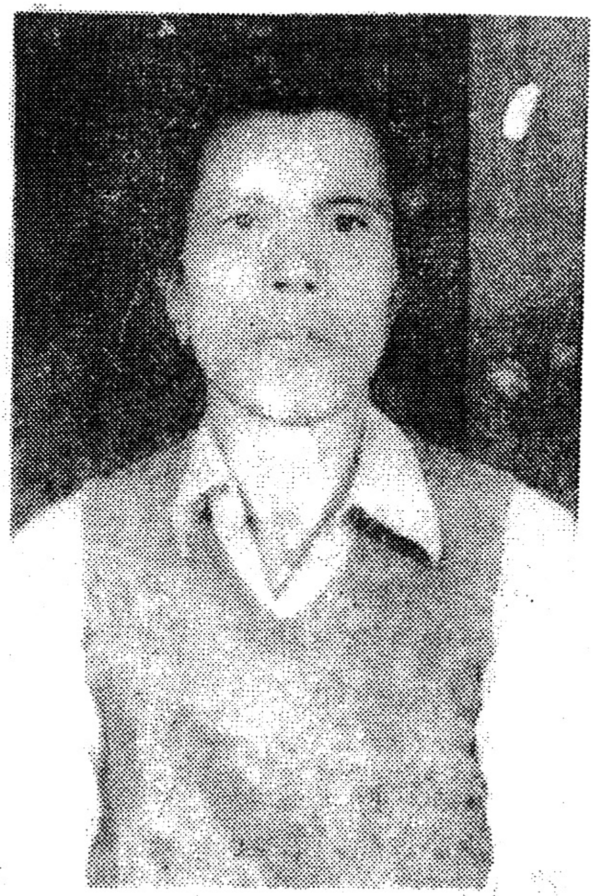

রূপিনীদের বিবিধ লোক যন্ত্র সঙ্গীতকার ।

References

1. Tribe of Indo Barma Border - S. N. Baru
2. Assam Burangi - Rai Saheb Golap Chandra Barma
3. Trealise on Traditional Social Institutions Tripuri Community - Sri Debapriya Deb Barma
4. Krishnamala - Durjoy Ram Janga
5. Kuki Life and lure - Tarun Goswami
6. The Bongcher - S. Sailo
7. The Kachari - S. Endle
8. Tripur Desher Katha - Tripur Chandra Sen
9. Amulya Chandra Bidhya Bhusan Rachana Bali
10. Rajmala - Kailash Chandra Singh
11. Rajmala - Kali Prasanna Sen
12. Language of the North Eastern India - A. Grirson
13. Kirata Ancient India - G. P. Singh
14. Lokabritter Aloke Kolai Sampraday - Sri Pradip Bhattacharjee
15. The Kukis of Tripura - Ram Gopal Singh
16. Tribal Insurrentiopn Tripura - Kumalini Ghosh
17. The History of Tripura - Dr. Jyatish Chandra Datta
18. Taitha Panjee O Nirde Shikha - Tripura Darpan, 1989
19. Sadharan Samikshar Aloke Uchai - Shyam Lal Deb Barma
20. Census of India 1961, 1971 Volume (X X VI) - C. R. Paul, MA (Com)